বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা—১২

উৎসর্গ

কবিগুরুর শ্রীচরণে

সূচীপত্র

বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা
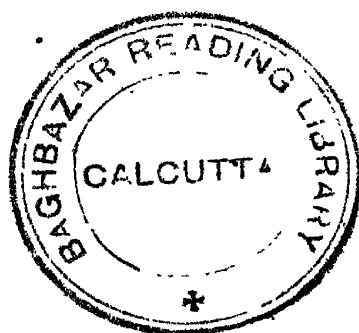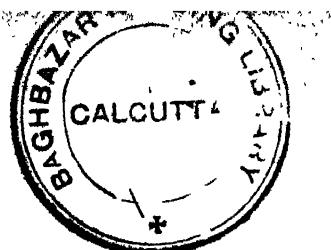
ক্ষিতিমোহন সেন
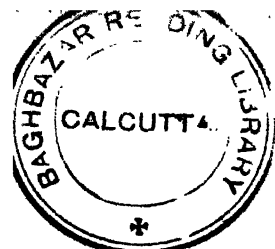
নিবেদন

কাব্যশিল্পের রচনা ও ব্যাখ্যা এক কথা নয়। রচয়িতাই যে ভাল ব্যাখ্যাতা হইবেন তাহারই বা অর্থ কি? কাব্যরচনায় সৃষ্টির সবটা কৃতিত্বও কবির নহে। কবির ব্যক্তিত্বের-অতীত কোনো এক ভাবলোক হইতে কাব্যসৃষ্টিকালে কবির অন্তরে প্রেরণা আসিতে থাকে। তখন তিনি দৈব-প্রেরণার বলে ঋষি হইয়া কাব্য সৃষ্টি করেন। দেবীভাগবত-পুরাণ তাই এই কথাই বার বার বলেন যে 'ঋষি-বিনা কে কাব্য সৃষ্টি করিবে?'

[নাঋষিঃ কুরুতে কাব্যম্।]

শিল্পরচনাতেও সেই একই কথা। শিল্পসৃষ্টির সময়েও শিল্পীর মধ্যে এমন এক ঐশী শক্তির আবির্ভাব ঘটে যে, বামন-পুরাণ বলেন—শিল্প-রচনাকালে শিল্পীর হস্তে পরম পবিত্র এক স্বর্গীয়তা অবতীর্ণ হয়। তখন শিল্পীর হস্ত সর্ব অশুচিতা হইতে মুক্ত। তখন কোনো কামনার দ্বারা শিল্পী নিজেকে অশুচি করিলে তিনি স্বধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হন।

লিঙ্গ-পুরাণ ও বিষ্ণু-পুরাণ বলেন যে অসীমের ক্ষোভ হইতেই সীমার সৃষ্টি। কাজেই সীমার মধ্যে যে-সব রূপ ও সৌন্দর্য দেখা যায় তাহার পশ্চাতে অসীমের ক্ষোভই বর্তমান। যে-কোনো শিল্পরচনাতেই বিশ্বশিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর যোগযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। লিঙ্গ-পুরাণ আরও বলেন, শিবময় না হইয়া কেহই কখনো শিবকে পায়না। তাই রচনাকালে শিল্পীকে শিবময় হইতেই হয়। কাব্য বা শিল্পরচনাকালে কবি ও শিল্পী বিশ্বরচয়িতারই সমানধর্মা ও উত্তর-সাধক। উভয়-ক্ষেত্রেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহত্ত্ব সমান। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি যদি সত্য হয়, তবে কবির কাব্যও সত্য। এই কথা বলিয়াই বৃহদ্ধর্ম-পুরাণও বলেন, মহর্ষি ব্যাসকে চরাচর-ব্যাপী সৃষ্টির সনাতন কাব্য-বীজ দান করা হইয়াছিল। ঊর্ধ্বলোক হইতে সর্ব সৃষ্টির আনন্দরস যে নিরন্তর অবতীর্ণ হইতেছে সে-খবর কয়জন রাখেন?

[ঊর্ধ্বং ভরন্তমুদকং কুম্ভেনেবোদহার্যম্। (অথর্ব: ১০, ৮, ১৪)।]

গানেও সেই একই কথা। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের মতে, গানকে প্রত্যক্ষ না করিলে গানেরও সৃষ্টি বা সাধনা চলে না। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ আরও বলেন, অনন্তকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি না করিলে গানও কেবল চিত্রিত ও পুষ্পিত মুখের কথা মাত্র।

সেরূপ ঝুটা সাধনায় গান কখনও জীবন্ত হইয়া ওঠে না। গানের মধ্যেই আমাদের অন্তরে অরূপ অব্যক্ত অনন্ত আপনাকে রসে ও আনন্দে ধরা দেন। সর্বজয়ী কালের কাছে সবারই শক্তি পরাহত। কিন্তু সংগীতে কালকেও জয় করা যায়। সংগীত হইল কালশাসনের অতীত অর্থাৎ অপার ও অনন্ত সত্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিশ্বজগৎকে আমরা যেমন প্রত্যক্ষ দেখি ও বুঝি, শিল্প, কাব্য ও গান তো তেমন করিয়া বুঝিতে পারি না। তাহাতে মৎস্য-পুরাণ এই কথা মনে করাইয়া দেন যে, এই বিশ্বজগৎকেও বা বুঝিতে পারি কই। চক্ষুর কাছে যাহা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাও যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে চিন্ময় নয়ন চাই। 'মাংস-চক্ষু'তে বিরাট বিশ্ব অদৃশ্য*। অথর্ব বেদের ঋষি তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সবাই চক্ষু দিয়া দেখিতে চায়, মন দিয়া তো কেহ বুঝিতে চায় না।'

[পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা ন সর্বে মনসা বিদুঃ। ১০, ৮, ১৪।]

শিল্পী কবি সবাই বিশ্বরচয়িতার সমানধর্মা। বিশ্বশিল্পীর ভাব-স্বপ্ন হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, আর শিল্পরচয়িতার ভাব-স্বপ্ন হইতে শিল্পের সৃষ্টি। তাই অগ্নি-পুরাণ শিল্পীর স্বপ্নমন্ত্রের কথা বলিয়াছেন। পদ্ম-পুরাণ বলেন, দীপ হইতে যেমন দীপ জ্বলে, তেমনই শিল্পী আপন হৃদয়ের চিত্র হইতে বাহিরের চিত্র জ্বালাইয়া তোলেন। অন্তরের দৃষ্টিকেই বাহিরের সৃষ্টিতে গড়িয়া তুলিতে হয়।

এই সব দেখিয়া মনে হয়, শিল্পীরা যখন সত্য কিছু সৃষ্টি করেন তখন তাঁহারা দৈবভাবে ভাবিত। বিশ্বছন্দের সঙ্গে ছন্দোময় না হইলে সত্য কোনো রচনাই সৃষ্ট হয় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৬, ৫, ১) বলেন, আমাদের শিল্পের মধ্যেও দৈব-শিল্পেরই প্রেরণা।

[ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি।......
আত্মসংস্কৃতি র্বাব শিল্পানি।
ছন্দোময়ং বা এতৈ র্যজমান আত্মানম্ সংস্কুরুতে।]

কাজেই কবি বা শিল্পী আপন কাব্য বা শিল্পের পুরাপুরি স্রষ্টা নহেন। তাঁহাদের পশ্চাতে বিশ্বকবি ও বিশ্বশিল্পীর প্রেরণা আছে। তাই এক এক সময় নিজেদের সৃষ্টি দেখিয়াই তাঁহারা বিস্মিত হইয়া ওঠেন।

[স্ব-সৃষ্টৌ অপি বিস্মিতঃ। (কালিকা-পুরাণ)।]

---

* ন দৃশ্যং মাংস-চক্ষুষা। (মৎস্য-পুরাণ)।

নিজের সৃষ্টিতে নিজেই বিস্মিত, এ আবার কি কথা? কাব্যসাহিত্য-রহস্যের এই কথা বুঝাইতে গিয়া প্রাচীন গুরুরা একটি চমৎকার উপমা দিয়াছেন—'অনেক সময় পিতামাতা নিজেরাও আপন সন্তানেরই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। বিবাহ বা তেমন কোনো উৎসব দিনে অন্যেরা তাঁহাদেরই পুত্রকন্যাকে যথোপযুক্তরূপে সাজাইয়া দিলে, তাহার পরে তাহাদের প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতায় চাপা দেওয়া আচ্ছাদিত রূপটি যখন ফুটিয়া ওঠে তখন তাঁহারা নিজেরাই আপন সন্তানের মহনীয় রূপটি দেখিয়া বিস্মিত হন।'

কবির কাব্যের যথার্থ মর্মও অন্যের কাছেই ভালো করিয়া ধরা পড়িতে পারে। নিকটস্থ রসানভিজ্ঞের দল যে রসটুকু না পান তা ধরা পড়ে দূরস্থ রসজ্ঞের কাছে। তাই মহাকবিদের রসজ্ঞেরা কোনো বিশেষ দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ নহেন। কথাই আছে, 'পদ্মের শোভা নিকটস্থ দর্দ্দুরের বোধগম্য না হইলেও তাহার মর্ম জানে দূরস্থ ভ্রমর।'

রবীন্দ্রনাথ আপন কাব্য-রচনার সবটা গৌরব কোনো কালেই দাবি করেন নাই। তাঁহার জীবনদেবতাই যেন তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া সব কিছু রচনা করিয়া চলিয়াছেন। তিনি যেন সম্মুখে উপবিষ্ট উপলক্ষ্য মাত্র। তাই তিনি বার বার নিজের দাবি সরাইয়া দিয়া জীবনদেবতারই ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। কত ভাবেই কবি বলিয়াছেন,—

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে বলিতে দিতেছ কই? (চিত্রা, অন্তর্যামী)।

আবার কবি বলেন,—

কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই। (চিত্রা, অন্তর্যামী)।

এই কথা কবির অনেক কবিতাতেই দেখা যায়। তবু এই 'অন্তর্যামী' কবিতাতে কবি তাঁহার রচনার গোপন রহস্যটি ভাল করিয়া প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন।

উত্তর বঙ্গ বোয়ালিয়া হইতে ১৮৯৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানাইতেছেন, "এবার বোটে থাকতে আমি অন্তর্যামী নামক একটি কবিতা লিখেছি তাতে আমি আমার অন্তর-জীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।" (ছিন্নপত্র)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-রচনার সবটা কৃতিত্ব নিজে দাবি করিতেন না বলিয়া তাঁহার কাব্যের ব্যাখ্যা করিতেও তিনি সংকোচ বোধ করিতেন। অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "এমনও হয়েচে যে আমার নিজেরই লেখা কবিতার আমি পরে ঠিক অর্থ বুঝতে পারিনি। তখনকার লেখক ও পরের পাঠক মানুষ যেন এক নয়।"

তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিতে বেশি অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, "ইরাণ দেশের সুফীদের মধ্যে একটা আখ্যান আছে। একজন লোক সাগরে গিয়ে ডুব দিয়ে এক শুক্তি তুললো। তখন শুক্তিটি একমাত্র তারই ধন। যখন সেই শুক্তি হ'তে উজ্জ্বল মুক্তা বাহির হোলো এবং বিশ্বজন যখন সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হোলো তখন অন্যসকলের অধিকারের সঙ্গে তার অধিকারও সমান হয়ে গেল।

"কাব্যটি যতক্ষণ আমারই মধ্যে ছিল ততক্ষণই তাকে না-হয় আমার বলা চলতো। এখন সকলেরই তাতে সমান অধিকার। তাতে সকলের যে আনন্দ, আমারও সেই রকমেরই আনন্দের অধিকার। তার বেশি দাবি আমারই বা চলবে কেন? কোনোসময় তা আমার হাত দিয়ে বের হলেও এখন আর তার সবটা গৌরব আমার নয়। এখন তার রসসম্ভোগে আরসকলের সঙ্গে সমান আমিও একজন। আমার ব্যাখ্যা যে সর্বজনের মান্য হ'তেই হবে এমনই বা কি কথা?"

এই সব ওজর আপত্তি সত্ত্বেও যখন কবিগুরুর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতেছে তখন রবীন্দ্রকাব্য-রসিক স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নেপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েকজন কবিকে ধরেন, তাঁহার কাব্যগুলির মর্মকথা বুঝাইয়া দিতে। কবি আপত্তি করিলে তাঁহারা বলিলেন, "কবিরূপে আপনি আপনার কাব্য-সমালোচনা নাই করিলেন। আপনিও যে একজন সমজদার পাঠক তাতে তো আর ভুল নাই। সেই ভাবেই আপনি না হয় কিছু বলুন। প্রত্যেকটি কবিতার জন্ম-ইতিহাস আপনার যতটা জানা আছে ততোটা তো আর কাহারও জানা থাকিবার কথা নয়। সেখানেও আপনার বিশেষ সুবিধা।"

অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ তখন উৎসাহী যুবক। আশ্রমে যাওয়া-আসা ও নানা কাজে তখন তিনি সহায়তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রোতাদের সেই মণ্ডলীতে তিনিও যোগ দিলেন।

১৯১১ সালের ১২ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার কবিকে এই অনুরোধ করা হয়।

তিনি সেদিন যে-সব আপত্তি করেন তাহারই কিছু নমুনা ইতঃপূর্বে দেওয়া হইল। কিন্তু সেই সমস্ত আপত্তিতে কেহই টলিলেন না, সকলেই আহারান্তে মধ্যাহ্নকালে শান্তিনিকেতনের অতিথিশালার দোতালার ঘরে গিয়া শুনিতে বসিলেন। তখন বাধ্য হইয়া কবি তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে আরম্ভ করেন। ১৩ই বৈশাখ মধ্যাহ্নে তিনি তাঁহার রচনার একটা সাধারণ ভূমিকা করেন। তাঁহার বাল্যকালের রচনার কথাও বলেন।

১৪ই বৈশাখ কবি 'সন্ধ্যাসংগীত' সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়া 'বৌঠাকুরাণীর হাট' পর্যন্ত আলোচনা করিলেন। সেদিন সাহিত্য আলোচনার পর কথা-প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও কিছু কথাবার্তা হইল। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁহার কাব্যগুলির এক একটি ধরিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন।

(মনে আছে, ১৮ই বৈশাখ, সোমবার, 'বিদায়-অভিশাপ' আলোচনা প্রসঙ্গে কবি পুরুষ-প্রকৃতির কথা পাড়িলেন। তিনি বলিলেন, "পুরুষ অর্থাৎ আত্মা সদাই অগ্রসর হয়ে চলতে চায়। প্রকৃতি বা নারী চায় তাকে বেঁধে রাখতে। সৌন্দর্য, সেবা প্রভৃতি সবই হোলো প্রকৃতির অনুনয়েরই লীলাময় নানা রূপ। কিন্তু পুরুষকে যে যুগ-যুগান্তর বেয়ে লোক-লোকান্তর পার হয়ে ক্রমাগতই এগিয়ে চলতেই হবে। তাই এমন সাগ্রহ অনুনয় সত্ত্বেও পথে সে কোথাও থেমে যেতে অক্ষম। তাই সর্বচরাচরময় পুরুষের এই 'যাই-যাই' বিদায়বাণী নিরন্তর ধ্বনিত। আর নিখিল চরাচরে ক্রমাগত চলেচে প্রকৃতির 'থাকো-থাকো' বলে বেদনা-ভরা কাতর অনুনয়। প্রকৃতির এই সবেদন অনুনয়-বাণীরই নিবেদন সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্যে সর্বত্র ধ্বনিত হচ্চে। বিশ্বজগৎ এই বেদনাতেই করুণ।

"নানা সম্বন্ধের নানা রূপে চলেচে প্রকৃতির সেই একই অনুনয়-বাণী। কিন্তু সব বাণীতে করুণ বেদন একই। 'কচ ও দেবযানী'তে প্রণয়িনীরূপে প্রকৃতির এই বেদনা-বাণী, 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় কন্যা ও নিঃশব্দ গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রকৃতির এই ব্যথা। 'কর্ণকুন্তীসংবাদে' মাতৃরূপে এই আহ্বানই ফুটে উঠেচে। সর্বত্রই 'থাকো-থাকো' ব'লে প্রকৃতির এই একই অনুনয় ধ্বনিত হচ্চে। কিন্তু পুরুষের তো কোথাও থেমে থাকবার জো নেই। ক্রমাগতই তাকে চলে যেতেই হয়। সর্ব বন্ধনের অতীত পুরুষের এই সদাগতির জন্যই বিশ্বপ্রকৃতিতে এত বেদনা। মুক্তিপথযাত্রী পুরুষ আপনাকে কেমন ক'রে সেই বাঁধনে বাঁধা দেবে?")

কবির এই কথায় সত্যেন্দ্র দত্ত, অজিতকুমার ও সুকুমার রায় কবির সঙ্গে অনেক তর্ক করিলেন। গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত সেই তর্ক এবং আলোচনাও চমৎকার মনোজ্ঞ হইয়াছিল। এইসব আলোচনার পরে কবি 'চিত্রা' লইয়া কিছু বলিলেন। সেইদিন 'চিত্রা'-গ্রন্থখানির সব কবিতার আলোচনা সমাপ্ত হইল না। পরদিন মঙ্গলবারও 'চিত্রা'র আলোচনাই চলিল। ২০শে বৈশাখ, বুধবার, আলোচনা আরম্ভ হইল 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতা লইয়া। ২১শে বৈশাখ কবি 'মালিনী' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া 'চৈতালী'তে পড়িলেন।

পরদিন ২২শে বৈশাখ। কবির জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা অনেকেই এত ব্যস্ত যে তখনকার মতো আলোচনা-সভা স্থগিত রাখিতেই সকলে বাধ্য হইলাম। তাহার পরে ঠিক তেমন করিয়া কলিকাতা ও শান্তিনিকেতনের মণ্ডলী জমাট হইয়া আর বসিতে পারে নাই। তাই দিনের পর দিন আর তেমন করিয়া একটানা ভাবে আলোচনা চালাইতে পারা যায় নাই। তবু যখনই সম্ভব হইয়াছে তখনই মাঝে মাঝে সেই আলোচনা চলিয়াছে। যদিও তাহাতে সর্বত্র সকলের যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এইসব আলোচনার প্রসঙ্গে কবির কথাগুলি অনেকেই নিজ নিজ খাতায় তখন লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে একটা বড় রকমের কাজ হয়।

কবির সঙ্গে আলোচনাকে ভিত্তি করিয়াই অজিতকুমার তাঁহার অপূর্ব 'কাব্য-পরিক্রমা' লেখেন ও পরে প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি 'জীবন-দেবতা' (চিত্রা, ১৮৯৪), 'গীতাঞ্জলি' ও 'রাজা' (১৯১০); 'ডাকঘর', 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' (১৯১২); 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) ও কবির 'ধর্মসংগীতে'র আলোচনা করিয়াছেন। সেইসব আলোচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে প্রবন্ধাকারে প্রবাসীতেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ সহজে নিজের কাব্যের ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেন না। তবু যখন ১৯১৬ সালে তাঁহার 'বলাকা' বাহির হইল তখন রবীন্দ্রকাব্যভক্ত সাহিত্যানুরাগিগণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'বলাকা' সম্বন্ধেও আবার বহুবার আলোচনা করেন। সেইসব আলোচনা বাহির হইলে অনেক উপকার হইত। ১৯১৮ সালের অবসানে ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারীতে অসামান্য প্রতিভাশালী অজিতবাবু মারা যান। তাহার পরে কবি সত্যেন দত্ত ও সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের আকাশ অন্ধকার করিয়া অকালে চলিয়া গেলেন।

এইসব তরুণ মহারথীদের তিরোধানে আমাদের দেশের সাহিত্যের যে দারুণ ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

'বলাকা'র প্রথম কবিতাটি ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে লেখা। শেষ কবিতার তারিখ ৯ই বৈশাখ, ১৩২৩ সাল। কাজেই দুই বৎসর ধরিয়া এই কাব্য-গ্রন্থটির রচনা চলিয়াছিল। ১৩২৩ সালের (ইংরেজী ১৯১৬) জ্যৈষ্ঠ মাসের পরে 'বলাকা' মুদ্রিতরূপে আমাদের হাতে আসে। তখন অনেকেই এই কবিতাগুলির বিষয়ে কবির কাছে আরো কিছু জানিতে চাহেন। কিন্তু পারতপক্ষে কবি কিছু বলিতে চাহেন নাই। তখন আমরা সকলে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, কবিরূপে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যদি আবার পাঠকরূপে তিনি সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তবে আমরাও কেন সেই রসসম্ভোগের একটু আধটু প্রসাদ পাইব না। প্রত্যেকটি কবিতার "জাতক-কথাগুলি" তিনি ছাড়া আর কে-বা জানেন? সেইটুকু জানিলেও অনেক কাজ হয়। তাই অগত্যা কবি বলিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু সহজে তাঁহাকে এই কাজে প্রবৃত্ত করান যায় নাই।

'বলাকা'র যে-সব আলোচনা কবির মুখে শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল সেইগুলিই যথাসাধ্য ধরিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তবে সবগুলি আলোচনা একই সময়ে ধারাবাহিকভাবে হয় নাই। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগে সাহিত্যের ক্লাসে 'বলাকা' সম্বন্ধে কবির একটি আলোচনা কিছুদিন ধরিয়া চলে। শ্রীমান্ প্রদ্যোতকুমার সেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তখন শান্তিনিকেতন পত্রিকায় সেইসব আলোচনা মুদ্রিত করেন। শ্রোতাদের মধ্যে অবাঙালী কেহ কেহ থাকায়, কবি মাঝে মাঝে দুই একটি ইংরেজী শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। বুঝিতে সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া তাহাও আমরা স্থানে স্থানে যথাসাধ্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ইহা ছাড়াও তাহার পরে তাঁহার কাছে ছিলাম বলিয়া প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর ধরিয়া নানা জনের সঙ্গে 'বলাকা' সম্বন্ধে তাঁহার যে-সব আলোচনা শুনিয়াছি, তাহাই একত্র করিয়া এখন সকলের কাছে উপস্থিত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি।

একই বিষয়ে নানা সময়ের আলোচনা একসঙ্গে উপস্থিত করিতে গিয়া কোথাও কোথাও পুনরুক্তি আসিয়া পড়িয়াছে। একই কথা হয়তো একাধিকবার তিনি বলিয়াছেন। অথচ এমন সুন্দরভাবে সেগুলি নানাপ্রসঙ্গে বলা যে,

কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এই দোষটা এই ক্ষেত্রে সহিয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। এই অসুবিধা সত্ত্বেও একই কবিতা সম্বন্ধে বা বিষয় সম্বন্ধে নানা সময়ের আলোচনা একত্র করিয়া এখানে উপস্থিত করা হইল। তাহাতে যদি রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগীদের 'বলাকা'র কবিতা বুঝিবার পক্ষে কিছুমাত্র সুবিধা হয়, তবেই আমার এই চেষ্টাকে সার্থক জ্ঞান করিব।

(২)

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই অগ্রগতির ও উন্নতির উপাসক। তাঁহার কাব্যে চিরদিনই গতির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য ঘোষিত। 'বলাকা'রও প্রধান কথাই গতি। এই গতির আলোচনায় এক প্রসঙ্গে একবার আমাদের মধ্যে কেহ কেহ কবিগুরুকে বলেন, "আপনি গতির উপাসক অথচ আমাদের দেশের মনীষীরা তো সত্যকে ধ্রুব ও স্থিরই মনে করতেন।"

কবি বলেন, "চরাচর সম্বন্ধে তাঁরা যে 'জগৎ' ও 'সংসার' শব্দ ব্যবহার করেচেন তাতে তো গতিই বুঝায়। মায়াবাদীরা অবশ্য সেইকারণেই জগৎ ও সংসারকে মায়া বলেচেন, কিন্তু বেদে সত্যের যে মহনীয় নাম **'ঋত'** তা'তো **'ঋ'** ধাতু হতেই নিষ্পন্ন। **'ঋ'** অর্থই তো গতি। উপনিষৎ বলেচেন, তপস্যাই ঋত, তপস্যাই সত্য।*

"তবে স্থিরত্বের কথাই বা বলবো কেন? চক্রের যেমন পরিধি ঘুরচে অথচ

---

* ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ। (মহানারায়ণ, ৮, ১)।

তুলনীয়

"ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসো অধ্যজায়ত। (মহা, না, ৫, ৫)।

অর্থাৎ দীপ্যমান তপস্যা হইতে ঋত ও সত্য অভিজাত হইল। উপনিষৎ আরো বলেন,

"অহমস্মি প্রথমজা ঋতস্য"। (তৈ, উ, ৩, ১০, ৬)।

কঠ উপনিষৎ বলিয়াছেন—

"সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"। (কঠ, ৩, ১১)।

"তামাহুঃ পরমাং গতিম্"। (কঠ, ৬, ১০)।

আমরা প্রতিদিন মন্ত্রেও উচ্চারণ করি—

"এষাস্য পরমা গতিঃ"। (বৃহ, আ, ৪, ৩, ৩২)।

প্রার্থনার মন্ত্রে তিনবার বলা হইয়াছে—

"সদ্‌গময়, জ্যোতির্গময়, অমৃতংগময়" (বৃ, আ ১, ৩, ২৮)।

—অর্থাৎ আমাদের 'যাওয়াও', এই দুর্গতির মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দিও না।

তার কেন্দ্র তো স্থির। যাঁরা যোগী বা ধ্যানী তাঁরা ঐ কেন্দ্রকে আশ্রয় করে চরাচরের মধ্যস্থিত স্থির ধ্রুব অচল আশ্রয় পেতে চান। আর যাঁরা শিল্পী কবি, তাঁদের নাম ও রূপ নিয়েই কারবার। তাঁরা সেই চক্রের পরিধির দিকে দেখচেন। সেখানে ক্রমাগতই গতি ও রূপবৈচিত্র্য। আসল কথা কি জানেন, আত্মারূপে যা কেন্দ্রগত ও স্থির তাই প্রাণরূপে সর্বত্র ও সর্বদা কম্পিত ও ধাবিত। যাকিছু সবই প্রাণে এজিত অর্থাৎ কম্পিত—ধাবিত।

[যদিদং কিংচ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। (কঠ, ৬, ২)।]

"উপনিষদে দেখচি,—প্রাণ চলেচে প্রাণশক্তিতে।

[প্রাণঃ প্রাণেন যাতি। (ছা, ৭, ১৫, ১)।]

"কাজেই পরম সত্যকে 'চলচে' ও 'চলচেনা' এই দুইই বলা চলে। উপনিষৎ তাই বলেচেন, 'তা চলচে, তা চলচে না'।

[তদেজতি তন্নৈজতি। (ঈশ, ৫)।]

"ঋষিরা বলেন, 'বসে থেকেও তা দূরে চলেচে। শয়ান হয়েও তা সর্বত্রগামী'।

[আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ। (কঠ, ২, ২০)।]

"উপনিষৎ বলেচেন, 'না চলেও তা মন হতেও বেগগামী',—কথাটা মিথ্যে নয়।

[অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ। (ঈশ, ৪)।]

"আমাদের দেশের কেন্দ্র-ধ্যানী যোগীর দল যাকে বল্লেন স্থির—একদল দার্শনিক তাকেই বল্লেন সত্য স্থির ধ্রুব। আর একদল বিশ্লেষণ-যুক্তিপরায়ণ দার্শনিক বল্লেন—কিছুই স্থির নয়। সবই ক্ষণে আসচে ক্ষণে যাচ্ছে। বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদে তো স্থির সত্য বলে কিছুই দাঁড়ায় না। তাঁরা বৈনাশিকের দল। অর্থাৎ সব কিছুই প্রতিক্ষণেই হচ্চে ও প্রতিক্ষণেই নষ্ট হচ্চে, বিনাশপ্রাপ্ত হচ্চে। তাঁদের মতো গতিবাদী দল জগতে আজও কোথাও জন্মান নি।

"ধ্যানী-যোগীরা না মানলেও, কবি-শিল্পীর দলকে গতি মানতেই হবে। ঋগ্বেদের একটি সূক্ত আমার বড় ভালো লাগে। তা হচ্চে বাক্ বা বাণীর সূক্ত। বাক্ই হচ্চেন প্রকাশ। সেই বাণী বলচেন, 'বিশ্বভুবনে সর্ব রূপ ও সৌন্দর্য রচনা করতে-করতে আমি বায়ুর মত সদাই সম্মুখের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেচি'।* সূক্তটা আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু ঋগ্বেদের এই কথাটি পরম

* অহমেব বাত ইব প্রবামি আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বাঃ। (ঋগ্বেদ ১০, ১২৫, ৮)।

সত্য। বিশ্বরচনাও হচ্ছে প্রকাশ, বাক্‌ও হচ্ছে প্রকাশ। তাই এক হিসাবে বিধাতাই বাণীর অধিপতি কবি। উপনিষৎ তো বিধাতাকে কবিই বলেচেন। কবি হয়ে রূপে ও রসে ভগবান সকলের মনকে আকর্ষণ করচেন আর বিশ্বচরাচর হয়ে তিনি নিয়মের দ্বারা সকলের প্রভু হয়েচেন। শক্তিতে তিনিই সকলকে চালিত করচেন।

[কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ।]

"আমার কাছে তাঁর সচল বৈচিত্র্য ও তাঁর অচল ধ্রুব শান্ত স্বরূপ দুইই পাশাপাশিভাবে বিরাজিত হয়ে অপরূপ চমৎকার লাগে। তবে কবিরূপে আমি তাঁর সদাসচল বৈচিত্র্যকে স্মরণ না করে পারিনে। 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি' একথা সব সময়ে মানিনে। আমার মধ্যে এমন একটি পুরুষ আছেন যিনি দীর্ঘকাল এক বন্ধনে বদ্ধ থাকতে নারাজ। এজন্য আমি আমার চিন্তায় লেখায় নানাভাবে রীতির পর রীতি, পন্থার পর পন্থা ক্রমাগতই বদল করেচি। সেখানে আমি নিত্য নূতনের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারিনি। চিরদিনই আমাকে পুরাতন বাঁধন ভাঙ্গতেই হয়েচে। সেখানে আমি বৈরাগী। শিল্পিরূপে আমি বৈরাগ্যকে চরম বলে মানতে পারিনে।

"আমাদের দেশের দার্শনিকেরা ভুল যে করেচেন তা বলচিনে। সূর্য-চন্দ্রকে দূর হতে দেখলে মনে হয় অচল, সামনে গেলে দেখা যায় তাদের প্রচণ্ডগতি। কাজেই এই আমাদের দুই রকমের সিদ্ধান্তের মধ্যে দূর বা নিকট থেকে দেখায় একই সত্য আপেক্ষিক ভাবে দুই সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েচে—

'তাই সচল, আবার তাই অচল, তাই দূরে, তাই নিকটে।'

[তদেজতি তন্নৈজতি
তদ্‌দূরে তদ্বন্তিকে। (ঈশ, ৫)।]

"তবে এটা দেখচি যে আমাদের দেশের পুরোনো ক্ষণিকত্ববাদ ও সদা-সচলতার মতই ক্রমশ য়ুরোপে এতদিনে এখন আবার নতুন রূপে দেখা দিচ্চে। সচলতাতেই সব কিছুর নাম ও রূপ অর্থাৎ সত্তা। তাঁদের সেই কথাতে তো 'সৎ'টা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সৎ-এর সঙ্গে সঙ্গে 'চিৎ' ও 'আনন্দের' কথা যতক্ষণ তাঁরা না বলবেন ততক্ষণ তাঁদের সে কথার মূল্য কি? সচ্চিদানন্দের পূর্ণস্বরূপ না পেলে মানুষ তৃপ্ত হবে কেন? হয়তো আবার এই পূর্ণস্বরূপের লীলাটি জগতের কাছে ভারতকেই দেখাতে হবে। ভারতের প্রতি হয়তো

বিধাতার এই আদেশই এই যুগে রয়েচে। এখন প্রশ্ন এই—সেই অদ্বিতীয় একই বা কেন বহুধা-বিচিত্র হতে গেলেন?

"ঋষিরা বলেচেন, 'আদিতে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন। তাঁর সেই একা-একা ভাবটি আর ভালো লাগলোনা। তিনি সঙ্গী খুঁজলেন। সেই অদ্বিতীয় পুরুষ সঙ্গী পাবেন কোথায়? তাই তিনি আপনাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রকৃতি-পুরুষ এই দুই রূপেই হোলো আদি-বৈচিত্র্য। এরা দু'য়েই পরস্পরে পরস্পরকে চায়। এদের কেউই একা পূর্ণ নয়, দুই দুইয়ের অপেক্ষা রাখে।*

"পরমাত্মা যখন একা ছিলেন তখন কোনো বালাই ছিল না। যেই প্রকৃতি-পুরুষ অর্থাৎ নর-নারী ভাগ হোলো তখন হতেই যত দুঃখ বেদনা। পুরুষ হলেন শুদ্ধমুক্ত স্বভাববান্। অথচ প্রকৃতি তাঁকে না বেঁধে ছাড়বেন না। প্রকৃতি মাতৃরূপে পুরুষকে বাঁধতে এলেন, প্রণয়িনী-রূপে পুরুষকে বাঁধতে এলেন, কন্যারূপে পুরুষকে বাঁধতে এলেন।† পুরুষ যদি তাতে ধরা পড়লেন তবে ঘুচলো তাঁর মুক্তি। আর পুরুষ যদি ধরা না পড়লেন তো প্রকৃতির বেদনার আর অন্তই নেই। পুরুষকে বাঁধতে গিয়েই প্রকৃতির যত সৌন্দর্য-লীলা, যত রূপ-গীত-গন্ধ-রস-স্পর্শ বৈচিত্র্য। এই সবই প্রকৃতির অনুনয়। এই অনুনয়ে বাঁধা পড়লে মুক্ত পুরুষ হন বদ্ধ। তখন পুরুষের ব্যাকুল বেদনা জাগে মুক্তির জন্য। নয়তো প্রকৃতির বেদনা চলতে থাকে পুরুষকে বাঁধবার জন্য। এই দুঃখেই জগৎসংসার পরিপূর্ণ। এই বেদনাতেই শূন্য অনন্ত আকাশ ভ'রে রয়েচে। তাই তার নাম রোদসী বা ক্রন্দসী।

"কবিরূপে আমার তো এই প্রকৃতি-পুরুষ নিয়েই কারবার। কাজেই আমার কাব্যে মাতৃরূপে, পত্নীরূপে, কন্যারূপে সব ভাবেই প্রকৃতির অনুনয়ের বেদনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নিত্যমুক্ত পুরুষও তো বাঁধন স্বীকার করতে অক্ষম।

"জীবাত্মা এই সংসারে আসে অনাসক্তরূপে। অনাসক্তরূপেই সে যায়।

* আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। স বৈ নৈব রেমে (স নারমত একঃ,—মৈত্রী, ২, ৬) তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। স আত্মানং দ্বেধা পাতয়েৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব। (বৃহ, আ, উপ, ১, ৪, ৩)।

† 'কর্ণকুন্তীসংবাদে' মাতৃরূপে, 'কচ ও দেবযানী'তে ও 'চিত্রাঙ্গদা'য় প্রণয়িনী-রূপে, 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় কন্যারূপে এই একই অনুনয়।

হংস যেমন দেখা যায় কোন্ মানস লোক হতে আসে আবার সময় হলে সেই মানস লোকেই ফিরে যায়—তেমনি। হংসেরা নদীর চরে থাকে। বাসা বাঁধে না। কখন যে তাদের উড়ে যেতে হবে তারও তো কোনো ঠিকানা নেই। তাই আত্মাকে বলে হংস। মুক্ত সাধকদের নাম তাই হংস বা পরমহংস। সাধনার জন্য সংসারে থাকলেও তাঁরা বাসা বাঁধেন না। মানস লোকের ডাকের জন্য তাঁরা প্রতীক্ষা করে থাকেন। এই সংসারে যদিও তাঁদের নানারূপে মলিন জলে বিচরণ করতে হয়, তবু তাঁদের শুভ্র নির্মল পাখা তাতে কখনও সিক্ত বা মলিন হয় না। তাঁরা নাকি আবার নীরটুকু বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু নিতে জানেন।

"আমার জীবনের বহুকাল পদ্মার চরে কেটেচে। হংসদের মতিগতি আমার জানা। কাজেই আমি বলতে পারি, আত্মাকে হংস বলাতে চমৎকার করে সত্যটি বোঝানো হয়েচে।

"ঐ হংস চিরদিন একস্থানে বাস করে না। গতির দ্বারাই সে আপনাকে সদা মুক্ত রাখে। এই গতিটি হারালেই হংসের হংসত্ব গেল। এই বিষয়ে শাস্ত্রাদি হতে আপনারা অনেক কিছুই বলতে পারেন।"

রবীন্দ্রনাথ তখন এই বিষয়ে ভারতীয় পুরাতন সাধনা শাস্ত্র হইতে কিছু বলিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিলেন। আমরা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম। পরে তাঁহার আদেশে বাধ্য হইয়া পরদিন প্রাচীন সূক্ত-মন্ত্রাদি হইতে কিছু কিছু লইয়া আসিলাম। তাঁহার আদেশে আমাকে বলিতে হইল,—

"অথর্ব বেদে আছে সংস্কারমুক্ত মানুষই ব্রাত্য। ব্রাত্যের লক্ষণই হোলো—সে সদা সচল।

[ব্রাত্য আসীদ্ ঈয়মান এব। (অথর্ব ১৫, ১, ১)।]

"সে তাই সর্বদিকে চললো।

[দিশঃ দিশঃ অনুবাচলৎ। (১৫, ২, ২, ১)।]

"তারপরই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি…'ব'লে পাঁচটি শ্লোক (৭,১৫,১-৫)—

[পাপো নৃষদ্ বরো জনঃ।
ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা।
চরৈবেতি চরৈবেতি ॥]

—বসে থাকলে শ্রেষ্ঠজনও তার মাহাত্ম্য হারায়। যে চলে দেবতাও তার সাথে সাথে চলেন। অতএব, চলো চলো। চলতে চলতে তার সব পাপ মুক্তপথে আপনি শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে।

[শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ
শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ।]

"যে চলে তার ভাগ্যও চলে।

[চরতি চরতো ভগঃ।]

"চললেই আবির্ভূত হয় সত্য যুগ।

[কৃতং সংপদ্যতে চরন্।]

"চলাটাই অমৃত, চলাটাই অমৃত ফল। সূর্য সদা সচল বলেই তার আলোক-সম্পদ্ সদাই অফুরন্ত। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।"

[চরন্ বৈ মধু বিন্দতি
চরন্ স্বাদু মুদুম্বরম্
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণম্ যো ন
তন্দ্রয়তে চরন্। চরৈবেতি।]

[রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এমন অপূর্ব চলবার তাগিদ জগতের সাহিত্যে দুর্লভ।']

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণ খুবই পুরাতন, তার চেয়েও প্রাচীন তো ঋগ্বেদ। তাতেও দেখি—জল দাঁড়ালেই হয় বদ্ধজল, চললেই হয় নদী।

[চরন্তি যন্নদ্যস্তস্থুরাপঃ। (৫, ৪৭, ৫)।]

"সাধক কবীরও পরে ঠিক এই কথাই বলেছেন—বহতা জলধারাই নির্মল, বদ্ধ জলই দূষিত।

[বহতা পানী নির্মলা
বন্ধা গংধিলা হোয়।]

"ঋগ্বেদেও প্রার্থনা—আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাও।

[প্রাণে নয়।]

"চরাচরে তাই ক্রমাগতই একটা চল্বার জন্য ব্যাকুলতা আছে। অথর্ব বলেন—বুঝি না কেন যে বায়ু স্থির থাকতে পারে না, মন কেন কোথাও স্থির হয়ে থেকে সোয়াস্তি পায় না, জলও যেন কিসের খোঁজে সদাই ধাবমান।

[কথং বাতো নেলয়তি
কথং ন রমতে মনঃ।
কিমাপঃ সত্যং প্রেপ্সন্তী
নেলয়ন্তি কদাচন॥ (১০, ৭, ৩৭)।]

"আমাদের আত্মাও তো হংস।

[এষ খলু আত্মা হংসঃ। (মৈত্রী, উপ, ৬, ১)।]

"অজানা কোন্ অসীমলোকের ডাক শুনেচে, তাই কোন্ সুদূরে সে ব্যাকুল হয়ে সদাই উড়ে যেতে চায়।

[হংসস্থ গতিবিস্তারম্। (হংস, উ, ১)।]

"এই হংস সদাই বাইরের মুক্ত লোকের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে উড়ে যেতে চায় (লেলায়মান)।

[হংসো লেলায়তে বহিঃ। (শ্বেতা, উ, ৩, ১৮)।]

"সদা-ব্যাকুল আত্মা নিরন্তর চায় যেন কোথায় উড়ে যেতে, কারণ সদাই এই আত্মা সঙ্গহীন, সর্বত্র সে অসঙ্গ।

[অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ। (বৃ, আ, উ, ৪, ৩, ১৫)।]

"সদাচলন্ত পুরুষ বা আত্মার নেই কোনো সাথী, নেই সঙ্গী। হিরণ্ময় একহংস সূর্যের মতো ক্রমাগতই সে অনন্ত নীল আকাশে ভেসে চলেচে।

[হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ। (বৃ, আ, উ, ৪, ৩, ১১)।]

"অমৃতেরই সন্ধানে তার এই মুক্ত যাত্রা।

[স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্। (ঐ)]

অসীম-অমৃতের জন্য ব্যাকুল পুরুষকে সম্মুখের দিকে টানচে তার মুক্ত স্বভাব আর তাকে বাঁধতে চাচ্চে প্রকৃতি। আত্মা বা পুরুষকে অন্তরাত্মার অসীম-অমৃতের ব্যাকুলতা নিরন্তর বলচে 'চলো' অথচ প্রকৃতি তাকে বলচে 'থাকো—থাকো'। এই দোটানায় তার দুঃখের আর অন্ত নেই। তাই আত্মাকে দোটানায় পড়ে ক্রমাগত ভ্রাম্যমাণ হতে হচ্চে।

"সূর্যও যেন নীল আকাশ-সাগরে ভাসমান সদাগতি হংস। তারও এই দোটানা রয়েচে বলে সেও এই চরাচরময় ব্রহ্মচক্রে সদা ভ্রাম্যমাণ।

[তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে। (শ্বেতা, উ, ৫, ১, ৪)।]

"দোটানার এই দুঃখ ঘোচে কিসে? অথর্ববেদ বলচেন—আকাশের সূর্য যেন আলোকের গান গাইতে গাইতে নীল আকাশ-সাগরের মধ্যে ক্রমাগত আবর্তনের ছন্দে ভ্রাম্যমাণ। তার মধ্যে একটি টানকেও সে বাদ দিতে অক্ষম। তার দুই গতির দুই চরণ তাকে টানচে দুইদিকে। তাই তো সে সদাই চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ। নীল আকাশ-সাগরের সলিলে ভাসমান আলোক-সংগীত-রত সূর্য-হংসের একটি চরণও উপেক্ষা করে তুলে নেবার উপায় নেই।

[একং পাদং নোৎখিদেত্ত
সলিলাদ্ হংস উচ্চরন্। (অথর্ব, ১১, ৬, ২১)।]

"যদি সত্যি সে একটি চরণও নীল আকাশ-সাগর হতে তুলে নিতে পারতো তবে সূর্যের এই ভ্রমণলীলা তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে যেতো। তবে 'বলাকা'র কবিতার কথাই সত্য হোতো।

[যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি'
তখনি চমকি'
উচ্ছি্রয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জপুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;—
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে। (৮নং)]

"অথর্বও বলেন—যদি নীল আকাশ-সাগরের হংস বা সূর্য তার গতিটি বন্ধ করে একস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়াতো, তবে সত্য সত্য 'আজ' বলেও কিছু থাকতো না, 'কাল' বলেও কিছু থাকতো না, দিনও থাকতো না, রাত্রিও থাকতো না। সব গতি তখনি একেবারে বন্ধ হয়ে যেতো। উষার নব নব প্রকাশ অমনি স্তব্ধ হয়ে যেতো।"

[যদঙ্গ স সমুৎখিদেন্
নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যান্
ন রাত্রী নাহঃ স্যান্
ন ব্যুচ্ছেৎ কদাচন। (অথর্ব, ১১, ৬, ২১)।]

তখন কবি বলিলেন,—এই সূক্তটি অপূর্ব, কিন্তু বেদ উপনিষৎ ছাড়া কি আর কোথাও গতির তাগিদ নেই ? তাহাতেই বাধ্য হইয়া বলিতে হইল, "বেদ উপনিষৎ ছাড়াও ভারতীয় নানাধর্মে এই গতির কথা রয়েচে। মধ্যযুগের সাধকদের তো গতিটাই পরম কাব্য, গতিতেই তাঁদের সাধনা, গতিতেই তাঁদের সিদ্ধি।

"অনেকে পরিহাস করে বলেচেন যে, নিয়ত উর্ধ্বগমনটাই নাকি জৈনদের স্বর্গ।

"আজ দেখচি এটা পরিহাসের কথা নয়। নিয়ত উর্ধ্বগমনের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে তাকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলে তো চলবে না।

"আমাদের দেশের সমস্ত দর্শন পুরাণ বা শাস্ত্র লিখতে গেলে প্রথমেই বিশ্বরচনার কথা বলে তারপর বিশ্বের সঙ্গে সেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ বোঝাতে হোতো। তাই আয়ুর্বেদ লিখতে গিয়েও আগে বিশ্বচরাচরের কথা বলে তার সঙ্গে মানবীয় সম্বন্ধের অবতারণার কথা হয়েচে। তাতে সব শাস্ত্রেরই তো সংকীর্ণতা ও প্রাদেশিকতা (অর্থাৎ Parochialism) হতে মুক্ত হবার কথা। যদি না হয়ে থাকে তবে সে আমাদের দুর্ভাগ্য।

"মধ্যযুগে তো মানবের মধ্যে বিশ্বকে (পিণ্ডমেঁ ব্রহ্মাণ্ড) দেখাই ছিল সাধনার সার কথা। তাই মধ্যযুগে কবীর প্রভৃতি সাধকেরা সাধনাকে বিশ্বের 'বহতা ধারার' সঙ্গে তুলনা দিয়ে মুক্ত রাখতে বলেচেন। কবীর বলেচেন,—সেই চরাচরব্যাপী ধারাকে আপনার মধ্যে জানতে হবে। আর সর্ব-বন্ধন-মুক্ত হয়ে সেই বিশ্বধারায় চলতে হবে। তিনি বলেন,—পথ চলতে গিয়ে যদি পতনও ঘটে তাতেও দোষ নেই।

[মারগ চালতা জো গিরৈ।
তাকো লগৈ ন দোষ ॥]

"তিনি আরও বলেন,—গগন দামামা বেজেচে, নাগাড়ায় রণবাদ্য ধ্বনিত।

[গগন দমামা বাজিয়া।
পড়ত্ নিসানে ঘার ॥]

"এই ধ্বনি শুনে অগ্রসর হতে গিয়ে যে পিছিয়ে আসে তার মুখও দেখতে নেই।

[আগে চলি পীছা ফিরৈ।
তাকে মুখ নহি দেখ ॥]

"পাছে লোকে মনে করে তিনি পায়ে চলার পথে অগ্রসর হবার কথাই বলচেন, তাই কবীর সাবধান করে দিচ্চেন—

বিন্ পাঁউকা পংথ হৈ।

"দাদূও বলেন,—পিছে ফিরলে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে।

[পীছে হেলা জিনি করৈ
আগেঁ হেলা আর ।]

"রবিদাস বলেন, বিশ্বচরাচরের গতি যদি এক পলের জন্য বন্ধ হয় তবে চন্দ্রসূর্য সব যায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে।"

[পল এক গতি বংধ জৈ
রেজ রেজ চন্দভান ।]

"সাধক রজ্জব বলেন, সবার বিন্দু বিন্দু সাধনা একত্র হলেই নদীর ধারারূপে সর্বজলবিন্দু হরি-সাগরে যেতে পারে। তাই গতি-সিদ্ধির জন্যই সকল মানবকে যুক্ত হতে হবে, সকল বিচ্ছিন্ন বিন্দুকে মহামানবের ধারায় সম্মিলিত হতে হবে।"

[বুংদ বুংদ সাধন মিল
হরি সাগর জাহিঁ।]

এই সব কথায় রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন,—দেখুন তো আমাদের রক্তের মধ্যে গতির অতি পুরাতন তাগিদ রয়েচে। তাই আমার মধ্যে সদাই এই গতির জন্য ব্যাকুলতা। তাইতো আমি গেয়ে এসেচি—

'ঘরের ঠিকানা' না হলেও 'প্রাণ করে সদা যাই যাই'।

আমি বলিলাম, "মধ্যযুগের গানে আছে—গ্রামের নাম তো জানা নেই, প্রাণ তবু বলে যাই যাই।"

[নাঁর ন জানুঁ গাঁরকা প্রাণ কহৈ জাঁর জাঁর ।]

কবিগুরু বলিলেন, "আমার বাল্যকাল হতেই আমি গতির উপাসক। আমরা জন্মান্তরবাদী। এদেশে এই গতির ইঙ্গিতই সর্বত্র। মৃত্যু আমাদের শাশ্বত গতিপথের দ্বার খুলে দেয়। যে চলতে চায় না তাকেও মৃত্যু লোক-লোকান্তরে ঠেলে নিয়ে যায়।* জন্মান্তরবাদী এমন দেশে মানুষ কেন জাতি সম্প্রদায় প্রভৃতি কৃত্রিম বাঁধনে বদ্ধ হতে চায় তাই ভাবি। জন্মজন্মান্তরে কত কত জাতি কত কত ধর্ম কত কত দেশ দেখে এসেচি; আরও কত দেখবো। তবে কেন এই সংকীর্ণতা? আমার সর্বজাতীয়তারও মূল এখানেই। কারণ কত দেশ কত জাতির মধ্য দিয়ে আমরা এসেচি ও কত দেশ ও জাতির মধ্য দিয়ে আমাদের ভবিষ্যতে যেতে হবে। কেউ তো আমাদের পর নয়, কেউ তো শত্রু নয়।

"ভাল করে ভেবে দেখলে এই জন্মান্তরবাদ বুদ্ধদেবের মত সর্বজীবে মৈত্রী না হয়ে যায় না। গতির মত মুক্তিদাতা আর নেই।

* মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ। (কঠ ৬, ৩)

"আমার রক্তে সেই গতির ডাক আছে। এখন হয়তো সবাই বলবেন এই ডাকটি আমরা পশ্চিমের মনীষীদের কাছে ছাড়া আর কোথাও পেতে পারিনে। কিন্তু আমি যখন অতি শিশু ছিলাম তখন থেকেই আমি গতির জন্য পাগল। পরে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় হয়তো সেই ভিতরের ডাকটি আর কিছু শক্তিলাভ করেচে কিন্তু আসলে সেই আগে চলবার ব্যাকুলতাটি আমার জন্মগত জিনিস। এখন তো দেখচি এটা আমাদের প্রাচীন মনীষীদেরই চিরদিনের বাণী। 'প্রভাত-সংগীতে' আমি বলেছিলেম—

বাহির হইয়া আয়।

তখন আমার ২১ কি ২২ বছর বয়স। তারও আগে 'সন্ধ্যা-সংগীত'। তাতেও আমার দুঃখ, সবাই আমাকে ফেলে চলে গেল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' আমার জীবন-নির্ঝরের প্রধান কথাই হোলো—

আমি যাব আমি যাব।

সেই নির্ঝরই পরে 'বলাকা'তে নদী হয়ে দেখা দিয়েচে।

"প্রভাত-সংগীতের 'স্রোত' কবিতায় বলেচি—

জগৎ স্রোতে ভেসে চল যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশী চলরে সেথা যাই ॥

"আবার গানের মধ্যেও সেই বেদনা—

ঘরের ঠিকানা হোলো নাগো
মন করিতেছে যাই যাই *…
কবে অকূলের খোলা হাওয়া
দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে।"

তখন আমাদের মধ্যে কেউ একজন বলিলেন, "সেই মানসীর যুগেও (১৮৯০) আপনার 'দুরন্ত আশা' কবিতায় দেখা গেছে আপনার ব্যাকুলতা—

কোথাও যদি ছুটতে পাই
বাঁচিয়া যাই তবে
ভব্যতার গণ্ডী মাঝে
শান্তি নাহি মানি।"

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—"দুঃসময়ে' (কল্পনা) আমি বলেচি 'বন্ধ কোরোনা

* নাঁর ন জানুঁ গাঁরকা
প্রাণ কহে জাঁর জাঁর।

পাখা'। আমরা যে তীর্থযাত্রীর মতো জগতে এসেচি সেই কথাই আমার 'নৈবেদ্য' কবিতাগুলির মর্মকথা। 'শারদ উৎসব', 'ডাকঘর' প্রভৃতি নাটকে ও আমার গানে এই চিরন্তন চলারই তাগিদ। আমার কাব্য আলোচনা করলে সর্বত্রই তার সাক্ষ্য পাবেন।

"আমাদের দেশে সাধকেরা বারবার গতি ও মুক্তিকে যুক্ত করেই দেখেচেন। ভক্তদের চিরদিনের প্রার্থনা, 'আমায় পার কর'। গঙ্গা যতদিন স্বর্গে বদ্ধ ছিলেন ততদিন তাঁর মূল্য কি? যেই তিনি ব্রহ্মকমণ্ডলুর বন্ধনকে বিদীর্ণ করে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন তখনই তিনি ভস্মস্তূপ হতে মৃত সগর-সন্তানদের উদ্ধার করতে পারলেন। তাছাড়া মৃত্যুও একটা বিরাট মুক্তির দ্বার। এই কথা আমি বার বার বলেচি। যাকে সবাই বদ্ধ করে রাখতে চায় তাকেও মৃত্যু এসে অন্তত একদিন মুক্ত করে দেবেই।

[মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।]

"প্রতিদিনই দেখচি বীজ থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর হতে বৃক্ষে, বৃক্ষ হতে ফুলে, ফুল হতে ফলে, ফল হতে বীজে ক্রমাগতই চলচে প্রাণের যাত্রা। জীবনে মরণে সর্বভাবে আমরা গতি ও যাত্রারই লীলা দেখচি। কাজেই আমাদের মনে গতির প্রতি শ্রদ্ধা আসা কিছু অদ্ভুত কথা নয়। তারপর এই যুগেও পাশ্চাত্ত্য নানা চিন্তাও আমাদের মনকে ক্রমাগত নাড়া দিচ্চে। তবে দেখা যাচ্চে আমাদের দেশেও গতির তাগিদ কোনোদিন কম ছিল না। আমাদের দেশেই তার আদি স্থান।

"আগেই বলেচি মুক্ত আত্মাকে আমাদের দেশে হংস বলা হয়েচে। আকাশে যে হংসশ্রেণী দেশ দেশান্তর দিয়ে উড়ে যায় তাকেও সবাই বলাকা বলে। যদিও ঠিক শব্দার্থ ধরলে বকপংক্তিকেই বলাকা বলা ভাল, তবুও হংসপংক্তি অর্থেও ঐ বলাকা কথারই প্রয়োগ করতে হয়। হংসপংক্তির পৃথক্ নাম নেই। মেঘদূতে যে আকাশচারী বলাকার কথা আছে তা বকপংক্তি কি হংসপংক্তির কথা মনে করে কালিদাস বলেছিলেন সে কথা এখন বলা কঠিন।

"এইসব পাখির দল এখানে ঋতুবিশেষে আসে, কিছুকাল এখানে থাকে। আবার সময় হলেই কোথায় যেন উড়ে চলে যায়। কাজেই বলাকা দেখলেই সেই গতির কথা মনে পড়ে।

"আমার 'বলাকা' কবিতাগুলিতেও সেই গতির কথাই বলেচি। গতির ছন্দেই বিশ্বের সৌন্দর্য। গতি নিয়েই সৃষ্টি। এই চরাচর সেই সৃষ্টি বা গতির

প্রবাহ। কি অপূর্ব ছন্দে এই সৃষ্টির প্রবাহ চলেচে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এই প্রবাহে বিশেষ একটিকে প্রাধান্য দিলে ভুল হয়। সর্ব চরাচরের নিখিল মুক্ত প্রবাহের ছন্দকে যোগদৃষ্টিতে যুক্ত করে দেখতে হবে।)

" 'বলাকা'র ভিন্ন ভিন্ন কবিতাগুলির আমি কোন নাম দিতে চাই না। বলাকার অখণ্ড পংক্তিই মনোহর। তার মধ্যে বিশেষ একটি পক্ষীকে বিযুক্ত করে দেখানো চলে না। দালানের খিলানের মধ্যে সবগুলি পাথরেরই যেমন তুল্য-মূল্য, তেমনি 'বলাকা'র প্রত্যেকটি কবিতারই তুল্য-মূল্য। তার মধ্যে তারতম্য করতে গেলেই বিপদ। সারা চরাচরে যেমন সব কিছুই ভেসে চলেচে, এই কবিতাগুলিও তাই। বলাকার মতো এরাও যে কোথা থেকে এল কোথায় যাবে তা কে জানে? কিন্তু এদের এই সবাই মিলে এক সঙ্গে যাত্রার ছন্দেই আমাদের মনও যেন কোন্ অজানার দেশে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করতে চায়। মনে হয় যেন আমিও এই দলেরই পাখি। এখানে কিসের বাঁধনে যেন আপন মর্মকথা ভুলে গিয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে আছি। এদের চলার ইঙ্গিতেই আমার প্রাণেও উড়ে যাবার ব্যাকুলতা আসচে। আমার এই ব্যাকুলতাটি 'বলাকা'তে বিশেষভাবে ব্যক্ত হলেও আমার সব কবিতাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।"
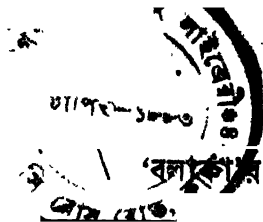
'বলাকা'র জন্ম-কথা

রবীন্দ্রনাথ যে চিরদিনই গতির উপাসক এ-কথা ইতঃপূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৯১২ সালে তাঁহার 'অচলায়তন' ও 'ডাকঘর' বাহির হইল। তারপর তিনি নিজেই নানা দেশে ভ্রমণ করিলেন ও নানা দেশের মনীষীদের সহিত পরিচিত হইলেন। 'গীতাঞ্জলি'র প্রচার হইল। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পাইলেন। ১৯১৪ সালে 'অচলায়তন' অভিনীত হইল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'সবুজপত্র' বাহির হইল। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ নবপ্রাণ ও নবগতির জয়ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই সময়েই প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া 'বলাকা'র কবিতাগুলি একে একে জন্মলাভ করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে ১৯১৬ সালে 'বলাকা' ছাপা হয়। ইহার প্রথম কবিতাটি ১৩২১ সালে ১৫ই বৈশাখ (১৯১৪) শান্তিনিকেতনে লেখা, আর শেষ কবিতাটি ১৩২২ সালে ৯ই বৈশাখ (১৯১৬) কলিকাতায় লেখা। মধ্যে দুই বৎসরের ব্যবধান।

সেই যুগে 'সবুজপত্রে'র তাগিদে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম কবিতাটি শান্তিনিকেতনে লেখা (১৫ই বৈশাখ ১৩২১)। কয়েকদিন পরেই পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও কন্যা মীরাদেবীকে লইয়া কবি রামগড় পর্বতে গেলেন।

রামগড় হিমালয় প্রদেশে আলমোড়ার নিকটে। গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতন হইতে অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেপালী ছাত্র নরভূপ রায় প্রভৃতি অনেকে বদ্রিকা বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহারাও হাঁটিতে হাঁটিতে রামগড় গিয়া পৌঁছিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে কবি অতুলপ্রসাদও সেখানে গিয়া যোগ দিলেন।

খুবই আনন্দ ও উৎসব চলিতেছে, তার মধ্যেও কবির মনে একটা বেদনা। তাহাতেই রামগড়ে (৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) 'বলাকা'র দ্বিতীয় কবিতাটি লেখা। ইহার পরই য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর আসিল। তখন বুঝা গেল কবির মনে তাহারই পূর্বাভাষ বেদনারূপে জাগিয়াছিল। ৬ই জ্যৈষ্ঠ কবি তৃতীয় কবিতাটি লিখিলেন। ১২ই জ্যৈষ্ঠ লিখিলেন চতুর্থ কবিতাটি। ১৩২১ সালের আষাঢ়ের 'সবুজপত্রে' ইহা বাহির হইল। এই সময় রবীন্দ্রনাথের মনে এক দারুণ অশান্তি ও বেদনার ভাব। তাঁহার কবিতা ও পত্রগুলিতে তাহা বুঝা

যায়। যুদ্ধের খবর আসিলে বুঝা গেল যে ভিতরে ভিতরে তাহার কারণ ছিল, যদিও কবি তাহার খবর তখনও জানিতেন না।

আরও কয়েকদিন পরে, জ্যৈষ্ঠ মাস সমাপ্ত হইবার আগেই, রবীন্দ্রনাথ পাহাড় হইতে নামিলেন। রামগড় হইতে কাঠগুদাম ১৬ মাইল। এতটা পথ তিনি পায়ে হাঁটিয়া নামিলেন। এবং লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদের আতিথ্য স্বীকার করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন। ইতিমধ্যে গ্রীষ্মাবসানে বিদ্যালয় খুলিয়া যাওয়ায় কলিকাতা হইতে রবীন্দ্রনাথ আষাঢ় মাসে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। 'বলাকা'র কবিতা কিছুদিন বন্ধ রহিল।

১৩২১ সালে ৫ই ভাদ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশৎতম জন্মতিথির উৎসবে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা যান। এই ৫ই ভাদ্র তারিখেই কলিকাতায় 'বলাকা'র ৫ম কবিতার জন্ম। কলিকাতায় এই কবিতাটি প্রথম দেখিতে পান রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাহার পর কার্তিক মাস পর্যন্ত 'বলাকা'র আর কোনো কবিতা লেখা হয় নাই।

কলিকাতা হইতে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূসহ কিছুদিন সুরুলের (শ্রীনিকেতনের) বাড়ীতে বাস করিলেন। বৈকালে গোরুর গাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আসিতেন এবং দিনেন্দ্রনাথের বেণুকুঞ্জে গান শিখাইতে বসিতেন। সুরুলে (শ্রীনিকেতনে) পুত্র ও পুত্রবধূর ম্যালেরিয়া হওয়ায় পূজার ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

পূজার ছুটিতে শ্রীঅসিতকুমার হালদার ও স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়া থাকিবার পরামর্শ করেন। রবীন্দ্রনাথের জামাতা শ্রীনগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীও সেই সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এইসব শুনিয়া রবীন্দ্রনাথও যাত্রিদলে যোগ দিতে উদ্যত হইলেন। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ও কন্যা মীরাদেবীও সঙ্গে চলিলেন। বেশ বড় দল হইল। আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য বুদ্ধগয়ার মহন্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। ২৩শে আশ্বিন যাত্রা করিয়া গয়াতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক দলবল-সহ উপস্থিত হইলেন। কবি সেখানকার মহন্তরই অতিথি হইলেন। তখন গয়াবাসী সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই দলে যোগ দিলেন। ২৩-২৫ আশ্বিনে 'গীতালি'র ৮৫-৯৪ এই দশটি গান তাঁহার বুদ্ধগয়াতে রচিত। গানের ভাবে তিনি তখন মশ্‌গুল।

এই যাত্রাতেই নন্দলাল বাবু নামে এক ব্যক্তি (শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু নহেন) কবিকে 'বরাবর' পর্বতের গুহাগুলি দেখিবার জন্য ধরেন। ব্যবস্থার ভার নন্দলাল বাবুই গ্রহণ করেন। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা না হওয়ায় ২৫শে আশ্বিন কবি বহু দুঃখ পাইয়া গুহা না দেখিয়াই 'বরাবর' হইতে গয়া ফিরিয়া আসেন। গয়া হইতে 'বেলা' স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনে যাইতে হয়। 'বেলা' হইতে 'বরাবর' পর্বত ১১ মাইল। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে এতটা পথ যাওয়া-আসা সহজ কথা নয়। অন্ন-পানীয় কিছুই সঙ্গে নাই। তারই মধ্যে কবি 'বেলা' (Bela) স্টেশনে বসিয়া লিখিলেন

পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে (৯৫নং গানটি)।

'বেলা' হইতে পাল্কী পথে যাইতে দুইটি গান (৯৬, ৯৭নং) রচিত হইল। 'বেলা' হইতে গয়া আসিতে ট্রেনে বসিয়া তিনি লিখিলেন—

পথের সাথী, নমি বারম্বার (৯৮নং গান)।

অনেক কষ্টে দলবল সহ কবি রাত্রে 'বেলা' হইতে গয়া ফিরিলেন।

গয়া হইতে রবীন্দ্রনাথ আর সকলকে বিদায় দিয়া চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। চারুবাবু পূর্বে বহুদিন এলাহাবাদেই ছিলেন, তাই তাঁহাকে কবি ছাড়িলেন না। যৌবনে কবি কিছুকাল গাজীপুর ছিলেন, তারপর আর এতদিন এইসব প্রদেশে আসেন নাই।

এবারে এলাহাবাদে আসিয়া ২৯শে আশ্বিন কবি 'গীতালি'র দুইটি গান রচনা করিলেন (৯৯, ১০০)। তারপর 'গীতালি'র বাকী সবটাই এলাহাবাদে লেখা (১০১-১০৮নং)। ৩রা কার্তিক প্রভাতে 'গীতালি'র শেষ কবিতাটি লিখিয়া কবি 'বলাকা'র ছয় নম্বর কবিতাটি লিখিলেন। এই কবিতাটি 'ছবি' নামেই বিখ্যাত। এখানেই ১৫ই কার্তিক কবি 'বলাকা'র সাত নম্বর ('সাজাহান') কবিতা লেখেন। এলাহাবাদে কবি তাঁহার ভাগিনেয় সত্যপ্রকাশ গাঙ্গুলীর পুত্র সুপ্রকাশ গাঙ্গুলীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিল। কবি শান্তিনিকেতন ফিরিলেন। মধ্যে একবার পুত্র-পুত্রবধূকে লইয়া কয়েকদিনের জন্য কবি দার্জিলিং হইয়া আসিলেন। শান্তিনিকেতন ফিরিয়াই অগ্রহায়ণ মাসে কবি আগ্রা গেলেন। এই সময়েই মহাত্মাজীর ফিনিক্স্ বিদ্যালয়ের ছাত্র ও গুরুরা কবির নিমন্ত্রণে কিছুকালের জন্য শান্তিনিকেতনে বাস করিতে আসেন। ফিনিক্স্ বিদ্যালয়ের গুরুদের মধ্যে ছিলেন ৺মগনলাল গান্ধী, শ্রীরাজঙ্গম্ (এখন নাম হরিহর শাস্ত্রী),

চিন্তামণি শাস্ত্রী, কাকা কালেলকর প্রভৃতি। কাকা কালেলকর ও আমি তখন কিছুদিন একই ঘরে বাস করিতাম।

আগ্রা হইতে এলাহাবাদে আসিয়া কবি আবার 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতা লিখিলেন। ৮নং কবিতাটি এলাহাবাদে ৩রা পৌষ তারিখে লেখা। ৯নং কবিতাও ৫ই পৌষ এলাহাবাদেই লেখা।

৭ই পৌষের উৎসব আসিল। কবিকে শান্তিনিকেতনে আসিতে হইল। উৎসবের গোলমালে তিন চারি দিন গেল। ১০ই পৌষ শান্তিনিকেতনে তিনি 'বলাকা'র দশ নম্বর কবিতা লিখিলেন। ১২ই পৌষ ১১ নম্বর এবং ১৩ই পৌষ ১২ নম্বর কবিতা তিনি শান্তিনিকেতনেই লিখিলেন। ১৩নং কবিতাটি ২৩শে পৌষ সুরুলে (শ্রীনিকেতনে) বসিয়া লেখা। ২৬শে পৌষ শান্তিনিকেতনে বসিয়া কবি ১৪নং কবিতাটি লিখিলেন। ১৫, ১৬ দুইটি কবিতা ২ শে পৌষ সুরুলে (শ্রীনিকেতনে) লেখা হইল। ১৮, ১৯ কবিতা দুইটি সুরুলেই (শ্রীনিকেতনেই) ২৯শে পৌষ প্রভাতকালে রচিত। ১৮নং কবিতা সূর্যোদয়ের পূর্বে অরুণালোকের যাত্রার আহ্বান মনের মধ্যে পাইয়া কবি কবিতাতে পরিণত করেন।

ঐ কবিতাটি লেখার পর সেই দিনই কবি মাঘোৎসবের আয়োজনে কলিকাতা যাত্রা করিয়া ট্রেনে বসিয়াই ২০ নম্বর কবিতাটি লিখিলেন। সেবার মাঘের প্রথমেই কয়েকদিন দক্ষিণা বাতাস দিয়াছিল। সেই বাতাসে রেলপথের দুই ধারে জানা-অজানা বহু ফুলের নবজন্ম-সমারোহে কবির মন তখন ভরপুর। সব ফুলের নামতো জানা নাই, কিন্তু অজানা নানা ফুলের অভ্যর্থনা পাইয়াই কবি ধন্য। কলিকাতা পৌঁছিয়াও মাঘোৎসবের ব্যস্ততায় সেই আনন্দ প্রকাশ করিবার অবসর তিনি পাইলেন না। ৮ই মাঘ তিনি ২১নং কবিতায় তাঁহার সেই আনন্দটিকে রূপ দিলেন। কলিকাতায় মাঘোৎসব ও গোলমালে কবি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। এই একটি কবিতা ছাড়া আর কোনো কবিতা লিখিবার অবসরও তখন তিনি পান নাই।

১৮ই মাঘ শিলাইদহে নির্জন পদ্মাতীরে গিয়া কবি যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ১৯শে মাঘ ২২নং এবং ২০শে মাঘ ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬নং কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন। ২২শে মাঘ ২৭নং, ২৪শে মাঘ ২৮নং, ২৫শে মাঘ ২৯নং, ২৬শে মাঘ ৩০নং এবং ২৭শে মাঘ ৩১, ৩২ ও ৩৩নং কবিতা রচনা করিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় কবি তখন মনের মধ্যে কাব্যলক্ষ্মীকে আবাহনের ঠিক

অনুকূল অবস্থাটি পাইয়াছিলেন। নয় দিনে এতগুলি কবিতা লেখাতো সহজ কথা নহে।

মাঘ মাসের ২৭শে তারিখেও কবি পদ্মাতীরে 'বলাকা'র কবিতা রচনায় রত ছিলেন। তাহার পরই তিনি কলিকাতায় আসিয়া দেশের নানা কাজে আটকা পড়েন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সময় ৫ই ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) মহাত্মাজী পত্নীসহ শান্তিনিকেতনে আসেন। এখানকার অভ্যর্থনায় মহাত্মাজী পরিতৃপ্ত হন, কিন্তু হঠাৎ গোখেলের মৃত্যুসংবাদে তাঁহাকে পুণা যাইতে হইয়াছিল।

এই সময় রাজরোষে নিগৃহীত রাজপুতানাবাসী প্রতাপ শেঠির পুত্র অর্জুন শেঠিকেও কবি শান্তিনিকেতনে আশ্রয় দেন। পরে এই কারণে তিনি রাজ-পুরুষদের কোপে পতিত হন। কলিকাতার কাজ অসমাপ্ত রাখিয়াই অর্জুন শেঠিকে আশ্রয় দিতে কবিকে শান্তিনিকেতনে ফিরিতে হয়।

১০ই ফাল্গুন কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবি একেবারে সুরুল (শ্রীনিকেতন) চলিয়া গেলেন। সেখানে কবি 'ফাল্গুনী' নাটক লেখা সমাপ্ত করিয়া ২০শে ফাল্গুন আশ্রমে সকলের কাছে তাহা পাঠ করেন। ২২শে ফাল্গুন মহাত্মাজী পত্নীসহ পুনরায় আশ্রমে আসিলে কবির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ২৭শে ফাল্গুন মহাত্মাজী ডাক্তার মেটার (Mehta) নিমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন হইতে ব্রহ্মদেশে রওনা হন। এই সময় আশ্রমে কাজকর্ম রীতিনীতি জাতিপংক্তি লইয়া নানা তর্ক ও ওলটপালট চলিয়াছিল।

তাহার মধ্যে ২০শে মার্চ লর্ড কারমাইকেল আশ্রমে আসেন। কবির সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। ১৪ই চৈত্র কবি বক্তৃতা দিতে কলিকাতা যান। এই সব হাঙ্গামায় 'বলাকা'র কবিতা আর লেখা হয় নাই। কলিকাতা হইতে আসিয়া ২১শে চৈত্র সুরুলে (শ্রীনিকেতন) তিনি ৩৪নং কবিতাটি লিখিলেন। ইতিমধ্যে 'ফাল্গুনী'র গান, তাহার সুর, তাহার শিক্ষণ লইয়া কবি খুবই ব্যস্ত। 'ফাল্গুনী'তে গানও অল্প নয়। সঙ্গে সঙ্গে আসিল বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব। 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়ের জন্যও রবীন্দ্রনাথ খুব ব্যস্ত। তাহাতে তিনি অন্ধ বাউল সাজিলেন।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কবি শান্তিনিকেতনেই রহিলেন। একদিন এন্ড্রুজ সাহেবের হইল কলেরা। অনেক চেষ্টায় সেবার এন্ড্রুজ সাহেব রক্ষা পান। ইহার পর কবি একবার কলিকাতা যান। নানা কারণে কবির মনে নানা দুশ্চিন্তা লাগিয়া ছিল। কবি শিলাইদহে কিছুদিন থাকিয়া কলিকাতা

আসিলেন। ২৪শে শ্রাবণ কবি আশ্রমে ফিরিলেন। বর্ষা উৎসবের পর কবি শারদোৎসব অভিনয়ের জন্য ছেলেদের লইয়া ব্যস্ত। তাহার মধ্যে ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় রামমোহন রায় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া আসিলেন। এই সব নানা গোলমালে 'বলাকা'র কবিতা আর লেখাই হইতেছিল না। ইতিমধ্যে কাশ্মীর যাইবার নিমন্ত্রণ আসিল।

পুত্র, পুত্রবধূ ও কবি সত্যেন্দ্র দত্তকে লইয়া কবি কাশ্মীর যাত্রা করিলেন এবং মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। বহুদিন পরে ১৩২২ সালের ৭ই কার্তিক 'বলাকা'র ৩৫ নম্বর কবিতাটি শ্রীনগরে লেখা হইল। ২১শে চৈত্রের পরে এতদিনে এই কবিতার জন্ম। তার পরের কবিতাটিই আসল 'বলাকা'। তাহাও কয়েকদিন পরেই শ্রীনগরে লেখা। শ্রীনগরে ঝিলমের স্তব্ধ জলরাশির উপর দিয়া একদল বলাকা উড়িয়া গেল। তাহার ফলেই এই অপূর্ব কবিতাটির উদয় হইল। এই কবিতার নামেই সমস্ত পুস্তকের নাম হইল 'বলাকা'। ৩৭নং কবিতাটিও ২৩শে কার্তিক এখানেই লেখা।

কাশ্মীর হইতে আসিয়াই কবি শিলাইদহ গেলেন। সেখানে পদ্মাবক্ষে ১২ই অগ্রহায়ণ (১৩২২) কবি 'বলাকা'র ৩৮ নম্বর ও ১৩ই অগ্রহায়ণ ৩৯নং কবিতা লেখেন। ইহার পরই শিলাইদহ হইতে কবি কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু ৭ই পৌষের উৎসবের জন্য তিনি অনতিবিলম্বে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। তাহার পর কলিকাতায় ১১ই মাঘ ব্রহ্মোৎসব হইল। উৎসবের পরে 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয় হইল। ৭ই ফাল্গুন শিলাইদহে বসিয়া কবি ৪০ নম্বর ও ৮ই ফাল্গুন ৪১-৪২ নম্বর কবিতা লিখিলেন। ইহার পর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া ২৯শে ফাল্গুন 'বলাকা'র ৪৩ নম্বর ও ৪ঠা চৈত্র ৪৪ নম্বর কবিতা লিখিলেন।

শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষ উৎসব গেল। কবির মনও হংস-বলাকার মতই কোথায় যেন যাইবার জন্য চঞ্চল। বৈশাখের ৯ই কলিকাতায় আসিয়া তিনি 'বলাকা'র শেষ কবিতাটি লিখিলেন (১৩২৩ সাল)। নব বৎসরের আশীর্বাদরূপে তিনি রুদ্রের প্রসাদকে প্রত্যক্ষ করিলেন। বলিলেন,

হোক্‌রে দ্বারের বন্ধ দূর……।

ইহার পরে তিনি যে জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গেলেন তাহার মধ্যেও হংস-বলাকার এই গতি-ব্যাকুলতাই দেখিতে পাই।

'বলাকা'র ছন্দ*

১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বিশ্বভারতীর ক্লাসে কবিগুরু 'বলাকা'র কবিতাগুলি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দুই একদিন মৌখিক কিছু আলোচনায় কাটিয়া গেল। তাহার পর পড়া চলিল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি আপন বক্তব্য বলিয়া যান, আর অনেকে বসিয়া লেখেন। তাহার মধ্যে শ্রীমান্ প্রদ্যোতকুমারের লেখাও ভাল এবং লিখিয়া নিবার বিশেষ পটুতাও আছে। সকলের অনুরোধে তিনি পরে তাঁহার নোটগুলি 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় ছাপাইয়াও দেন।

অগ্রহায়ণের পরেই পৌষ মাস আসিল। পরলোকগত সিলভ্যাঁ লেভি আসিয়া বিশ্বভারতীতে পড়াইতেছেন। ৭ই পৌষ, উৎসবের মধ্যে স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় অনুষ্ঠানসহ রীতিমত বিশ্বভারতী স্থাপনা করিলেন। কবি অতিশয় ব্যস্ত। তাই 'বলাকা' অধ্যাপনার কাজ কিছুদিনের জন্য স্থগিত রহিল।

ইতিমধ্যে 'বলাকা'র দশ নম্বর কবিতা উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকজন কবিকে ধরিলেন 'বলাকা'র ছন্দ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য। তখন কবির অতিশয় ব্যস্ততা। কাজেই পুরাদস্তুর ক্লাস করিতে গেলে চলিবে না। তাই তাঁহারা এক এক সময় [illegible]া-প্রসঙ্গে ছন্দের কথা তোলেন। ছন্দের কথা উঠিলেই কবি একেবারে মশ্‌গুল হইয়া যান। তখন আর অবসর অনবসরের কথা মনেই আসে না। এই রকম একদিন একটা মুহূর্তে কবিগুরু 'বলাকা'র ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী ছন্দ-সাধনার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস বলেন। কথাটি আরও দুই-এক দিন চলে।

কবি বলিলেন, "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঠিক [illegible] সবাই আপন আপন শিল্পের দ্বারা দে[illegible] পূজা করচেন। দেবশিল্পেরই

* ছন্দ সম্বন্ধে কবিগুরুর এই আলোচনা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বলা। কা[illegible] ইহাতে পুনরাবৃত্তি দোষ থাকিয়া যাইতে বাধ্য।

কবিগুরুর বহুকাল পরে বলা ছন্দোবিষয়ক আরও নানা কথাও এইখানেই বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই কালগত ব্যবধানও এই ক্ষেত্রে সহ্য করিয়া লইতে হইবে।

প্রাণমন্ত্রে এইসব কবি ও শিল্পীদের কাব্যের ও শিল্পের প্রাণ। কবি ও শিল্পীরা এই রকমেই আপনাদের বিশ্বছন্দে ছন্দোময় করে তোলেন।*

"বিশ্বশিল্পীর ছন্দও বিশ্বব্যাপী। এই পৃথিবীতে আমাদের পাঁচটা মাত্র ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বছন্দের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিচয় হোলো রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে। রূপ হোলো এই পঞ্চ পরিচয়ের আদিতে, শব্দ হোলো তার সর্বশেষে। সর্বত্রই অণুপরমাণুর বিশেষ বিশেষ রকমের তরঙ্গলীলা। রূপেতে যে তরঙ্গমালা চলেচে তার খুব উঁচুতেও আমরা দেখতে পাইনা, খুব নিচুতেও দেখবার শক্তি আমাদের নেই। লালের নীচে বা বেগুনী রঙের উপরে দেখবার শক্তি আমাদের নেই। ঐটুকু দৃষ্টি-ক্ষেত্রের মধ্যেই সাতটি বর্ণের ছন্দোলীলা। আবার শব্দেও আমরা খুব উঁচু বা নিচু তরঙ্গ শুনতে পাইনে। তার মধ্যেও ঠিক সেইরূপ ছন্দে সপ্তস্বরের বিহার। কাজেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আদি ও অন্ত অর্থাৎ রূপ ও শব্দের ক্ষেত্রে একই রকমের ছন্দোময়ী সপ্তকলীলার পরিচয় মেলে। হয়তো এই ছন্দোলীলাটি আরও অগণিত ক্ষেত্রে আছে কিন্তু আমাদের পক্ষে তাদের পরিচয় পাবার উপায় নেই। যতদূর দেখতে পাই তাতে দেখচি ছন্দ হতে ছন্দে বিশ্বরূপের এক অপরূপ লীলা।† পাঁচটি মাত্র ইন্দ্রিয় দিয়ে তার পঞ্চধা পরিচয় মাত্র আমরা এই জীবনে পেয়েচি। আর পরিচয় আমরা পাব কেমন করে?

"এখন তো বৈজ্ঞানিকেরাও এই কথাই বলচেন। জগতে আমরা যে নানা বস্তুর নানা নাম ও রূপ দেখতে পাই তার কারণ হচ্চে পরমাণুদের নানারূপ নৃত্য-ছন্দের লীলা। কাজেই সব কিছুতে ছন্দ আছে শুধু এই কথা বল্লেই যথেষ্ট বলা হয় না। বরং এই কথাই বলতে হয় যে ছন্দ হতেই সব কিছুর এই সব নাম, রূপ ও সত্তা অভিব্যক্ত। কাজেই বিশ্বসৃষ্টির মূলেই হচ্চে ছন্দের লীলা। ছন্দের বৈচিত্র্যই আমাদের জীবনের ও রসের বৈচিত্র্য। তাকে আবিষ্কার করে ব্যবহার করার মধ্যেই কবির প্রতিভা।

"কবিদের ছন্দের মূলেও এই বিশ্বছন্দ। যুগে যুগে দেশে দেশে নানা ভাষায় কত যে কাব্যছন্দ হয়েচে ও হবে তার কি শেষ আছে?

---

* ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেব শিল্পানি।…এতেষাং বৈ শিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে। …ছন্দোময়ং বা এতৈ র্যজমান আত্মানম্ সংস্কুরুতে। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৬, ৫, ১)

† তুলনীয়—বিশ্বরূপশ্ছন্দেভ্যশ্ছন্দাংসি আবিবেশ। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৭, ৪, ১; মহানারায়ণ উপনিষৎ ৭, ৫)

আপনাদের কাছেই বৈদিক ছন্দশাস্ত্রের আচার্য পিঙ্গলের কথা শুনেচি। তিনি ছন্দের যা রীতি-পদ্ধতি দেখিয়েচেন তাতে নাকি আমাদের স্বর-ব্যঞ্জন-বৈচিত্র্য-সমাবেশে লক্ষ-লক্ষ ছন্দ পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য কোনো একটি দেশে কোনো বিশেষ যুগেই এতগুলি ছন্দের প্রয়োজন ও উপলব্ধি ঘটতে পারে না। তবু তাতে সর্বদেশের সর্বযুগের নানা ভাষাতে কবিদের বলবার পথ কোনোমতেই যে বদ্ধ বা সংকীর্ণ নয় এই কথাই আচার্য পিঙ্গল জানিয়ে গেলেন।

"আর একটা মজার কথা। তিনি লিখেচেন পদ্যের ছন্দ সম্বন্ধে, গদ্যের ছন্দ সম্বন্ধে নয়। অথচ তাঁর লেখাটা আগাগোড়া চলেচে গদ্য-ছন্দে। কাজেই তিনি প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলেন, 'গদ্য-ছন্দের কথাও জানি কারণ গদ্য-ছন্দেই এখন বলচি, তবে গদ্য-ছন্দের কথা এখন বোলবো না। পদ্য-ছন্দের সম্বন্ধে যা বলবার তাই এখন বলচি, তাই শোনো'।

"অনেকদিন আগে* শান্তিনিকেতনে আমাদের পাঠসভাতে কিছুদিন যে ছান্দোগ্য উপনিষৎ পড়া চলেছিল, তাতে একটা জায়গায় আমি চমকে উঠেছিলুম। দেবতারা নাকি মৃত্যু-ভয়ে ভীত হয়ে ত্রয়ী বিদ্যা অর্থাৎ বেদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং ছন্দের দ্বারা আচ্ছাদন করলেন। ঐ যে 'ছন্দের দ্বারা আচ্ছাদন করলেন' তাই হোলো ছন্দের নিজস্ব মর্মকথা।† ছদ্ ধাতুর অর্থ ই যে আচ্ছাদন করা।

"দেবতারা নাকি অমৃতের দ্বারা মৃত্যুকে জয় করেচেন। এখানে দেখা যাচ্চে ছন্দই সেই অমৃত। এই ছন্দের দ্বারাই মৃত্যু হতে রক্ষা পাবার জন্য আচ্ছাদন করা হোলো। এদিকে ছন্দের অর্থ ইচ্ছা, কামনা, গোপন, খুসি, ইত্যাদি। যে আচ্ছাদন আমাদের ঢেকে রেখে খুসি করতে, মুগ্ধ করতে চায় তাইতো সৌন্দর্যের আচ্ছাদন।

"মোহময় এই আচ্ছাদন হতে মুক্তি পেয়ে আপন স্বরূপ দেখাবার জন্যই তো ব্যাকুলতা এসেছিল মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মনে। 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের ভিতরের কথাই তো তাই। আর উপনিষদেও দেখি এই ব্যাকুলতা—'হিরণ্ময়

---

* ১৯০৯ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমের পাঠসভাতে।

† দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যত স্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ং স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্। (১, ৪, ২)

পাত্রে সত্যের মুখখানি ঢাকা পড়েচে। সত্যধর্মের উপলব্ধির জন্য সেই আবরণটি সরিয়ে দাও'।*

"অমৃতময় অপরূপ সুন্দর এই আচ্ছাদন হতে মুক্তি পাবার জন্য যদিও মন হয় আকুল, তবু আচ্ছাদনই মনকে ক্রমাগত টানে। যা অত্যন্ত অনাবৃত তার দিকে মন একটুও আকৃষ্ট হয় না। প্রতিদিন যাকে দেখি, তার রূপখানি আমাদের চোখে ধরাই পড়ে না। তাকেই সাজে-গোজে নেপথ্য-রচনার কলাকৌশলে একটু আচ্ছাদন করতে পারলে তার রূপটি মনোহর হয়ে ধরা পড়ে। এইজন্য জানা কথাকেও যখন কাব্য ও ছন্দের প্রসাধনে একটু আচ্ছাদন করা যায় তখনই তার ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের উপেক্ষিত এমন বহু বিষয় আছে যা ছন্দোবৈচিত্র্যের দ্বারা বা ভাষান্তরে রূপান্তরিত হলে তবেই তার রহস্যটুকু আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

"ছেলেবেলায় গান শুনেছিলেম—

তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে ?

হয়তো ব্রজবালার যে রূপখানি তার চিরপ্রচলিত বেশে ধরা পড়েনি, সেটি ধরা পড়তে পারতো তার বিদেশিনী সাজে।

"নতুন স্থানে নতুন দৃষ্টি নিয়ে দেখবার মধ্যে যে রহস্য আছে সে কথা আমার জীবনস্মৃতিতে লিখেচি। আমি তাই কলকাতার রাস্তাতেও চলতে চলতে ভাল করে সব কিছু দেখে নেবার জন্য নিজেকে অনেক সময় বিদেশী বলে কল্পনা করেচি।†

"রূপ যদি অনাবৃত হোতো তবে তার মধ্যে কোনো আকর্ষণ থাকতো না। পত্রে-পল্লবে ফুলের শোভার আবরণ আছে। তাই ফুল আরও অপরূপ মনে হয়। আর নানা আবরণের মধ্য দিয়েই মানুষের আকর্ষণও ফুটে ওঠে।

* হিরণ্ময়েন পাত্রেণ
সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু
সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে। (ঈ. উ, ১৫)

† "নূতন পরিচয়ের ঐ একটা মস্ত সুবিধা।···· তাই আমি এক একদিন কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে নিজেকে বিদেশী বলিয়া কল্পনা করি। তখনি বুঝিতে পারি দেখিবার জিনিস ঢের আছে; কেবল মন দিবার মূল্য দিই না বলিয়া দেখিতে পাই না। এই কারণেই দেখিবার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য লোকে বিদেশে যায়।" (জীবনস্মৃতি, হিমালয়-যাত্রা)

"মনোভাবের রহস্য-লীলার ফলে অন্যের মনটি জানবার জন্য আমাদের এত আগ্রহ। তাই গানেও বলেচি—

তোমার গোপন কথাটি, তুমি রেখোনা মনে।

আবার অতি-আচ্ছাদনেও সব চাপা পড়ে। অতি-আচ্ছাদনে রহস্যরস চলে যায়।

"অলংকারশাস্ত্রমতেও শুনেচি কাব্যরসের জন্য যেমন একটুখানি আবরণ দরকার তেমনি একটুখানি অনাবরণও চাই। আবার অতিরিক্ত অনাবৃত হওয়াও দোষের। সেইজন্য ছন্দ একটি মধ্যপন্থা। সংগীতে যেমন অতি-ঢিলা তারে সুর বাজেনা, তেমনি অতি-কড়া বাঁধনেও তার ছিঁড়ে যায়। ছন্দ হোলো সূর্যের মতো মধ্যলীলাময় আবরণ বা হিরণ্ময় পাত্র। বিশ্বরচয়িতা তাঁর মর্মসত্যকে এই হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে ঢেকে রেখেচেন। এই হিরণ্ময় পাত্রেই তিনি তাঁর আপন অমৃত-রস আমাদের পরিবেশন করেন।

[হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের—আত্মানং ছন্দোময়ং কুরুতে—এই বাণীটি ছন্দ সম্বন্ধে অতি চমৎকার কথা। 'আত্মানং ছন্দোময়ং কুরুতে' কথাটির তুলনা নেই। ছন্দ সম্বন্ধে বেদ উপনিষদের আরও কিছু উপকরণ পেলে হয়তো কিছু নতুন আলোক পাওয়া যেত। আপনারা যদি তা আমাকে দিতে পারেন তবে আরও কিছু ভেবে বলতে পারি।"

[সেইদিনের মতো আলোচনা শেষ হইল।

কবিগুরুকে ছন্দ সম্বন্ধে পরদিন সকালে কিছু বৈদিক মন্ত্র, পুরাণের শ্লোক ও প্রাকৃত শাস্ত্রের বাণী দেওয়া হয়। তিনি সেগুলি দেখিয়া তার কয়েকটি মন্ত্র বাছিয়া নেন। সেদিন আর কোনো আলোচনা না করিয়া পরদিন সন্ধ্যায় আবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—]

"বৈদিক মন্ত্রগুলির এক একটিতে অদ্ভুত আলোক পাওয়া যায়। ছন্দ সম্বন্ধে আমাদের মনকে তা জাগিয়ে তোলে। বিশ্বচরাচরে সর্বত্রই তো ছন্দোলীলা রয়েচে। তার মধ্যে বিশেষ করে যে জলের গতিতেই ছন্দ দেখতে পাই সে কথা তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১০, ২২, ১) লক্ষ্য করেচেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 'ছন্দাংসি আপঃ' এই কথাটি মহানারায়ণ উপনিষদেও দেখা যায় (১৪, ১)। অথর্ববেদ বৃষ্টিধারার গতিকে সর্পগতিলীলার সঙ্গে তুলনা করেচেন।

[উৎসা অজাগরা উত। (৪, ১৫, ৭)।]

"অপ্‌সরা কথার অর্থই হোলো যারা জলের গতির সঙ্গে সেই ছন্দে নেচে চলেচে—ঝর্ণা-নির্ঝরিণী-নদীর তালে তালে।

"ছন্দটা বিশেষ করে যে গাছের পাতায় দেখা যায় তার একটু আভাস পাই গীতার 'ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি' (১৫,১) কথায়। আবার নৃসিংহ পূর্বতাপনী উপনিষৎ বেশ বলেচেন—ছন্দাংসি বৈ পর্ণানি (৫, ১)—অর্থাৎ পাতাগুলিই ছন্দ।

"পাতাতেই বিশ্বছন্দের ঠিক রূপটি দেখা যায়। কোনো কোনো পাতা দ্বিদল। কোনো কোনো পাতা ত্রিদল, কোনোটা বা পঞ্চদল বা সপ্তদল। তেঁতুল পাতা, বেলপাতা, আম্রপল্লব, ছাতিম প্রভৃতির পল্লব দেখলেই তা বুঝবেন। দুইয়ের ছন্দ চৌকো—তা থেমে আসে। তিনের মাত্রা চৌকো নয়। তা গোল, গড়িয়ে যেতে পারে। আমাদের চৌকো পয়ার ছন্দে অভ্যস্ত দেশের কাব্যের মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্তী তিন মাত্রার গড়িয়ে চলার ছন্দ আনলেন। এইসব কথা আমি আপনাদের আরও বলেচি তাই আজ আর সে-সব কথা বলবো না। তা অন্যত্র দেখবেন।

"মানুষের দুই হাত, দুই পা; তার সঙ্গে মাথা এসে পাঁচ অঙ্গ বা বিষম ছন্দ হোলো। তাই মহানারায়ণ উপনিষৎ বল্লেন—ছন্দাংসি অঙ্গেষু আশ্রিতানি। অথর্বের মধ্যেও সেই কথাই দেখা যাচ্চে—পাঁচের ছন্দেই পঞ্চাঙ্গ মানুষ হয়েচে।

[পাংক্তং ছন্দঃ পুরুষো বভূব। (১২, ৩, ১০)।]

"বৃহদারণ্যকেও দেখতে পাই (১, ৪, ১৭),—পঞ্চাঙ্গ পুরুষ, সবই পঞ্চাঙ্গ।

[পাংক্তঃ পুরুষঃ। পাংক্তমিদং সর্বং যদিদং কিঞ্চ।]

"তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বল্লেন,—সবই পঞ্চাঙ্গ। পঞ্চাঙ্গ দিয়েই পঞ্চাঙ্গ পায়। অর্থাৎ মানবের বিষম ছন্দ দিয়েই বিষম বিশ্বছন্দকে পাওয়া যায়।

[পাংক্তং বা ইদং সর্বম্। পাংক্তেনৈব পাংক্তং স্পৃণোতি। (১, ৭, ১)।]

"এই ছন্দের অমৃতবন্যাতেই সব কিছু প্লাবিত। চরাচরে কোথাও কোনো শূন্যতা নেই, সর্বত্রই এই অমৃত-প্রবাহ। আপনাদের মন্ত্রগুলির মধ্যে যদিও সেই মধুবাতা ঋতায়তে* মন্ত্রটি নেই তবু আজও প্রতি শ্রাদ্ধকালে উচ্চারিত

* মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যো মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ॥

ঋষি গোতমের সেই মন্ত্রটি মনে পড়চে।—বায়ুতে চলচে অমৃতের বন্যা, সেই বন্যাই নদীতে সাগরে। ওষধির নৃত্যে, উষাসন্ধ্যার ধীরপদসঞ্চারে, পৃথিবীর ধূলায়, দ্যুলোকের মহত্ত্বে, বনস্পতির ছায়ায়, সূর্যের আলোয়, সর্বজীবে আজ সেই অমৃতকেই প্রত্যক্ষ করতে চাই। আমাদের ছন্দ দিয়ে বিশ্বছন্দের সেই অমৃত-প্লাবনকে উপলব্ধি করতে হবে।

"ছন্দের এই অমৃতলীলা শুধুতো মর্ত্যলোকেই সীমাবদ্ধ নয়, অন্তরীক্ষে বা দ্যুলোকে সর্বত্র এই লীলা।

"অন্তরীক্ষের নাম রোদসী বা ক্রন্দসী। এই রোদন বা ক্রন্দনের এই হেতু যে, সেখানে (শূন্য অন্তরীক্ষে) সেই প্রকাশের কোনো উপায় নেই। পৃথিবীতে নদী সমুদ্র, গিরি দরী, বৃক্ষ লতা, জীব মানব নানারূপে সেই ছন্দের প্রকাশ আছে। দ্যুলোকে জ্যোতির্ময় গ্রহ-চন্দ্র-তারা-সৌরমণ্ডলে সেই ছন্দ দীপ্যমান। কিন্তু শূন্য অন্তরীক্ষে প্রকাশ হবে কিসে? সেখানে অব্যক্ত-গায়ত্রীর ছন্দের বেদনায় সব শূন্যতা ভ'রে রয়েচে। সেই বেদনায় সব আকাশ বেদনাময়।

[অব্যক্তগায়ত্রী ছন্দঃ। (হংস উপ ৫, ২)]

"দ্যুলোকের নীল-আকাশ-সাগরে উজ্জ্বল হংসের মতো যে জ্যোতির্ময় সৌরমণ্ডলী এই ছন্দেই ভেসে চলেচে, তাই দেখে যজুর্বেদের মৈত্রায়ণী সংহিতা বল্লেন,—

ছন্দোভির্হংসঃ শুচিষৎ ॥ (৩, ১১, ৬)

"অথর্ববেদে আচার্য বল্লেন, বিরাটের তো প্রকাশ নেই, তাই তিনি মানবলোকে এলেন সপ্তঋষির কাছে। বল্লেন, আমাকে প্রকাশ কর।

[(বিরাট্) সা উদ্ অক্রামৎ সা সপ্ত ঋষীন্ আগচ্ছৎ। (৮, ৫, ৫, ১৪)]

"সেই বিরাট্‌কে ছন্দের আধারেই পাওয়া যেতে (পান করতে) পারে বলে তাঁরা ছন্দকেই পাত্র করলেন।

[তস্যাঃ······ছন্দঃ পাত্রম্ ॥ (অথর্ব, ৮,১৩,৫,৪,১৪)]

"এই বিশ্বভুবন-রচনার মধ্যে নিহিত জল বায়ু ও ওষধি। ঋষি কবিরা সাধনা করে তার মধ্যে তিনটি ছন্দ বের করে আনলেন। সেই ছন্দ বহুরূপে-বিচিত্র ('পুরুরূপম্'), দর্শনীয় ও মনোরম ('দর্শতম্')। তার সাহায্যে সমস্ত বিশ্বের পরিচয় পাওয়া যায় ('বিশ্বচক্ষণম্')।

[ত্রীণি ছন্দাংসি কবয়ো বি য়েতিরে
পুরুরূপং দর্শতং বিশ্বচক্ষণম্।
আপো বাতা ওষধয়স্তান্
যেকস্মিন্ ভুবন আর্পিতানি। (অথর্ব ১৮, ১, ১৭)]

"এই ছন্দ যে 'পুরুরূপ' অর্থাৎ বহুধা-বিচিত্র তার পরিচয় তো বৈদিক ছন্দে আচার্য পিঙ্গলই দিয়ে গেলেন। লৌকিক সংস্কৃতেও মন্দাক্রান্তা শার্দূল-বিক্রীড়িত স্রগ্ধরা প্রভৃতি ছন্দের বিচিত্র ঐশ্বর্যের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তাতে দ্বিদল ত্রিদল প্রভৃতি সমান যতিবিভাগের কোনো বালাই নেই। অথচ কি মনোহর কি গম্ভীর। এই সব অপূর্ব ছন্দের কথা আমি আপনাদের সময়ান্তরে বলেচি, আজ আর তাই বলতে চাইনে। এই সব ছন্দে যেন সাগরের তরঙ্গলীলার মতো উত্থান-পতন-বিভ্রম দেখতে পাই। বাংলাতে চেষ্টা করেও সেই লীলাটি দেখান যায় নি। এক এক ভাষার এক এক প্রকৃতি। সংস্কৃতের রীতি বাংলায় চলবে না। বাংলারও নিজস্ব ঐশ্বর্য আছে, তাকে খুঁজে বের করতে হবে। এখানেও দেখা যাচ্চে—

পরধর্মো ভয়াবহঃ (গীতা ৩, ৩৫)।"

[সেদিন এখানেই কথাবার্তা বন্ধ হইল। পুরাণাদি ও প্রাকৃত গ্রন্থ হইতে ছন্দ সম্বন্ধে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহার আলোচনা করার সময় আর কবিগুরুর হইল না। কারণ তখন লেভি সাহেবের পত্নী (Madame Levy) ও আর কেহ কেহ আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের এই সময়েই আসিবার কথা ছিল। আবার দুইদিন পরে আমরা তাঁহাকে লইয়া ছন্দের প্রসঙ্গ তুলিতে গেলে কবিগুরু তখন বলিলেন—]

"বাংলা ছন্দের 'পিঙ্গল' অর্থাৎ আচার্য হলেন আমাদের কান। যাঁরা বাংলাতে ছন্দের রীতি বানিয়েছেন পিঙ্গলের মতো মুক্ত দৃষ্টি তো তাঁদের নেই। তবে কান আমাদের কোথাও বন্ধ করে রাখতে চায় না। কিন্তু আমরা তার শিক্ষা নিই কোথায়? চল্‌তি পথ ছেড়ে যদি আমরা আমাদের কানের কথা মন দিয়ে শুনতাম তবে আমাদের বাংলা ছন্দের ঐশ্বর্য অনেকটা বেড়ে যেতো।

"ছন্দ হোলো একটা দোলা। এই স্নেহের দোলাতেই মা দোলা দেন তাঁর সন্তানকে। দোলা-দেওয়া এই ছন্দেরই প্রয়োজন হয় কবিতার ভাষাতে। কারণ তাতে দোলা না দিলে রসটি পূর্ণ হয়ে জমে ওঠে না। খবরের কাগজের

সংবাদে বা সাংসারিক কথাবার্তায় তার প্রয়োজন নেই। সেখানে খবরটা জানিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল। পঞ্জিকা জানালেন, 'চাঁদ উঠেচে'। তখনই তার 'কথাটি ফুরোলো'; কিন্তু যখন কবি বল্লেন—

শরত চংদ পবন মংদ
বিপিনে ভরল কুসুম গংধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী
মত্ত মধুকর ভোরণি ॥

তখন ঠিক যেমনটি চাই তেমনি আনন্দের দোলা মনকে দোলা দিয়ে চল্লো। 'মনিব তার চাকরকে কাজে গাফিলতির জন্য দেশ ছাড়া করলেন'—এটা তো খবর মাত্র। খবরের কাগজে এই কথাটা বের হয়ে গেলেই তার কাজ সমাপ্ত। কিন্তু 'মেঘদূতে'র দোলা আজও আমাদের মনকে দোলা দিচ্চে। 'দুষ্মন্তের স্মৃতিহীনতা হয়েছিল, তিনি আমাদের ব্রাহ্মী ঘৃত খেয়ে তাঁর স্ত্রী শকুন্তলাকে চিন্‌তে পারলেন'—এ হোলো কবিরাজের বিজ্ঞাপন। সেখানকার খবর সেখানেই শেষ। কিন্তু শকুন্তলা আজও বিশ্বজনচিত্তে দোলা দিচ্চে, আজও তার অবসান ঘটেনি।

"এই ছন্দ আমরা পাই কোথায়? কানের মতো ছন্দের গুরু আর নেই। তবে কানকেও নানা সুর-তাল-লয়-ছন্দ-যতি শুনিয়ে শুনিয়ে তৈরি করে নিতে হয়। এইজন্য ভাল আবৃত্তির শিক্ষা একটা সাধনা। গান রচনার সময়েও আমি গেয়ে দেখি এবং কবিতা রচনার সময়েও আমি আবৃত্তি করে দেখি, এমনকি গদ্য লেখার সময়েও মাঝে মাঝে আমাকে আবৃত্তি করে দেখতে হয়।

"হয়তো বলবেন, গদ্যের আবার ছন্দ কি। গদ্যেও ছন্দ থাকে। সংস্কৃতের বেদ-উপনিষদে কাদম্বরী প্রভৃতিতে মৃদঙ্গধ্বনির মত গম্ভীর মনোহর ছন্দ। প্রাকৃতে ও পালিতে ভগবান বুদ্ধের কথাতে, বাইবেলে, আরবী কোরানের গদ্যেও চমৎকার ছন্দ আছে। বাংলা গদ্যেও যে চমৎকার ছন্দ আছে তা তাঁরা বুঝবেন যাঁরা বৃদ্ধাদের কাছে সেকেলে রূপকথা শুনেছেন। এখন মেয়েরা কালেজে শিক্ষা পেয়ে তাঁদের রূপকথায় ছন্দোময়ী বাণীর এই অপূর্ব কলাটি হারিয়ে ফেলেছেন। সেইসব রূপকথার কাজ ছিল বাক্য দিয়ে মনের মধ্যে জীবন্ত চিত্র রচনা করে চলা। ছেলেবেলা বৃদ্ধাদের রূপকথায় গদ্যের সেই ছন্দ-ঝংকার শুনতাম।

"তারপর শুনেচি কথকদের বর্ণনায়। সংস্কৃত বাংলা মিলিয়ে অপূর্ব সেই ছন্দোলীলা—

ঘোরা যামিনী
নিবিড়গাঢ়তমস্বিনী
শান্তা নলিনী,
নিদ্রাগতা বল্লরী। ইত্যাদি

আমাদের বাড়ীতে তখন ভাল ভাল কথক আসতেন। তাঁরা সব এখন গেলেন কোথায়? এখনকার ছেলেরা আর সেই যুগের আসল কথকতার আনন্দটা জানলোই না।

"গদ্যে যে অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হতে পারে তার উদাহরণ আমরা উপনিষদে পাই। সত্যকাম জাবালের কথা আমি আমার 'ব্রাহ্মণ' কবিতায় লিখেচি বটে কিন্তু তার যে অপূর্ব কাব্যরূপটি ছান্দোগ্যের মধ্যে (৪,৪,১-৪) দেখা যায় তার অনুকরণ করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। আমাকে একখানা উপনিষৎ-সংগ্রহ দিতে পারেন?" [পুস্তকখানি দেওয়া হইলে তিনি ছান্দোগ্যের সেই স্থানটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন—]

'সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথাঃ ইতি।'

'নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সৌম্যাহরোপত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি।'

"এই অপূর্ব বাণীর কি কখনো অনুবাদ হয়? কী ঠাস-বুননো কথা! কী তার ছন্দ!

"ছান্দোগ্যের এই জায়গাটি দেখুন,—
অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশঃ—ইত্যাদি
(ছান্দোগ্য ৩, ১, ১)

"বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী কথাটিও চমৎকার। যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্—এর ছন্দ কবিতার চেয়েও চমৎকার।

"বাংলা কাব্যে সে যুগে বিচিত্র ছন্দের ওস্তাদ ছিলেন ভারতচন্দ্র। তিনি সংস্কৃত পারসী নানা ভাষার নানা ছন্দ এনে বাংলা ভাষায় ছন্দের কত অদ্ভুত বিচিত্র খেলাই দেখিয়েছেন।"

আমি বলিলাম, হিন্দীতে আকবরের মন্ত্রী আবদর রহিম খান খাঁনা এই বিষয়ে অপূর্ব নৈপুণ্য\দেখাইয়াছেন। তিনি সংস্কৃত হিন্দী আরবী পারসী তুর্কী পাঁচ ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার খেটক-কৌতুক মদনাষ্টক প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। তাঁহার মদনাষ্টক এখনও হোলির দিনে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরাও উচ্চারণ করিয়া ধন্য হন।

[শরদ নিশি নিশীথে
চাঁদকী রোশনাঈ
সঘন বন নিকুঞ্জে
কানহ্ বংশী বজাঈ। ইত্যাদি]

তিনি লোক-প্রচলিত বর্‌বা ছন্দ লইয়া কবিতা লেখেন। পরে তুলসীদাসকে পর্যন্ত তাই লৌকিক বর্‌বা ছন্দে নতুন করিয়া রামায়ণ রচনা করিতে হয়। এইরূপ কথা আছে। তুলসীদাসের বর্‌বা রামায়ণও আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, "বাংলার লৌকিক ছন্দের একজন খাঁটি সমজদার ছিলেন রামপ্রসাদ। তিনি বাংলা ভাষার ভিতরের ছন্দোময় স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর

মন বেচারির কি দোষ আছে।
তারে যেমনি নাচাও তেমনি নাচে।

প্রভৃতি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত ছন্দ।

"ছড়াগুলোর মধ্যে বাংলার এই নিজস্ব ঐশ্বর্য দেখতে পাই। আমার লোকসাহিত্যে তার কিছু পরিচয় দিয়েচি। কাজেই এখন আর কিছু না বল্লেও চলে। পূর্ববঙ্গের ছড়াগুলো জানলে আরও নমুনা দিতে পারতাম। আপনাদের কাছেই শোনা

শামুক রাজায় বিয়া করে ঝিনুকরাজার ঝি

মনে পড়চে। ছেলেদের জন্য কবিতা লিখতে গেলেই আমাকে ছড়ার ছন্দ পেয়ে বসে। তবে বাংলা লৌকিক ছন্দের রাজা হলেন বাউলেরা। তাঁদের রচনায় বাংলা ভাষার নির্ঝরিণীর সংগীতটি নুড়িতে নুড়িতে বেজে চলে। তার পরিচয় আমার চেয়ে হয়তো আপনাদেরই বেশি জানা। কাজেই ওবিষয়ে আর কিছু বলতে চাইনে। বরং এই বিষয়ে আপনাদের কিছু করতে অনুরোধ করি। বাউলদের

কাঁপচে কমল টলটলাটল রাতের শিশির জল গো

প্রভৃতি গানে ছন্দের অপূর্ব ঝঙ্কার।

"ভাষার ছন্দ ও জলের ছন্দ একই রকমের। তবে তার জন্য গতি চাই। বিলের স্থির জলকে বোবা জল বলে। তার কোনো গতি নেই। তার মাঝে যেখানে একটু ধারা আছে সেখানেই ধ্বনি।"

আমি বলিলাম, ঋগ্বেদেও আছে, যে জল স্থির তা বদ্ধ জল। যা চলে তাই নদী অর্থাৎ ধ্বনিত।

[চরন্তি যন্নদ্যস্তম্বুরাপঃ। (ঋগ্‌বেদ ৫,৪৭,৫)]

কবীরও সংস্কৃতকে কূপ জল ও ভাষাকে বহতা নীর বলেছেন।

[সংস্কৃত কূপজল কবীরা ভাষা বহতা নীর।]

[তখন রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—]

"কবীর হয়তো এখানে চলতি ভাষার ছন্দের ঐশ্বর্যের কথারই একটুখানি ইশারা দিয়ে গেছেন। কূপ-জলে সংগীত নেই। ভাষাতে অর্থাৎ চল্‌তি জলের ধারাতেই নানা বিচিত্র সংগীত নিরন্তর ধ্বনিত হচ্চে।

"আমাদের ছেলেবেলায় বাংলা কবিতাতে পয়ারেরই প্রাধান্য ছিল। মধুসূদন প্রভৃতি তার মধ্যে বিদ্রোহ এনেছিলেন। তখনকার দিনে বাংলার কবিদের সেই সব মুক্তির সাধনার খবর ছেলেবেলায় আমার জানা ছিল না। আমাদের কাছে বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ই তিন মাত্রার ছন্দ চালালেন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে।

এই ছন্দ গোল, গড়িয়ে চলে। এইগুলি আমাকে নাড়া দিল।

"সব চেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম হতে ছাপা এক অতি পুরোনো গীত-গোবিন্দ। তাতে গানগুলি কবিতার মতো সাজানো ছিল না। তা গদ্যের মতো একসঙ্গে সব জড়িয়ে ছাপা। তার জট খুলতে গিয়ে গীত-গোবিন্দের ছন্দের ঝংকার টের পেলাম। আমার মন যেন একটা নতুন জগৎ দেখল। মনকে খুব একটা নাড়া দিল। বাংলা দেশের কবির হাতের [illegible] প্রাকৃত সংস্কৃতের ছন্দেই আমার পথ খুলে গেল। তাঁর সংস্কৃত রচনার মধ্যেও প্রাকৃত ছন্দোলীলা থাকায় আমার বড়োই উপকার হয়েছিল।

"বাংলা দেশ পাথুরে পুরোনো দেশ নয়। নদীর পলিতে নবীন জন্ম এই দেশের। পুরাতনের ভার হতে বাংলা দেশ মুক্ত। তাই নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের জন্ম। বাংলা দেশ নবপথের পথিক। আমার মধ্যেও তাই নবপথের ব্যাকুলতা

রয়েছে। পুরাতনের পাষাণভার আমার ভাল লাগেনা। কোনো বাঁধনই আমি দীর্ঘকাল সইতে পারিনি। বাঁধন ও মুক্তির দ্বন্দ্ব সোনার তরীর "দুইপাখী" কবিতায় রয়েছে। আমাকে যতই বলা হয়েছে খাঁচায় নিরিবিলিতে থাকতে ততবারই আমার বুনো মন বলেচে—

আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।

"বাল্যকালে আমার এই ব্যাকুলতা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রূপে ধরা দিয়ে পরে তাই নদী রূপ নিয়েচে। তারপরে তাই বলাকাতে হে বিরাট নদী রূপে দেখা দিয়েচে। চিত্রাঙ্গদার মতো সে আপন সৌন্দর্যেরই ছাঁদন-বাঁধনেও ক্রমাগত হাঁপিয়ে উঠেচে। শারদোৎসবের ছেলের মতো আমিও চিরদিনই চেয়েচি—

যাব না আর ঘরে!

আমার মন অধিকারবদ্ধ সাম্রাজ্য ছেড়ে তাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়।

"ডাকঘরের অমলের মতো আমার মন লোকাচার, শাস্ত্র, কবিরাজের ব্যবস্থা-দেওয়া অতি সুপথ্য ঘরের বাঁধনও সইতে পারে না। অচলায়তনের পঞ্চকে, আর ফাল্‌গুনীর ছেলেদের মধ্যে আমারই অস্থিরতা। আমায় বিদ্রোহী বলে গা'ল দিলেও আমি নাচার।

"ছন্দের সাধনাতেও আমার সেই চঞ্চলতা। ছন্দ যতই মনোরম হোক তার মধ্যে যে বাঁধন আছে তা বোঝা যায় 'ছাঁদন বাঁধন' কথায়। বাঁধনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিও দরকার। ঘরে বাস করলেও আমরা যদি আকাশকে একেবারে বাদ দিই তবে বদ্ধ হয়ে মরি। বন্ধন আছে বলেই মুক্তির সাধনার দিকে মানুষ ঝুঁকেচে।

"জন্মেছিলাম পয়ারের যুগে। তারপর আমাকে প্রথমে ছন্দের পথ দেখালেন বিহারীলাল। তাঁর লেখা দিব্যি গড়িয়ে চলতো। তাই যুক্তাক্ষর তিনি কম ব্যবহার করতেন। আমিও প্রথমে তাই শিখলাম। আমার ছেলেবেলার রচনায় যুক্তাক্ষরকে যথাসম্ভব বাদ দিয়েচি। তখনও যুক্তাক্ষরবহুল মধুসূদনের মহত্ত্ব আমি বুঝতে পারিনি। বাল্যকালে তাঁর লেখার অন্যায় সমালোচনা করেচি। পরে দেখলাম আমার এই পথ একঘেয়ে। যুক্তাক্ষর ছাড়া নব-নব ঝংকারে ভাষায় বৈচিত্র্য আনা অসম্ভব। তখন আমি আমার পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

"ছেলেবেলাতেই বুঝলাম চিরাচরিত পথে আমার চলবার জো নেই। নতুন পথ তখন থেকেই খুঁজেচি। আমার পূর্বে ছাঁদনের বাঁধন মুক্ত করতে কে কি করেচেন তার খবর তখন আমি পাইনি। আর পাওয়াও তখন সম্ভব নয়। আমি নিজেই তখন নিজের ভাবের দায়ে প্রাণপণে নতুন নতুন পথের সন্ধানে লেগে গেলাম। আমার বিদ্যে সাধ্যি পুঁজিপাটা কিছুই নেই, শুধু মনের মধ্যে বাজচে ছড়া ও রূপকথার ছন্দ, কথকদের কথকতা, আর গীতগোবিন্দ প্রভৃতি দুই একখানা পুঁথির লেখা, যার মানেও ঠিক বুঝতে পারিনি। বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দের পরিচয় কতকটা তখন পেয়েছিলাম সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের কাব্য-সংগ্রহ থেকে। মৈথিলী পদ ভাল করে না বুঝলেও তার ছন্দটা বুঝতাম। তারপর সহায় ছিল আমার নিজের কান। সকল গুরুর উপরে এই গুরুকেই স্মরণ করতে হোলো।

"ছাঁদনের বাঁধন খোলবার চেষ্টা আমার চিরকালের। সংগীতেও এ কাজ আমি কালমৃগয়া, বাল্মীকি-প্রতিভার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত করে এসেচি, গালাগালিও খেয়েচি বিস্তর। সন্ধ্যা-সংগীতে আমি বুঝতে পারলাম যে বাংলা ছন্দেও নতুন পথ মিলতে পারে। ইচ্ছে করে নয়, স্বভাবতই এটা ঘটে গেল। তারকার আত্মহত্যা কবিতায় পুরোনো ছন্দের বাঁধন অনেকটা খসে গেল। প্রভাত-সংগীতে, ছবি ও গানে, শৈশব-সংগীতে এই চেষ্টা সমান ভাবে চলেচে।

"মানসীর যুগে আমি যেন এই পথে আরও নতুন আলোক পেলাম। বলাকার ছন্দের পূর্বরূপ দেখতে পাবেন মানসীর নিষ্ফল কামনা কবিতায়। এখানে সাবেক ছন্দকে ভেঙে নতুন করে ছন্দকে পেলাম। এই ভাঙাটা হোলো অভঙ্গের উল্টো পথ। তুকারামের অভঙ্গের পথ এ নয়। একে চূর্ণক বলাও চলে না, কারণ অলঙ্কারে শুনেছি চূর্ণক আর এক জিনিস। যা হোক এখন ছাঁদনের বাঁধন ভেঙ্গে চূর্ণ করে স্বাভাবিক গতিভঙ্গির খোঁজ পেলাম। এতকাল যা কৃত্রিমভাবে-কাটা সোজা-সুজি খাল ছিল তা এখন বাঁকাচোরা নদী হোলো। জীবনের প্রবাহ তার স্বাভাবিক পথ পেলো। ছন্দ ও সংগীত যুক্তধারায় প্রবাহিত হোলো।

"কবিতার চেয়েও সংগীত আমার অন্তরঙ্গ। কাজেই এখন থেকে এই মুক্ত পথে আমি সংগীতকেও চালাবার চেষ্টা নিয়েই পড়লাম।*

* ইহার কিছুকাল পরে 'সবুজপত্রে' রবীন্দ্রনাথ 'সংগীতের মুক্তি' লেখেন (১৯১৭ সাল)।

"মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যখন জাগে তখন সবক্ষেত্রেই জাগে। সমাজে, রাষ্ট্রনীতিতে, ধর্মে, শিক্ষায়, কলায় * সর্বত্র তখন মন খুঁজচে মুক্তি। কবিতায় যা ছন্দ, গানে তাই তাল। বাটের একটু হেরফের করলেই সংগীতের একেবারে রূপ বদলে যায়।†

"একতালাতে বার মাত্রা, তাকে তিন-তিন-তিন-তিন বা চার-চার-চার ভাবে বাট করা বা ভাগ করা যায়। তার অর্ধেক অর্থাৎ ছয় মাত্রায় দাদরা। তাকে তিন-তিনে বা দুই-চারে বাট করা চলে। কীর্তন ছাড়া দুই-চারের বাটের বেশি চলন নেই। ওই তালেই রাজা নাটকের গান—

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে।

কাওয়ালীকে দুই ভাগ করলেই কাহরবা পাই। দুই-তিন দুই-তিনে প্রচলিত ঝাঁপতাল। তাকেই তিন-দুইয়ে পাঁচ মাত্রায় ভাগ করলেও একটা তাল হয়। নাম দিতে গেলে তাকে ঝম্পক তাল বলা চলে।

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে

গান এই ঝম্পক তালে হয়েছে। তিন-দুই দুই-দুই দিয়ে নতুন তাল করা যায়। তাকে নবতাল বলতে পারি।

নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা

এই তালে করা। এই রকম এগারো মাত্রাতেও করা যেতে পারে।‡ আসল কথা সমান মাত্রা নিয়েও বাটের হেরফের করলে একেবারে গানের রূপ বদলে যায়। একই কার্বণ (carbon) হতে কয়লা, গ্রাফাইট (graphite), হীরা প্রভৃতি বহু জিনিস হয়। কিন্তু তাতে বোধহয় অণুপরমাণুর বাটের একটু-আধটু হেরফের আছে। ছন্দেও বাট নিয়ে হেরফের করলে অনেক নব নব রূপ মেলে। এটা কম মুক্তি নয়।

---

* চিত্রও তিনি পরে ধারামুক্ত করে দেন। কিন্তু তখনও তা বলবার সময় তাঁর আসেনি। তবে হয়তো তখন থেকেই সে কথা তাঁর মনে-মনে ছিল।

† এইখানে আমার নোট কিছু অস্পষ্ট হওয়ায় পুরানো লেখা পড়িতে এখানকার সংগীতভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুত শৈলজা মজুমদারের সাহায্য লইতে হইয়াছে।

‡ পরে একাদশী নামে তাল রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। "কাঁপিছে দেহলতা থর থর" এই তালে রচিত।

"সংগীত ও ছন্দ দুই পথেই আমার মুক্তির সাধনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু মানসীর পরে আমার এই মুক্তির ঝোঁকটা সংগীতের দিকেই গেল বেশি করে।

"এর কারণ জিজ্ঞাসা করচেন? আমি মনে করি আমার উপরে বিধাতার বিশেষ নির্দেশ রয়েচে গানে। কবিতাকে আমি উপেক্ষা করি না, কিন্তু আমার গানের হুকুমের কাছে আর সবই গৌণ। যদিও এই যুগে রাষ্ট্রনীতি-সমাজ-শিক্ষা-ধর্ম প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রেই আমার ডাক পড়েচে। তবু গান আমার সবার উপরে, কারণ সেটা আমার নিজের ইচ্ছা নয়। সেটা আমার উপরে আমার মহাগুরু নটরাজের অলঙ্ঘ্য নির্দেশ।

"এমন সময় শ্রীমান প্রমথ চৌধুরী বার কল্লেন 'সবুজপত্র'। আমার উপরে তাগিদ এলো নতুন লেখার জন্য—গদ্য পদ্য দুইই। পুরাতন বাঁধন ছিঁড়ে নবীনকে নবপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ দেবার জন্যই এই পত্র। কাজেই এবার কবিতাতে আবার আমার সেই পুরোনো মুক্তির সাধনা নতুন করে জাগ্‌লো।

"পুরোনো অনেক জিনিস আমাদের মনের অন্তঃপুরে বহুকাল চাপা পড়ে থাকে, যা দেখতে না পেয়ে আমরা মনে করি বুঝি সেগুলো একেবারে বিদেয় নিয়েচে। কিন্তু হঠাৎ এক সময় দেখি অনুকূল আবহাওয়া পেয়েই তারা আবার দেখা দিয়েচে। ভুঁইচাঁপা ফুল শুষ্কতার দুর্দিনে কোথায় যে মাটির নীচে লুকিয়ে থাকে তা কেউ জানে না। বৃষ্টির সুযোগ পেলেই আবার তা দেখা দেয়। অনেক ব্যাধিরও এই ধারা। মনে করি বুঝি সেরেই গেচে, তারপর হঠাৎ কখন কাঁপুনি দিয়ে এসে আবার হাজির।

"মনের গোপন স্তরে চাপা-পড়া জিনিস যে কেমন করে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে তার খবর ভাল করে টের পেয়েচি শারদোৎসব নাটক যেদিন প্রথম অভিনয় হয় সেই দিন।* আপনাদের হুকুম হোলো তখনই একটা নান্দী লিখে দিতে হবে। সময় মঞ্জুর হোলো মাত্র আধ ঘণ্টা। চোদ্দ পনর বছর আগে পতিসরে শরৎকালে† আমি একবার শরতের মূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তখন শরতের নাটক লেখা আর হয়নি। একটা গান‡ রামকেলীর সুরে গুন্‌গুন্ করে অসমাপ্ত রেখে দিতে হয়েছিল। সেটাই তখন আবার হঠাৎ নতুন হয়ে দেখা দিল। তাকেই পূর্ণ করে নান্দী লিখলাম।

* আশ্বিন, ১৯০৮। † ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

‡ "ওগো তুমি নানারূপে এস প্রাণে"

"ছেলেবেলা ১৬।১৭ বছর বয়সে আমেদাবাদে শাহীবাগের বাদশাহী বাড়ীতে কিছুদিন ছিলাম। সেই বাড়ীতে কত পাষাণ মূর্তি, কত শিলা-শিল্প! তখন তা নিয়ে কিছুই করিনি। বহুকাল পরে সেগুলি দেখা দিল ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে ও সিন্ধু-পারে কবিতায়।

"মানসীর যুগের ছাঁদন-বাঁধন ভাঙবার চেষ্টা এতকাল মনে চাপাই ছিল। সবুজপত্রের দাবীর চোটে আবার এতদিনে এই ছাঁদন-বাঁধন ভেঙে নতুন পথে যাত্রার জন্য উন্মুখ হলাম। সেই যাত্রাতেই আবার নতুন করে সকলকে ডাক দিলাম। মুক্ত পথের যাত্রা—তার জন্য যে ডাক তার মধ্যেও ছন্দ হওয়া চাই মুক্ত।"

[বলাকার ১০ নম্বর কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দের বিশেষত্ব বুঝাইয়া দিতেছিলেন। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার্থ আগত আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় বলাকার কবিতার প্রসঙ্গে যে ছন্দের আলোচনা চলিতেছে লোক-মুখে তাহার কথা শুনিয়া আসিয়া পড়িলেন ও কবির কাছে তাহা শুনিতে চাহিলেন। কবি তখন তাঁহার এই আলোচনাকে আবার আচার্য শীলের কাছে উপস্থিত করিলেন। শীলমহাশয়ের পিছনে পিছনে লেভি সাহেবও (Levy) উপস্থিত হইলেন। তখন আবার তাহাতে অনেক নতুন কথা পাওয়া গেল—]

"আমাদের যে সব ছন্দের মূলে দুই-এর মাত্রা সেগুলি স্থিতিশীল। আর যে সব ছন্দের মূলে তিনের মাত্রা সেগুলি গতিশীল। আবার দুই ও তিনের মিলনে পাঁচ সাত নয় প্রভৃতি মাত্রার ছন্দও হ'তে পারে।

"গাছপালার পাতা সাজানোতেও এইরূপ ছন্দো-লীলা দেখতে পাই। পাতা সাজানোতেও পাঁচ-সাতের ছন্দ আছে, যেমন পঞ্চপল্লবী বা সপ্তপর্ণী সব গাছে। সংস্কৃতের ছন্দ ঠিক এই রকম নয়। তার তৌল গুরু-লঘু তরঙ্গ-লীলায় সামঞ্জস্য বজায় রেখে ছত্রে ছত্রে। তার মধ্যে আমাদের ছন্দের মতো এত বাটের বালাই নেই। সংস্কৃত ছন্দে শব্দের ধ্বনি বাজে। বাঁধা-ছাঁদা ঠাসা ছন্দে ধ্বনি বাজানো কঠিন। নিয়ম-মুক্ত (Free) হলেই ধ্বনি বাজে। সেই রকম ধ্বনি চায় একটু ফাঁক, একটু Freedom, মুক্তি। ফাঁক ছাড়া সংস্কৃতের ধ্বনি বাজে না। সংস্কৃতে শব্দান্তেও তার echo বা ধ্বনি-তান চলে। কাজেই ফাঁক দরকার। সংস্কৃতে লেখা হলেও ললিতলবঙ্গলতায় সেই ফাঁক নেই। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ঐশ্বর্যে ভরপুর এই ছন্দো-লীলার চোটে ভাব (idea) চাপা পড়েছে (suffer

করচে)।* যেখানে ধ্বনির ব্যঞ্জনাতেই (suggestiveness) মন তৃপ্ত (satisfied) সেখানে idea চাপা পড়বেই (idea must suffer)। যেমন, মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ—ইত্যাদির অর্থ কি? না, ওকে বাড়ি নিয়ে যাও। মন্দাকিনী-নির্ঝর-শীকরাণাম্—তার অর্থ কতটুকু?"

[তখন আচার্য Levy বলিলেন, "গ্রীকেও (Greek) ঠিক এই রকম। ধ্বনির যেখানে গাম্ভীর্য সেখানে মধ্যে অবকাশ চাই। যেমন বনস্পতি পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রাখে। গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকিলে তাহাদের চলে না। আচ্ছা বলাকাতে আপনি কি দুই মাত্রার ছন্দ করিয়াছেন?"—]

"বলাকাতে আমার দুই মাত্রারই ছন্দ। দৈবাৎ একটা তিনমাত্রার করেছিলাম। কিন্তু সবুজপত্রে তা দেই নি, তাকে কেউ কেউ বল্লেন vers libre, যদিও তা নয়।†

"পূর্বেও বলেচি, আবার এখনও বলচি বস্তুর বস্তুত্ব ও প্রকাশ-বৈচিত্র্য বা ব্যক্তিত্বই হোলো তার ছন্দে। যে সুরের তাল নেই তার কোনো বস্তুত্বই নেই। ছন্দ ও তাল পেলে তবে বস্তুর বস্তুত্ব ও ব্যক্তিত্ব। যেসব জিনিস ছন্দোহীন তালহীন নৃত্যহীন বলে অবস্তু হয়ে রয়েচে, ছন্দ ও তাল পেলে তা-ই প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। যখন তা রূপের ছন্দ (rhythm) পায় তখনই তাতে আবার আনন্দ-রস আবির্ভূত হয়।

"সৃষ্টির বিচিত্রতা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার reality হোলো ব্যক্তিত্বের (personal) সম্বন্ধ নিয়ে। কারণ আমার চক্ষুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যা পায় রূপ, কর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা-ই পায় সুর। এইটি ঘটে তার ছন্দের সঙ্গে আমার ছন্দের যোগে। আমার ছন্দ মানে আমার মন-বুদ্ধি-চক্ষু-কর্ণাদির ছন্দ। ছন্দে ছন্দে এই যোগটি ঘটলেই আনন্দরস হয় প্রকাশিত।

"বাল্যকালে আমার এক সংগীতের বক্তৃতায় বলেছিলাম, সুরটা carbon জাতীয় পদার্থ। এতে বস্তুগত বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু এতে প্রকৃত দুঃখসুখের ব্যক্তিগত (personal) সম্বন্ধ কোথায়? যখন সে আমার কাছে

* Levy সাহেবের খাতিরে মাঝে মাঝে দুই একটা ইংরেজি কথা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে বলিতে উদ্যত হইলে লেভি সাহেব বলিলেন—"না, না, আপনি বাংলাতেই বলুন আমি বুঝিয়া লইব।"

† এই কথাবার্তা বোধ হয় ১৯২১ সালের ২০শে ডিসেম্বর হয়।

কোনো বিশেষ ছন্দে বা তালে প্রত্যক্ষ হয়, তখনই এই সম্বন্ধ সত্য হয়। এই তালের বিচিত্রীকরণের উপরই তার সব আনন্দ নির্ভর করে। বিশেষ ছন্দ বা তালই দেয় এই ব্যক্তিত্ব।

"আমলকীর পাতায় দেখি দুইএর ছন্দ। হেনারও দুইএর ছন্দ, তবে বাঁকা। এ যেন বেঁকে-যাওয়া দুইএর ছন্দ। তেতালায় ও আদ্ধায় যে তফাৎ।

"একই স্থরের মধ্যে ছন্দের অদলবদলে একেবারে রূপের হেরফের ঘটে। তাতেই নানা বিচিত্র ব্যক্তিত্ব বা personality। এখনকার দিনে অনেক কবি এর মর্ম না পেয়ে বৈচিত্র্যের মহা স্থযোগ হারাচ্চেন।

"Vers libreতে একটা জিনিস পাই যা 'নেতির' (Negative) দিক হতে আমাদের চেতনাকে উদ্বোধিত করে। মধুর একটা রাগিণী সমাপ্ত হলে যেমন গুণী ওস্তাদ হঠাৎ ঝন্ ঝন্ করে বীণা বাজিয়ে মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত পুরোনো স্থরের সব জাল জঞ্জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দেন, তেমনি স্থষ্টির পরে নতুন স্থষ্টির আগে একটা প্রলয় দরকার। এই প্রলয় হোলো স্থষ্টিরই স্থচনা অর্থাৎ 'না'র দ্বারা 'হাঁ'কে আবাহন ও প্রকাশ।"

["গণিত বিদ্যায়* নাকি নানা statistics থেকে তত্ত্ব বের করবার সাধনা চলেচে। লোক-যাত্রায় ও বস্তুজগতে খণ্ডিত সব ঘটনাতে (detached facts) তো কোনো তত্ত্ব নেই। তবে সবগুলি facts সাজিয়ে বিচার করে সত্য মেলে। গণিতও তবে একটা ছন্দ বা rhythm পেয়েচে যাতে তুচ্ছ সব খণ্ডিতকে যুক্ত করে শাশ্বতকে (universal) খুঁজে পাওয়া যায়।"]

" 'প্রণয়িণী ঝঙ্কার দিয়ে মুখ ফেরালো'—ঘটনাটা কিছুই নয়। কিন্তু এও যখন ছন্দে (rhythm) ধরা দেয় তখন তার মধ্যে একটা সত্য তথ্য (eternal value) মেলে। Intellectually যা ক্ষুদ্র, তা খণ্ডিত (detached) বলেই ক্ষুদ্র। সেগুলির সাহায্যে universalকে পেতে হলে অঙ্কশাস্ত্রের ছন্দের (rhythm) সাধনার অর্থাৎ statisticsএর সহায়তা নিতে হয়। তখন সব খণ্ডিত ঘটনার তুচ্ছতা চলে যায়।

"আবার শুধু ছন্দ দিয়েও কিছু হয় না। সত্য না থাকলে ছন্দে কাকে তুলবে ফুটিয়ে? সত্য যদি খাঁটি সত্য না হয় তবে ছন্দের কষ্টিপাথরেই তার অলীকতা ধরা পড়ে যায়। ছন্দেই বিশ্বসত্যের প্রমাণ। সংখ্যাও দেখা যাচ্চে ছন্দ-রহস্যের

* এই কথাটা শ্রীমান প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কাছে কবিগুরুর শোনা। কাজেই এই অংশটুকু পরে কোনো সময়ে এইখানে আমি লিখিয়াছিলাম। তখনো তাহা কবির মুখেই শুনি।

এক মহা চাবি (kcy)। এইজন্যই statisticsএ বিশ্বসত্যের (universal) rhythmকে প্রকাশ করতে পারে। কাজেই এই শাস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রকাণ্ড এবং যোগ্য শিক্ষণীয় বিষয়।

"দেখা যাচ্চে একদিন emotionএর রাজ্যের যে তথ্য জানতে আরম্ভ করেছিলাম তথ্যের রাজ্যেও তা সত্য। প্রশান্তের* গণিতের কথায় তা বোঝা গেল।

"গানে দেখি যেখান হতে আরম্ভ, সেখানে এসে সমাপ্ত হলেই সমগ্র সৃষ্টির বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়। এর কাছে দৈনিক খবরের কাগজের ভীষণ একটা খবরও (fact) নগণ্য। তবে তাদেরও সমগ্র ছন্দ দেখে বিচার করলে বড় সত্যের দেখা মেলে।

"এই যে সামনে করবী গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটেচে, এর মূল্য কি সামান্য ? এ তো প্রকৃতির লক্ষ বৎসরের তপস্যার ফল। প্রকৃতির (Nature) ছন্দের কত পরীক্ষার (experiments) ফল এই অপূর্ব সৃষ্টি। আকাশের তারা, চন্দ্র-সূর্যের আলো, মেঘের ধারা, মাটির রস সবাই তার সেবা করচে। কারণ বিশ্বের সঙ্গে যোগে তার মহিমা। এই মহিমাতেই সে প্রাণের ছন্দে নেচে চলেচে।

"আমাদের সঙ্গে বিশ্বের সেই যোগ কই ? আমাদের সেই মিলটি নেই বলেই ক্রমাগত বিরোধের ধাক্কা আসচে। রাজ্য যায়, সাম্রাজ্য যায়, শাস্ত্র আচার স্মৃতি (tradition) সবই যায়। আর যা সুন্দর জগতের সঙ্গে তার যোগ আছে বলেই সে সত্য সে নিত্য। তার বিনাশ নেই। এই যে সামনে ঘাসের মধ্যে ছোট্ট একটু ফুল ফুটেচে এও বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত বলে অমরত্ব লাভ করেচে। কত দিল্লী কত আলেকজেণ্ড্রিয়া সব ভেসে গেচে, কিন্তু এতো ভেসে যাবার নয়। তারা ভেসে গেছে কারণ বিশ্বের সঙ্গে তাদের ছন্দোগত যোগটি (synchronism) ছিল না। সেই যোগ ছাড়া অমরত্ব লাভ করা

"এই করবীর ফুলটি যেমন বর্ণ রেখা রূপ রঙের পরিপূর্ণ যোগে সত্য তেমনি সুরে তালে পরিপূর্ণ একটি সংগীতও সত্য। গানের সৃষ্টিলীলাগতিটি (curve) যখন পূর্ণ হয় তখন তা আমার কাছে পৃথিবীর এক অপূ

* প্রশান্ত মহলানবিশ।

সত্য। অথচ পৃথিবীর তথাকথিত অনেক বড় বড় কথার কোনো মূল্য তখন আমার কাছে নেই। \

"মানব-লোকের সৃষ্টি এই গান। এই হিসেবে সে প্রকৃতি-লোকের করবী ফুলেরই ভাই। দুইয়েরই পিছনে যুগযুগের সাধনা, বিশ্ব-তপস্যা রয়েচে। কেউ বলতে পারেন, 'ফুল হোলো প্রকৃতির খেলা, গানও হোলো মানুষের খেলা। দুইই তো শুধু খেলা।' 'হ্যাঁ, খেলা বলেই তারা সত্য।' মানুষ যে বাল-গোপাল, শিশু ভোলানাথ অর্থাৎ eternal child। এই খেলাতেই তার সার্থকতা। মানুষ যখন বাল-গোপাল তখন এই খেলাই পরম সত্য। এই খেলাতেই বিশ্ব-খেলার সঙ্গে তার যোগ। আর এই শিশু ভোলানাথ 'মর্দ্দ' (মরদ) হয়ে যা-যা ঘটিয়ে তুল্‌লো সেই সব বড় বড় ঘটনা ইতিহাসে কোথায় ভেসে গেল।

"বাদশার তক্‌ত ভেসে গেল, অথচ কবীরের গান রইলো। সে সামান্য জোলা, তাকে চেনে কে? সে যুদ্ধ লড়েনি, সাম্রাজ্য গড়েনি, বড় কিছুই করেনি, শুধু সে রেখে গেছে গোটা কয়েক গান। ঐ যে রাজ্য সাম্রাজ্য, যাকে মনে করি চিরন্তন, তার মত ক্ষণিক ও নশ্বর কিছুই নেই। ইট পাথরের দম্ভ, আর আইন ও ফৌজের জুলুম কোথায় ভেসে যাবে। আর যাকে তুচ্ছ করে সবাই বলচে স্বপ্ন (dream), সে যদি বিশ্ব-ছন্দকে পেয়ে থাকে তবে তা-ই থাকবে।

"অস্ত্রে-শস্ত্রে সুরক্ষিত পাথুরে দর্প কালের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে আর যে-সব সুকুমার খেলা শাশ্বতের সুর পেয়েচে তারই চরণে সেই মহাকালই কৃতাঞ্জলি হয়ে তার পূজার অর্ঘ দেবে। যা-কিছু শাশ্বতের সঙ্গে যোগে যুক্ত তা অমরত্ব লাভ করেচে। স্বপ্নবৎ (dream-like) হলেও তা-ই সত্য।

[অমৃতাস্তে ভবন্তি।]

"বলাকার এই কবিতাগুলিতে ছন্দ মুক্তি লাভ করেচে। হয়তো ফরাসী vers-libreএর সঙ্গে এর তুলনা কেউ কেউ দেবেন। আমেরিকাতেও ছন্দকে মুক্তি দেবার এই সাধনা দেখেচি। তবে তাঁদের বিশ্বাস ছন্দকে একেবারে বাদ দিয়ে গদ্যকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে তাঁরা মনে করেন যে কাব্যের দেহ পেয়েচি। Whitmanএ দেখি তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি ভৌগোলিক বা বৈজ্ঞানিক নামের ফিরিস্তি দিয়েচেন।

"চলন বিল এক বিরাট বিল, সমুদ্র বিশেষ। আমি যখন তাতে

বোটে করে চলতাম তখন মাঝিরা তাকে বলতো বোবা জল। অর্থাৎ গতিহীন জল, তার ছন্দ গীত নেই। হঠাৎ চলতে চলতে দেখতাম তার মধ্যেও কোথাও ধারা আছে। সেখানে নৃত্য ও ছন্দ আছে। বোবা সেখানে ভাষা পেয়েচে। Whitmanএরও সেই রকম বোবা জল ও মাঝে মাঝে তার মধ্যে সংগীত-মুখরিত ধারা-জল আছে।

"আজকাল অনেকে ইচ্ছাপূর্বক ছন্দকে বাদ দিয়েচেন। তাঁরা বোধ হয় স্বভাবতই সংগীতহীন। ছন্দ একটা কৃত্রিম বন্ধন মাত্র নয়। ছন্দ হোলো বিশ্বের মূল তত্ত্ব। ছন্দ হোলো সেই গতিবেগ যা বিশ্বগতিকে সুষমা (harmony) দিচ্চে। ফুলের প্রত্যেক পাপড়িতে harmony আছে বল্লেই সবটা বলা হয় না। তাতে একটি পরিপূর্ণ শান্তিও (repose) বিরাজমান, কারণ তা সংগীত-সংগতি, concerted movement। সেই সংগতিটি না পেলে একটা উন্মত্ত প্রলয় কাণ্ড হোতো। প্রাণ যদি তার ছন্দ হারায় তবে তাতে আর সৌষম্য ও শান্তি থাকে না।

"কেমিষ্ট্রিও এই ছন্দশাস্ত্র। তাই একই কার্বণ (Carbon) পরমাণু-সন্নিবেশের বিশেষ এক ছন্দে কয়লা ও অন্য ছন্দে হীরা। প্রকৃতিতে যেমন ছন্দের এই মহত্ত্ব, কবিতাতেও ঠিক তেমনি। তাকে বাদ দিলে অর্থ যদি বা কিছু মেলে, তবে অপার্থিব আবেগটুকু আর মিলবে না।

"ছন্দের একটু বদল-অদল হলেই এক রস আর হয়ে যায়। গানের একই রাগিণীতে তাল মাত্রা বদল করে করুণ হাস্য বীর শান্ত প্রভৃতি নানা রস প্রকাশ করা চলে। বস্তু (substance) সমানই রইল শুধু অবর্ণনীয় অনির্বচনীয় (ineffable) তালটুকুর হেরফেরে কত বৈচিত্র্যই দেখা দিতে লাগল। বিজ্ঞানও বলে, বিশ্বের বাস্তব কোনো মূল তত্ত্ব আমাদের জানা নেই কিন্তু ছন্দের বৈচিত্র্যেই বিশ্বের যত বৈচিত্র্য। কাব্যেও তাই। আমার ছন্দের সঙ্গে বস্তুর বা কাব্যের ছন্দটা মিললেই প্রকাশ হয় যে 'আমি আছি'। নইলে প্রকাশও নেই আনন্দও নেই।

"গদ্যের (Prose) ছন্দ আছে। কখনও সাগরের মত গভীর ধ্বনি, কখনও নূপুরের মত লঘু তার শিঞ্জিত। ছন্দ না থাকলে তা বিশ্বের সঙ্গে মিলতে পারতো না; তাকে যোগভ্রষ্ট হতে হোতো, এখানেও বিশ্বের মত নব-নব ছন্দে নব নব প্রকাশ নব নব সৃষ্টি। তারও একটা ধর্ম (law) আছে।

"Vers-libre দেখলেও দেখা যেতো সেখানেও ছন্দের ধর্ম আছে। এ যে

বিশ্বের ধর্ম। তা সংখ্যাতে দুই আর তিন। দুই ও তিন সংখ্যায় মূলগত প্রভেদ রয়েচে। তা নিয়েই সম-অসম-বিষম এই বৈচিত্র্য। অর্থাৎ দুই-তিন বা দুই এবং তিন। একের মধ্যে আর এসে পড়লেই ছন্দের জাত যায়। যাঁদের কান নেই, নকলই যাঁদের ভরসা, তাঁদের এই দুর্গতি হবেই হবে। তাঁদের একথা বোঝানোও শক্ত।

"আমাদের দুই পা। দুইয়ের ছন্দ পায়ের চলার মত, পয়ার। এটা আমাদের দেশে পুরোনো। তিন চলতে থাকে যেন গোল চাকার মত গড়িয়ে গড়িয়ে—

একদিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুরনদীর জলে।

"সংস্কৃত ছন্দে বিষমের দেখা পাওয়া যায়। Vers-libreতেও তা আছে। শার্দূল-বিক্রীড়িত স্রগ্ধরা প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দে চমৎকার ধ্বনি-ঐশ্বর্য (music) রয়েচে। তাকে নৃত্য-ছন্দের গুরুগম্ভীর বা চল-চঞ্চল নানা তালে সাজানো যায়। প্রকৃতির ক্ষেত্রেও তাই।

"আমাদের শরীরে হাত-পা সম, মাথাটা বিষম ছন্দের। তাই আমাদের সভ্যতার ইতিহাসের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যায়। গাছের পুষ্পে-পল্লবেও ঠিক এইরূপ ছন্দোলীলা। দুই তিন বা দুই আর তিন বা তিন আর চার। আমার মনে হয় ছন্দেই সব ফুল ও পাতা ফুটে ওঠে।

"আমি পূর্বে বিহারীলাল চক্রবর্তীর ছন্দ অনুসরণ করে লিখতাম। অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতির তাতে উৎসাহ ও আলোক পেয়েচি। কিন্তু এইসব ছন্দও একঘেয়ে হয়ে উঠলো। মুক্তি চাইলাম। ভগ্নহৃদয় প্রভৃতিতে তার সাক্ষ্য মিলবে। সন্ধ্যা-সংগীত প্রভৃতিতে ছন্দ ভেঙে মুক্তির অপরূপ আনন্দ পেলাম। আমার ভগ্নহৃদয় পড়েই ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মুগ্ধ হলেন। অথচ তখন আমার ছন্দ লেখা নিতান্তই কাঁচা, তখন আমি মুক্তি খুঁজচি মাত্র।

"একবার জ্যোতিদাদা সপরিবারে নীলগিরি বেড়াতে গেছেন। কেউ বাড়ী নেই। তেতালার শূন্য ছন্দ ও ঘরগুলি অধিকার করে দিব্যি দিন যাচ্ছে, হঠাৎ যেন মুক্তির আলোক দেখলাম। ছাঁদনের বাঁধন খসলো। একটা স্লেট নিয়ে লিখতে বসলাম। পরের কাছে শিখে-পাওয়া অভ্যস্ত সব বাঁধন ফেলে দিয়ে লিখতে বসলাম। নিজ সুর আবিষ্কার করলাম। এতদিনকার অভ্যাসের বাঁধন ঘুচে গেল, মুক্তির আনন্দ পেলাম। এই যে মুক্তি, এ শুধু সংস্কারের দাসত্ব হতে

মুক্তি। তাতে ছন্দের ধর্ম হতে বিচ্ছেদ বোঝায় না। সেই বিশ্বধর্ম হতে ভ্রষ্ট হলে তো বিশ্বের নিয়মের সঙ্গে বিদ্রোহ হোতো। তাহলে যা হোতো, তাতো সৌন্দর্য নয়, তা হোতো বেতালা বেসুরো discord। তারা অঙ্গহীন রাহু-কেতু। তারা কেমন করে অমৃতত্ব লাভ করতো? বিশ্বতাল তাকে চিরদিন আঘাত করতে থাকতো। 'বিশ্বের মূলনীতি হতে ভ্রষ্টতাই হোলো মিথ্যে পাগলামি।

"সন্ধ্যা-সংগীতে যে মুক্তির সাধনা আরম্ভ হয়েছিল বলাকাতে বৃদ্ধ বয়সে আবার তাতে ফিরতে হোলো। এই মুক্তির সাধনায় আত্মপ্রকাশের বিশেষ আনন্দ আছে। Lyrical কবিতায় যে সংগীত আছে তা সংগীতীয় ছন্দেই ধরা দেয়। বাঁধন ভাঙলে যে বাধা সরে যায় তাতে অনেক নতুন ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সংগীতের সুরের স্পর্শ সব দিকে অনুভূত হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব বা thought elementsও এসে ধরা দেয়। এই তত্ত্ব দার্শনিক তত্ত্ব নয়। এই তত্ত্ব কি ন্যায়শাস্ত্রসম্মত (logical) সত্য, অথবা তা নয়?—তাতে কিছু আসে যায় না। তা সৌন্দর্য, তা রস, তা আনন্দ।

"বিশ্বজগতের দুই ভাগ—ভূলোক ও দ্যুলোক। একটা কঠিন বস্তুজগৎ আর একটা অসীম বায়ুমণ্ডল। বেদে বলেচে, এই দ্যুলোক ও ভূলোক পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ করচে, কেউ কাকেও হিংসা বা আঘাত করচে না।

[যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ
ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। (অথর্ব ২, ১৫, ১)]

"দ্যুলোকের জন্য ভূলোকের প্রয়োজন আর ভূলোকের জন্য দ্যুলোকের প্রয়োজন। একটা মাটির কঠিন পিণ্ড। অন্যটা শূন্য মুক্তি। এই শূন্য বায়ুমণ্ডল বাদ দিলে পৃথিবীর যা গতি হয় অতিবড় বাস্তববাদীও তা চাইবেন না। একটা হোলো অর্থ আর একটা হোলো অনির্বচনীয় রস অর্থাৎ emotional qualities। ভাষান্তরে অর্থ-বস্তুর (substance) অনুবাদ হয় কিন্তু সুরমণ্ডল (musical atmosphere) তো অনির্বচনীয়, তার অনুবাদ করা চলে না। একটাকে বলা যায় শব্দ আর একটা হোলো রস। রস বস্তুটি শব্দাতীত। 'রজনী সাঙন ঘন' কবিতায় শব্দের অপরূপ অনির্বচনীয়তা আছে। শব্দকে এখানে musical qualityতে ব্যবহার করা হয়েচে।

"ছবি আঁকতে হোলে চিত্রকরকে তুলিতে রং দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। ভাস্কর কিন্তু পাথরের বাধাকেই জয় করে আপন চিদ্‌বস্তু প্রকাশ করে,

পাথরকেই সহায় করে সে মূর্তি গড়ে। তার প্রকাশ পাথরের প্রকাশ। তত্ত্ব (thought) একটা বাধা (resistance) দেয়। তাকেও জয় করে রস-সৃষ্টির একটা বিশেষ আনন্দ আছে। সে আর তখন তত্ত্ব থাকে না। সে তখন রসমূর্তি পরিগ্রহ করে।

"কেন বাজাও কাঁকণ কন কন—এইসব কবিতার অর্থ আর কি? অর্থীর এখানে প্রবেশ না করাই ভালো। 'বলাকাতে'ও প্রথম চার পাঁচটি কবিতায় আমার হৃদয়ের বেদনা বা আবেগের প্রকাশ। অন্তরের তারগুলি যেন কার আঘাতে বেজেচে, আলোর পরশ পেয়ে বা পরশ পাবার আগেই পাখী যেমন অনির্বচনীয় ভাবের বেগে গান গায় কতকটা তেমনি। কাজেই সেই ভাবেই তার ছন্দ বেজেচে।

"তারপর এল ছবি। ছবিতে একটা প্রশ্ন। এখানে চিন্তা (thought) রূপ পরিগ্রহ করে ভাবাবেগের (emotion) দ্বারা জড়িত ও চালিত। তাই এ কোথাও চলে, কোথাও থামে। ছবির প্রশ্নকে তত্ত্ব বলা যায় বটে কিন্তু এই প্রশ্ন হোলো হৃদয়ের (question of the heart), তবু প্রশ্ন বলেই তার মধ্যে মনন ও ধ্যানবস্তুতা রয়েচে। তাই এখানে ধ্যান ও ভাবাবেগ দুইই যুক্ত হয়ে চলেচে।

"এই চলাটা সৈন্যের নিয়মবদ্ধ বা কেরানীর অনিয়মিত দ্রুত দৌড়ানো নয়। এতে চলা না-চলা দুই জড়িয়ে রয়েচে। প্রশ্ন ও তার উত্তর পাওয়া দুইই চলেচে। নানাবিধ ভাব যেন বাঁধন ও মুক্তি দুইই পেল। এই কবিতায় এক শ্রেণীর ভাবাবেগের (a class of emotions) প্রকাশ দেখা গেল। তাজমহলেও thought, যদিও তা emotional thought। চিন্তার সেই বস্তুতাকে চিদ্‌বস্তুতা বলা যেতে পারে। ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্তিও আছে, ভাস্করের হাতের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে যেমন শিব-পার্বতী যুক্ত হয়ে আছেন। গতি যদিও রীতিতেই চলে কিন্তু তার মধ্যে বিপুল বেগ এলে রীতির বাঁধন ভেঙে যায়। আগাগোড়া বাঁধন মেনে চলে মানুষের তৈরি খাল, বিধাতার সৃষ্টি যে নদী সে ভেঙে চুরে এঁকে বেঁকে না চল্লে চলতেই পারে না।

"বলাকার অষ্টম কবিতা—হে বিরাট নদী। তাকে ছন্দের সংকীর্ণ বাঁধনে বাঁধা অসম্ভব। এতে যে চিন্তা ও রস যুক্ত হয়ে রয়েচে সে বারবার মুক্তি চায়। কখনো তাতে নূপুর পরে রস-রূপ নৃত্য করেচে আবার কখনো চিন্তা এসে বাঁধন ভাঙতে চেয়েচে; শিব-পার্বতীর মতো দুইয়ের মিলনে ভাব-রস

নিয়মের সংকীর্ণ বাঁধন হতে মুক্তি নিলেও আনন্দলোকে তুইই মুক্ত হয়ে দেখা দিয়েচে।

"নটরাজের এই মুক্ত নৃত্যকে আমি ছেলেবেলা থেকে উপলব্ধি ও সম্ভোগ করেচি কিন্তু সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করে তাকে স্থাপন করতে সংকুচিত হয়েছি। এই সব বিষয়ে আমি খুবই লাজুক। গঙ্গা কত কাল যে ব্রহ্ম-কমণ্ডলুর মধ্যে বদ্ধ হয়ে ছিলেন তা জানিনে, ভাগ্যে ভগীরথ তাঁকে মুক্ত করেছিলেন।

"বিলেতে লোকের বিয়ে হয় courtship করে। এক একজন লাজুক এখনও আছে যে দীর্ঘকাল ধরে courtship চালিয়েও মুখ ফুটে বিয়ের কথা বলতে সাহস পায় না। আমাদের দেশে লাজুকদের সেই বিপদ নেই। গুরুজনেরাই কাজ এগিয়ে দেন; মুক্ত নৃত্যের সঙ্গে আমার courtship চলেছিল বহুকাল। তার পরিচয় কোথাও কোথাও আমার আগের লেখাতে ধরতেও পারবেন। কিন্তু তাকে সর্বজনসমক্ষে স্বীকার করেচি এই বলাকার যুগে।

"বাউল অভিনয়ে আমাকে নৃত্য করতে দেখে অনেকে চমকে উঠেছিলেন। তাঁরা জানেন না নৃত্য আমার ভিতরে বহুকাল হতেই আছে। আমার স্বভাবের মধ্যেও তার প্রতি আকর্ষণ রয়েচে। আউল-বাউলদের মধ্যে সংগীতের মতো নৃত্যও ভাবের একটা মস্ত ভাষা। কিন্তু এতবড় একটা প্রকাশ হলেও কখনও নৃত্যকে আমি সর্বজনসমক্ষে স্বীকার করিনি। এখন নৃত্যকে আর চেপে রাখতে পারচি না। ছোট শিশুদের মধ্যেও তার প্রেরণা দেখে আমার মধ্যেও প্রেরণা জেগেচে। নৃত্য ও সংগীত হোলো মানব-অন্তরাত্মার গভীরতম ভাবের ভাষা। যদি সেই নৃত্য-গীতকে সেই মহাকর্তব্য হতে ভ্রষ্ট করে শুধু ব্যাকরণ মাত্র বানিয়ে তুলি তবে কি দুর্গতি! তার চেয়েও দুর্গতি যদি তাদের নিয়ে নবাবী মহলের ভোগের দাসীতে পরিণত করি। উপপত্নী হবার চেয়ে ধর্মপত্নী হয়ে দুঃখে কষ্টে মরণও ভালো।

"ছন্দের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক না হলেও এখানে বলি, আমার মধ্যে চিত্রকলার প্রতি টানও ছেলেবেলা হতেই ছিল। এখন তা আর চেপে রাখা যাচ্চে না। পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় তো ঘনিয়ে আসচে, তাই যাঁর যাঁর সঙ্গে এতকাল অন্তরের যোগ ছিল তাঁদের সবারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা স্বীকার না করে গেলে এখন আর চলবে কেন?

"মুক্ত ছন্দের মতো মুক্ত ভাষাও আমার চিরদিনের প্রিয়। মুক্ত ভাষা বলতে সহজ সরল প্রাকৃত বাংলাই বুঝতে হবে। আমাদের যুগে সাধু বাংলারই চলন ছিল। তাই প্রকাশ্য আসরে আমি সাধু বাংলাই চালিয়েচি, কিন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রতি চিরদিনই আমার প্রাণের গভীর টান। বাল্যকালে আমি যে-সব ভৃত্য ও দাসীদের মধ্যে পালিত তারাই আমাকে সেই ভাষা দিয়েচে। তাদের কাছে শোনা ছড়া ও লোক-সাহিত্য আমাকে অনেক কিছু দিয়েচে। আমার মা-মাসীদের মুখেও সেই চলিত ভাষাই শুনেচি। আমাদের বাড়ীতেও বড় বড় ভাব প্রকাশের জন্য চলিত বাংলারই চল্‌তি ছিল। বড় দাদার লেখাতে তার অনেক প্রমাণ পাবেন।

"'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রভৃতি বইয়ে চলিত বাংলা আছে কিন্তু তাতে মহৎ কোনো ভাবকে প্রকাশ করতে দেখিনে। এই দুঃখ আমার মনে সদাই জাগতো। বরং আমি ছেলেবেলায় যেসব রূপকথা শুনতাম তাতে অতি অপূর্ব সব চিত্র ও ভাব চল্‌তি বাংলার সহজ ছন্দে ঝংকৃত হচ্চে শুনতে পেতাম।

"শুনেচি বেদের ও উপনিষদের সময়ে সাধু ভাষায় ও চল্‌তি ভাষায় বিচ্ছেদ বেশি ছিল না। কাজেই সেযুগের মনীষীরা তাঁদের বড় বড় ভাবকে যে সহজ সুন্দর করে চল্‌তি কথার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতেন তাতে আর আশ্চর্য কিছু নেই। তাঁদের কথার আঁট ও জোর দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম জাবালের উপাখ্যানে যে অপূর্ব শক্তির পরিচয় পাই তা যে কত বিস্ময়কর তা আপনাদের আগেই বলেচি। অনেক চেষ্টায়ও ব্রাহ্মণ কবিতায় আমি সেই শক্তি দেখাতে পারি নি।

"তবে জৈন ও বৌদ্ধ যুগে চল্‌তি ভাষাতে ও সাধু ভাষাতে দেখা যায় যে বেশ প্রভেদ দাঁড়িয়ে গিয়েচে। তবু বুদ্ধ প্রভৃতি মহাগুরুর দল তাঁদের গভীরতম তত্ত্বকে যে চল্‌তি ভাষায় প্রকাশ করতে সাহস পেয়েচেন তাতেই তাঁদের মনের জোর বোঝা যায়।

"কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা তাঁদের নাটকে প্রাকৃতকে ব্যবহার করলেও তাঁরা প্রাকৃতের হাতে বড় বড় ভাব ও চিন্তা প্রকাশের ভার দেন নি। প্রাকৃত লেখার অসাধারণ শক্তি থাকলেও প্রাকৃতের উপরে অতটা ভরসা করবার মতো সাহস তাঁদের ছিল না। তাঁরা প্রাকৃত দিয়ে ছোট খাট বিষয়, হাসি ঠাট্টা, এমন কি মেয়েদের প্রেম-বেদনার আঘাতও কখনো এক আধটু

প্রকাশ করেছেন; কিন্তু যে ঐশ্বর্য প্রকাশের ভার তাঁরা সংস্কৃতকে দিয়েচেন সে ভার তাঁরা প্রাকৃতকে দিতে কখনো সাহস পান নি। তাঁদেরই বা দোষ দেব কি করে?

"যে শিল্পী মন্দির কি প্রাসাদ রচনা করে, সে তার বুনিয়াদ গড়তে চায় কঠিন ধ্রুব প্রতিষ্ঠার উপরে। চল্‌তি বালুর বা জলের স্রোতের উপর ইমারত কে গড়বে? আবার ধনবন্ত লোকে সুরক্ষিত করে রাখে লোহার বা কঠিন কোন জিনিসের তৈরি সিন্দুকে। কিন্তু যে সিন্দুকের চারদিকের পাটগুলি বরফের মত ক্রমাগত গলে যায় বা বালুর মত উড়ে যায় সেই সিন্দুকে কি কেউ মণি-মাণিক্য রাখতে ভরসা পায়!

"সংস্কৃত হোলো ব্যাকরণ ও রচনা-রীতির দৃঢ় শাসনে সুদৃঢ় লোহার সিন্দুক। এতে মণিমাণিক্য রাখা চলে। সর্বকালে সর্বদেশে তার একটি ধ্রুব স্বরূপ আছে। কিন্তু প্রাকৃত তো চল্‌তি জলধারা। যুগে যুগে দেশে দেশে ক্রমাগতই তার রূপ হতে রূপান্তর ঘটচে। এমন উড়ন্ত বালির বুনিয়াদের উপরে মন্দির কে গড়বে?

"তবে বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা এমন অন্যায় করলেন কেন? কারণ, মানুষই তাঁদের লক্ষ্য ছিল; ভাবের মণিমাণিক্যগুলো সুরক্ষিত করা তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল না। তাঁদের লক্ষ্য ছিল যাতে এইসব ভাব সহজ সরল নরনারীর কাছে পৌছুতে পারে, তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে। তাতে হয়তো এইসব চিন্তা ও ভাবের মধ্যে ক্রমে কিছু বিকার ও পরিবর্তন আসতে বাধ্য হয়েচে। কিন্তু তবু তা মানুষের জীবনে কাজে লেগেছে। যে খাদ্যে মানুষের দেহ বাঁচে সেই খাদ্যও তো সহজে বিকৃত হয়, তবু কে কবে মানুষকে ইট-পাথরের মতো সুদৃঢ় সুরক্ষিত জিনিস খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েচে?

"যেসব মহাকবিদের প্রধান লক্ষ্য ছিল তাঁদের কাব্যকে বাঁচিয়ে রাখা, তাঁরা চিরদিন সংস্কৃতের সুরক্ষিত পাত্রই আশ্রয় করেচেন। ভবভূতি তো স্পষ্টই বল্লেন, 'আমার কাব্য যদি তোমরা না বোঝো, না আদর করো, তবে নাই করলে। আমার কাব্যের সমঝদার এখন এদেশে না থাকলেও অন্য দেশে থাকতে পারেন, আর এযুগে কেউ না থাকলেও ভবিষ্যতে কেউ না কেউ জন্মাবেন।' এমন লোক কি কখনো প্রাকৃত ভাষার হাতে তাঁদের সর্বস্ব ভরসা করে সঁপে দিতে পারেন?

"বাংলা দেশে মহাপ্রভু তো কম পণ্ডিত ছিলেন না। কিন্তু মানুষই তাঁর

লক্ষ্য ছিল বলে তিনি সংস্কৃত ছেড়ে বাংলাতেই মনের কথা বল্লেন। আর যে-সব ধর্মগুরুর প্রধান লক্ষ্য মানুষ, তাঁদের এছাড়া গতি নেই।

"রামমোহন যখন এদেশে এলেন তখন পণ্ডিতদের কাছে বাংলার কোনো স্থান নেই। সাধুজনের যোগ্য বাংলা রচনার নিয়মকানুনটি পর্যন্ত তৈরী করে তাঁকে পণ্ডিতদের কাছে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হোলো। কিন্তু তিনি অকালে চলে গেলেন। তারপর যেসব পণ্ডিতেরা বাংলা ব্যবহার করলেন তাঁদের ভক্তি ছিল সংস্কৃতেরই উপরে। বাংলাকে তাঁরা 'নোকর-চাকরের' মতো ব্যবহার করেচেন, সাহেবেরা যেমন খানসামা-বাবুর্চিদের ব্যবহার করেন ;—তাদের সেবা নিলেও ভারতীয় মানুষ কিছুতেই সাহেবদের শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। এইসব 'নোকর-চাকরদের' উপরে তাঁরা বৃহৎ কোনো কর্মের ভার কখনও দেননি।

"আমরা সেই সাধু ভাষার যুগে জন্মেচি। লোকে চারিদিকের মানুষের কাছেই আপন ভাষা পায়। তবু আমার মনে ছেলেবেলা থেকে খেদ ছিল, কেন মানুষের সঙ্গে সহজ সরল চল্‌তি বাংলা দিয়ে আমরা লেন-দেন করিনে। চিঠিপত্রে যেখানে মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ সেখানে আমি চিরদিন সাহস করে চল্‌তি বাংলাই ব্যবহার করেচি। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সাহিত্যের আসরে সে ভাষা চালাতে প্রথমে সাহস পাইনি।

"বড় আসরে প্রাকৃত বাংলাকে আনতে বহুদিন সাহস না পেলেও আমার লেখা তখনকার চিঠিপত্র প্রভৃতি দেখলে বুঝবেন সেই দিনেও বড় বড় সব ভাব ও চিন্ময় ঐশ্বর্যকে আমি চল্‌তি বাংলায় সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রকাশ করে তৃপ্ত হয়েচি। সেগুলো আজ বাংলা সাহিত্যের ভাল আসরে আনলেও বেমানান হবে না।

"তখন মাঝে মাঝে লোকে যেটুকু চলিত বাংলা আমার বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, চিঠিপত্র প্রভৃতি উপলক্ষ্যে দেখেচেন তাতেই আর ঘরে পরে আমার নিন্দার শেষ ছিল না। ভারতীয় ভক্ত ও বাউলদের দৃষ্টান্তে মনে কিছু সাহস সঞ্চয় করে শান্তিনিকেতনের উপদেশগুলি চলিত বাংলায় লিখলাম। বলা বাহুল্য, তখন তাতে আমার উপরে চারিদিক হতে আশীর্বাদ-বৃষ্টি হয়নি। এমন ভাবেই আমার দুঃখের দিন যাচ্ছিল। এমন সময় ভগবান সহায় জুটিয়ে দিলেন।

"এই পথে প্রমথও নামলেন। আমাকেও তিনি ডাকলেন। মনে আরো ভরসা ও আনন্দ হোলো। তাঁর এই বিষয়ে অদ্ভুত শক্তি ও সাহস। তিনিও আমার সায় চাইলেন। তাঁর পত্রিকার 'সবুজপত্র' নামটাও আমার খুব

ভালো মনে হোলো। মনে হোলো এই সহজ সরল সবুজ পাতার পর্ণপুটে ভরে নানা বর্ণের পূজার ফুল বাণীর মন্দিরে উপহার দেওয়া চলবে। ১৩২১ সালে সবুজপত্র বের হোলো। তাতে সায় দেবার জন্যই আমার বলাকার কবিতাপাঁতি একে একে মানস-লোক হতে বের হয়ে সকলকে ডাক দিয়ে উড়ে চল্লো।

"ভাবলাম, এই সবুজপত্রে চল্‌তি বাংলার শ্রীচরণে সর্ব ঐশ্বর্য সব ভাব ও সংস্কৃতির নানা বাঙ্ময় সম্পদ্ শ্রদ্ধার সঙ্গে ভরে ভরে দেওয়া যাবে। চল্‌তি বাংলাকে শুধু ছোট ছোট ভাব ও বার্তার বাহক করে রাখলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। তার গলায় যুগযুগান্তের সাধনার অর্জিত ও সঞ্চিত ভারতীয় ঐশ্বর্যের মুক্তার মালা, মাথায় রত্নমুকুট দিয়ে, ঘুঁটে-কুড়ুনীকে (cinderella) মহীয়সী করে তুলতে হবে।

"প্রমথের ডাকে সাড়া দিলাম। মুক্ত ছন্দ ও চল্‌তি বাংলা যা এতকাল আমার মনে মনে চাপা ছিল তাকে সর্বজনসমক্ষে স্বীকার করলাম। বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যময় মহনীয় রূপটি যদি আমাদের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়ে থাকে তবেই এই প্রয়াস সার্থক হয়েছে।"

এই বিষয়ে কবিগুরু যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিয়া কবিগুরুর কথা শেষ করিলাম। এখন আমার নিজস্ব দুয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রকরণ শেষ করি। 'নিবেদন' ও 'বলাকার জন্ম-কথা'তে আমাকে বাধ্য হইয়া কিছু বলিতে হইয়াছে। আর সব প্রকরণে কবিগুরুরই কথা। নানা সময়ে শ্রুত একই বিষয়ের বা কবিতার ব্যাখ্যায় কালের বিস্তর ব্যবধান থাকিলেও প্রকরণের ঐক্যবশত তাঁহার কথাগুলি একত্রই লেখা হইয়াছে। কবিগুরুর উদ্ধৃত শ্লোকাদির মূলস্থানগুলি আমি পরে যোগ করিয়া দিয়াছি।

গ্রন্থ-ভূমিকা*

কবিগুরুর কথা

আমার কাব্যের তাৎপর্য আলোচনার ক্ষেত্রে আমার অধিকার আপনাদের সকলের সঙ্গে সমান। এক্ষেত্রে আমার মতে শ্রোতা ও রচয়িতার তুল্যাধিকার। তবে রচয়িতা হয়তো সেই সময়ের অনেক কথা জানেন, আর যেসব অবস্থার বিশেষত্ব তাঁরই জানা সেসব হয়তো অন্যের জানা নাও থাকতে পারে।

(বলাকা-রচনার যুগের মানসিক অবস্থা আমি এখনো ভুলিনি। কারণ আজও আমার মনে সেই বেদনা চলচে। য়ুরোপের দম্ভ ও লোভ যে সর্বজাতির কল্যাণযাত্রার পথকে রুদ্ধ করে জগদ্দল-পাথরের মতো সবার বুকের উপর চেপে বসে থাকবে তা কখনও বিধাতার অভিপ্রায় হতে পারে না। এতে সারা জগতের অন্তরাত্মা প্রপীড়িত। য়ুরোপের পক্ষেও এতে কল্যাণ নেই। নিপীড়িত জাতিদের জন্য যে মুক্তির প্রয়োজন সেই মুক্তি য়ুরোপেও চাই। সকলকে মুক্তি না দিলে তারও তো মুক্তি নেই। যে অকল্যাণ সে অন্যের উপর চাপাতে চাচ্চে সেই অকল্যাণের চাপেই সে মরবে। তারই হাতের আগুনে তারই ঘর দগ্ধ হয়ে ছারখার হয়ে যাবে। তাও তো দেখতে চাইনে। ভাবী কালে সবারই কল্যাণ হোক তাই চাই—সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু।

আমি মনে মনে সেই ভাবী কালের পক্ষ মেনে নিয়েছি। নিজেরা তো বহু অন্যায়ের ভারে প্রপীড়িত, কিন্তু ভবিষ্যৎ সন্তানদের ঘাড়ে যেন কখনো অকল্যাণ

* কবির কাছে আমি 'বলাকার' একটি ভূমিকা প্রার্থনা করি। তার উত্তরে তিনি বলেন, " 'বলাকা'র নানা কবিতার ভূমিকা প্রসঙ্গে আমি এতদিন ধরে যে-সব কথা বলেছি, তা-ই সাজিয়ে 'বলাকা'র ভূমিকা করুন না কেন।"

তখন নতুন ভূমিকা লেখার মতন তাঁর সময় বা শক্তি নেই।

তাঁর কথামতো সেগুলি একত্র করে সাজিয়ে তাঁকে দেখালে তিনি মাঝে মাঝে যা বলেন বা এক-আধটুকু অদল-বদল করেন তাও এর অন্তর্গত করে নেওয়া হয়েছে। আবার দুই একটি কবিতার ভূমিকা এর মধ্যে যুক্ত করা হয়নি। সেগুলি সেইসব কবিতার সঙ্গেই দেখে নিতে হবে।

গ্রন্থ-ভূমিকায় ও কবিতার ভূমিকায় একই কথা একটু বিচিত্র ভাবে পাই। সেই বৈচিত্র্যের লোভে এবং বন্ধুদের অনুরোধে কোনোটাই বাদ দেওয়া গেল না।

না চাপিয়ে যাই। তাই যখন যেখানে যাই সেখানেই সবারই কল্যাণের কথা সমভাবে বলি। আমার এই কথায় কেউ বা শ্রদ্ধা করেছেন কেউ বা অবজ্ঞা করেছেন। বিধাতা আমাকে তাঁর এই মৈত্রী ও কল্যাণবার্তা বহনের ভারই দিয়েছেন। তাই ঘরে বসে থাকবার আমার যো নেই। বলাকার যুগে না জেনেও আমি এই বার্তা নিয়েই অগ্রসর হয়েচি। কবিতাতেও আমার সেই বার্তারই প্রকাশ। কল্যাণের বার্তা নিয়ে আমার এই যাত্রার পতাকাই হোলো কবিতা। এই পতাকা বহন করতে গিয়ে জীবনে আমার বহু দুঃখ গিয়েচে। ঘরে পরে এর জন্য আমাকে কম লাঞ্ছনা পেতে হয়নি। আমার মনের মধ্যের ভাবগুলি 'সবুজপত্রে'র তাগিদে প্রকাশ করতে হোলো। বলাকার সুরু সেইখানেই। নবজীবনের পতাকা বহন করে এগিয়ে চলবার তাগিদ যে এলো তাকে অমান্য করতে পারা গেল না।

এখন মনে মনে বুঝচি এই পতাকা বহন করে চলাই আমার জীবনের সত্য। নির্ঝরিণীর স্বপ্নভঙ্গে বাইরে যাবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ বুঝলেও আমার জীবনব্যাপী অভিযানের কোনো অর্থ তখন বুঝিনি। এখন বুঝতে পারচি, মহাসাগরে ছাড়া এই যাত্রায় আর কোথায়ও অবসান বা সমাপ্তি নেই। পথের মধ্যে কত ঘাট কত জনপদ আমাকে কত শোভা-সৌন্দর্য-স্নেহ দিয়ে ডেকেচে, কিন্তু কোথাও তো থামতে আমি পারিনি। ভালো-লাগা কোনো ঘাটে আমার তো থামবার জো নেই। তাঁর আহ্বান যে ক্রমাগতই কানে আসচে।

এইখানে একটু ব্যক্তিগত কথা বলি। চলে চলে ক্লান্ত আমার মন দীর্ঘ যাত্রার অবসানে একটু শান্তি চাইলো। জীবনের অবসানে মন আর কর্ম চায় না, চায় শান্তি। তাই চলা হতে নিষ্কৃতি নিয়ে ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজায় বসতে চাইলাম। শঙ্খ ধূপ দীপ ফুলের মালা চন্দন সব উপকরণ একত্র করা গেল। তখন দেখি তাঁরই পূজার শঙ্খে মহামানবকে ডাকবার তাগিদ এলো।

*তাঁর আহ্বান যে শঙ্খের বুকের মধ্যে প্রতীক্ষা করচে, সেই শঙ্খকে আমি আমার পূজার আসনের পাশে মাটিতে রেখে কী করে শান্তিতে পূজা করি? শব্দের মধ্যে তাঁরই উদ্যত ব্যাকুল ধ্বনিকে চাপা দিয়ে আবার কিসের পূজা? তখন আমি কেমন করে শান্তির মন্দিরে আরামে পড়ে থাকি?

মানব-ইতিহাসের যিনি নায়ক তিনি ভগীরথের মতো তাঁর শঙ্খধ্বনিতে সর্ব-মানবের কল্যাণ-ধারাকে চালনা করচেন। এই ধারাতেই ভস্মীভূত সগর-

* বলাকার ৪নং কবিতা।

সন্তান নবজীবন পাবে। এই শঙ্খের ভার আমাকে যখন তিনি দিলেন তখন আমি কেমন করে পূজার ছলে তাকে আমার ঘরের মাটিতে ফেলে রাখি?

তাঁর এই শঙ্খই তো পাঞ্চজন্য। পঞ্চজন অর্থ সর্বজন। সর্বজনের মিলনের এই পাঞ্চজন্য বেজেচে। তিনি বাজাচ্চেন। সে শঙ্খ তো ধূলোতে লুটোলে চলবে না।

১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। হিমালয় রামগড়ে আছি; মীরা ও বৌমা আছেন সঙ্গে। আমার মনের মধ্যে একটা দারুণ বেদনা। সেসব কথা তাঁরা জানবেন কেমন করে? তার কিছু খবর জানতেন এণ্ড্রুজ সাহেব। তিনি যখন রামগড়ে আমার কাছে এসে আমার অন্তরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি আমার বেদনা তাঁকে জানালাম। খবর পাইনি, প্রমাণ পাইনি, তবু মনে হচ্ছিল সারা জগৎ জুড়ে যেন একটা প্রলয়কাণ্ড আসচে। বিশ্বব্যাপী একটা ভাঙাচোরা প্রলয়কাণ্ডের উদ্যোগপর্ব চলেচে। ৫ই জ্যৈষ্ঠ হতে ১২ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে আমার দুই, তিন, চার নম্বর কবিতা একে একে এলো। বলাকার মতই একে একে এরা আমার মানসলোক হতে বেদনাহত হয়ে কোন্ নিরুদ্দেশে যাত্রা করেচে। এদের মধ্যেও ভিতরে ভিতরে বলাকার মতোই একটি পংক্তিগত যোগ রয়েচে। তাই এই কবিতাগুলির বলাকা নাম সার্থক হয়েছে।

তখনও য়ুরোপের মহাযুদ্ধের খবর এদেশে আসেনি—আমার চার নম্বর কবিতা লেখবার* পর যুদ্ধের খবর পেলাম। তবু কি এক অব্যক্ত কারণে আমার মনের সেই বেদনা এই কবিতাগুলিতে বেরিয়ে এসেচে।

য়ুরোপের দারুণ যুদ্ধের খবর এলো। দারুণ প্রলয়ের সূচনা হোলো। যুদ্ধের শঙ্খ বাজলো। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সর্বজাতিকে সর্বনাশা মহামরণের যজ্ঞে যোগ দিতেই হোলো। মহাভারতের সেই মহাযুদ্ধের পর তবুতো শান্তি ও স্বর্গারোহণ পর্ব এসেছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে আর তা হবার নয়। বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ মহাপ্রলয় আসচে, এখন কোথায় শান্তি কোথায় স্বর্গ?

তাঁর শঙ্খ রইলো পড়ে। একদিন ইংলণ্ডে শেলী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি মনীষীর দল যে বিশ্বব্যাপী সাধনার কথা বলেছিলেন, তা আজ নিউবোল্ড, কিপ্লিং প্রভৃতির সংকীর্ণ বাণীতে চাপা পড়ে গেছে। ভৌগোলিক ও জাতীয়তার দেবতার কাছে বহু নরবলি চাই। বড় আদর্শ যাঁদের, তাঁদের দুঃখ অপমান ও

* ১২

নির্যাতনের শেষ নেই। কিন্তু তাঁরাই তো ভবিষ্যৎ যুগ তৈরি করচেন। সেইসব ভবিষ্যৎ যুগের স্রষ্টার দল এখন যেন চাকভাঙা মৌমাছির দলের মতো নিরাশ্রয় ও পদে পদে অপমানিত। এই যুদ্ধের যোদ্ধাদের চেয়েও এঁরা অনেক বেশি আহত ও ব্যথিত। এঁরা বিধাতার সেই শঙ্খধ্বনি শুনেচেন, মানব-সংস্কৃতির নতুন চাক এঁরা বাঁধতে যাচ্চেন। এইসব সাধক নানা দেশেই ছড়িয়ে রয়েচেন। রোমা রোলাঁ, বারট্রেণ্ড রসেল প্রভৃতি মনীষীরা এই দলের লোক। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে এঁরা অপমানিত, তিরস্কৃত, অবরুদ্ধ। এঁদের পিছনে আরও কত অজ্ঞাত অখ্যাত লোক রয়েচেন যাঁরা আজ ভবঘুরের (vagabond) মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্চেন। তবু তাঁরা বলচেন, 'ঐ যে প্রভাত আসচে, ঐ তো অরুণোদয় হয়ে এলো।' পাখীর মত এঁরা কি-জানি কি করে আগে হতে নবযুগের প্রভাতের খবর পেয়েচেন। 'ভোর না হতে ভোরের খবর' তাঁদের কাছে এসেচে।

জগতে যুগে যুগে হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে বিধাতার এই উদ্বোধন আসে। লেভি সাহেব* বলেন খ্রীষ্টের হাজার খানেক কি হাজার দেড়েক বছর পূর্বে আর্যজাতির মধ্যে এই উদ্বোধন একবার এসেছিল। মিশর দেশেও এক সময়ে এই উদ্বোধন দেখা গিয়েচে। এই দুঃখের দিনেও যদি সেই উদ্বোধন আজ এসে থাকে তবে তাকে প্রণাম করে বলতে হবে—

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব-যুগ সার।

মানবের এমন মহাযুগ, এমন মহাক্ষণ আর কখনো আসে নি।

মন্থনে দুধ হতে মাখন বেরিয়ে আলাদা হয়ে উঠে আসে। আজও দুঃখের মন্থনে জীর্ণ প্রাচীনতা হতে নবীনের সাধনা উঠে আসবে। সেই নবীনও যদি প্রাচীনের বন্ধনে জীর্ণতার মোহপাশে বদ্ধ হয়ে থাকে তবে জগতে কারা আনবে মুক্তি ?

এই জগৎ-জোড়া সাগর-মন্থনের মধ্যে শুধু বিষ দেখলেই চলবে না। এতে অমৃতও উঠেচে। কিন্তু অযোগ্য রাহু-কেতুরা সেই অমৃত দাবী করচে। এখনও প্রাচীন জীর্ণ লুব্ধের দল এই সুধারই ভাগ চায়। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ য়ুরোপের League of Nations। য়ুরোপে যে-সব ঝানু বৃদ্ধ রাজনীতিওয়ালার দল পাকে প্রকারে যুদ্ধটি বাধিয়ে দিলেন, তাঁরাই বেলজিয়ামের উপর অত্যাচারের

* সিলভ্যাঁ লেভি।

কথা জোর গলায় ঘোষণা করে নবীনদের ডাক দিলেন যুদ্ধে নামবার জন্য। এদিকে এঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে অবাধে Poison Gas, বোমা ইত্যাদি তৈরি করচেন ও নির্বিচারে তা চালাচ্চেন, আবার মুখে ধর্মের দোহাই দিতেও এঁরা ছাড়চেন না। কিন্তু এখন আর এইসব কূটনীতি দিয়ে এঁরা থই পাচ্চেন না।

এইসব দারুণ নীচতা ও ভণ্ডামি কত কাল চলবে? এর মধ্যে শিব কি আর আসবেনই না? দেব-দৈত্য দুইয়ে মিলেই বিশ্বব্যাপী মন্থন কি চিরদিনই চলবে?

তা হতে পারে না। ভাল মন্দ নানা ফলই ক্রমে ক্রমে দেখা দেবে। মন্থন হয়ে গেলে দেখা যাবে সাগরের অন্তরে লুকোনো সুধা ও বিষ দুইই উঠে এসেচে, মণি-মাণিক্যের ঐশ্বর্য ও ভস্মকরা প্রলয়ের আগুন দুইই দেখা দিয়েচে। য়ুরোপের ঝানু রাজনীতিওয়ালারা চান, সুবিধামতো জিনিসগুলি বিশেষ বিশেষ দেশের জন্য তুলে রেখে যুদ্ধের নামে যত দুর্গতি তা' সারা জগতে যত নিঃসহায় নিরুপায়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু উদার বিশ্বব্যাপী বিধাতার বিধানে এত ছল চাতুরী কত কাল চলবে? ঝুনো ঝুনো রাজনীতিওয়ালার দল সাম্রাজ্যবাদীর দল চান যে এই মন্থনে বাসুকির লেজের দিকটা সুবিধামতো তাঁরা ধরে থাকবেন আর যত সুবিধার অমৃতটুকু আদায় করে নেবেন! আর হতভাগাদের দিতে চান বাসুকির মুখের দিকটা, যেন তারা মন্থনের বিষেই পুড়ে মরে যায়, অমৃতের ভাগ তারা যেন আর না পায়। যুদ্ধে মরবে হতভাগার দল কিন্তু তার ঐশ্বর্য পাবে ঐসব ঝুনোদের দল! ধর্মের যা অধিকার, পাপ এসে তা চায় কেড়ে নিতে! সেবার দৈত্যদের দেবতারা ঠকিয়েছিলেন। এবার যেন দৈত্যেরাই সকলকে ঠকাতে এসেচেন!

১৯১৮ সালে এই মহাযুদ্ধ শেষ হোলো, কিন্তু দুঃখের দুর্গতি তো শেষ হোলো না। দেশে দেশে দুর্গত নিপীড়িতদের দারুণ বেদনা রাজনীতিওয়ালা ঝুনোদের বহু চেষ্টাতেও চাপা দিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। সেই বেদনা ক্রমাগত আমার মনকে নাড়া দিচ্ছিল।

হঠাৎ বিশেষ-কোনো-একদিনের কোনো-এক উত্তেজনার বশে আমার বলাকা লেখা নয়। তা হোলে এর মূল্য হয়তো অনেক কম হোতো। বলাকার ব্যাকুল কবিতাগুলি এক বৈশাখে (১৫ই বৈশাখ ১৩২১) আরম্ভ

হোলো, মাঝে এক বৈশাখ গেল, তার পরের বৈশাখে* তা শেষ হোলো। অর্থাৎ দুটি বছর লাগলো তা' শেষ হতে। এক হিসাবে বলাকার আরম্ভে ও শেষে মিল আছে। এর আরম্ভ ও অবসান দুইই বৈশাখের নবারম্ভের জ্বলন্ত গতিতে। গানের যেখানে আরম্ভ সেইখানে এসে তার অবসান, এই ধ্রুবযোগ রয়েছে বলেই ধুয়ার ধ্রুবত্ব। দেব-পরিক্রমা করতে হলেও যেখানে আরম্ভ সেইখানে এসে প্রদক্ষিণ শেষ করতে হয়। বলাকায় যেন একটি প্রদক্ষিণ পুরো সমাপ্ত হয়েচে। অগ্নিময় আরম্ভের সমাপ্তিও অগ্নিতে।

কবিতা তো অনেকগুলি। তার একটারই নাম বলা যেতে পারে 'বলাকা'†।

তখন কাশ্মীরে ছিলাম। সন্ধ্যাকাল, ঝিলম নদীর উপরে বসে আছি—চারিদিক স্তব্ধ। মনে হচ্ছিল যেন পদ্মার উপরেই বসে আছি। অবশ্য যখন পদ্মার উপর ছিলাম তখন আমি যুবা, আর এখন আমি বৃদ্ধ। তবু কেমন একটা কালাতীত যোগে সেই পার্থক্যটা ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। ঝিলমের উপরে আমার মাথার উপর দিয়ে একদল হংস উড়ে গেল। এই যে হংসের মালা তাকেও বলাকাই বলে; যদিও বলাকা আসলে বকপংক্তি। এখানে আসল কথাটা হচ্চে যেন কোন অনির্বচনীয় ডাক শুনে সেই আবেগে কোন্ সুদূরের যাত্রা। সেই যাত্রার ধ্বনি শুনে বিশ্বচরাচর সর্বত্র জাগচে একটা যাত্রার বেগ। সর্বত্রই এক ব্যাকুলতা—

হেথা নয়, অন্য কোথা,
অন্য কোন্ খানে।

এই বলাকার গতির সঙ্গে কবিতাগুলোর অন্তর-গত যোগ রয়েচে বলে এই কবিতাপংক্তিরও নাম দেওয়া গেল 'বলাকা'। এরাও যেন কোন্ এক অনির্বচনীয় ডাক শুনে কোন্ অজানা পথে বের হয়ে চলেচে। যদি এর মধ্যে সত্যগতির ধ্বনি জেগে থাকে, তবে এই গতির ছন্দে চারিদিকে গতির জন্য ব্যাকুলতা জাগবে, জরার মোহবন্ধন কেটে যাবে :—এই আশা কি করতে পারি?

[দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতাটির কোনো ঐতিহাসিক ভূমিকা বা background আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় কবিগুরু বলিতে লাগিলেন—]

* ঐ, ১৩২৩।

† 'বলাকা'র ৩৬নং কবিতা।

*দ্বিতীয় ও তৃতীয় কবিতা যখন লিখচি তখন কিছু খবর না পেয়েও আমার মন যেন জগতের কোনো এক মহা অমঙ্গলের আশংকায় ব্যাকুল। ১৩২১ সালের ৪ই জ্যৈষ্ঠ এই কবিতা আমার লেখা, য়ুরোপীয় যুদ্ধের খবর (cablegram) এলো তার পরে। এণ্ড্রু সাহেব আমার কবিতার মর্ম আগেই শুনেছিলেন। তিনি মহাযুদ্ধের খবর পেয়ে বল্লেন, 'তোমার কাছে ভিতরে ভিতরে বেতার (wireless) টেলিগ্রাম এলো কেমন করে?' আমি তাঁকে বল্লাম, 'একে যুদ্ধ বললে ঠিক বলা হবে না। মানবের এক মহা যুগ-সন্ধি সমাগত। একটা অতীব ভীষণান্ধকার রাত্রি অবসান-প্রায়। নবযুগের রক্তবর্ণ অরুণোদয় পূর্বাকাশে যেন দেখা যাচ্চে। এইজন্যই আমার মনের মধ্যে এমন একটা অকারণ উদ্বেগ এসেছিল। মানবাত্মার নতুন অভিযান (adventure) যে আসচে তার সূচনা যেন পাচ্চি। অনেক দুঃখের এই অভিযান, বহু দুঃখ-বেদনা-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই অরুণোদয়। হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে দিয়ে এই নবারুণের অর্ঘ্য রচনা করতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। এই অর্ঘ্য রচনা করতেই হবে। সর্বনেশে যুগ-সন্ধি সমাগত। প্রিয়তম পতিকে গ্রহণ করতে হলে নববধূকে যেমন পিতৃগৃহের সব কিছু অতিপ্রিয় অভ্যস্ত সর্ববিধ আচার-বিচার-আরাম ছেড়ে নবরক্তপট্টাম্বরে অজানা সংসার-যাত্রার জন্য ঘরের বাইরে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াতে হয়, তেমনি আমাদেরও আজ শুধু পুরাতন মতামত নয় প্রাচীন সব আচার-বিচার-সংস্কার ত্যাগ করে যুগ-যুগান্তরের কর্ণধার পতির হাত ধরে অজানার পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে।

এই নবযুগ কোনো বিশেষ দেশ কাল বা জাতিকে নিয়ে নয়। এর মধ্যে বিশ্বমানবের সর্ব-যুগের তাগিদ রয়েচে। এই কবিতা শুধু অক্ষর গুণে পংক্তি মিলিয়ে নিজের মনের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে লেখা নয়। এই কবিতায় আমার কথা, আমার ধ্বনিকে চাপা দিয়ে, তাঁর কথা, তাঁর ধ্বনিই জয়ী হয়েচে। বিশাল পদ্মার কূলভাঙ্গা বিপুল জলরাশি যেন একটা সংকীর্ণ খালের দুই কূল ভেঙে চুরে তার উপর দিয়ে ভীষণ ভাবে বয়ে গেল। তেমনি আমার ছোট কথা, আমার সুখদুঃখ, আমার ছোট আয়োজন, সব উলট-পালট করে দিয়ে বিশ্ব-বিধাতা তাঁর বিশ্ববাণী বাজিয়ে নিলেন। এই লীলা আমার জীবনে বহুবার দেখেচি। সেই যে পত্নীসর যাবার পথে (১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪) বোটে বসে শরতের আনন্দে ভরপুর হয়ে 'নব নব রূপে এস প্রাণে' গানটি গাইছিলাম তখন হঠাৎ

---

*বলাকা'র ২+৩নং কবিতা।

আমার গান থামিয়ে দেখি তাঁর বাণী বাজছে। তখন আমার অন্তর্যামী কবিতাটিকে যেন আপনার মধ্যে পেলাম।* তখন দেখলাম—

তুমি যা বলাও আমি বলি তাই। আমি যেতে চাই, যে পথে সর্বজনের চলা ফেরা। কিন্তু দেখছি সেই চলা-পথে আমার চলা অসম্ভব।

'যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে' সে পথে তুমি আমাকে 'চলিতে দিতেছ কই'? তুমি নিয়ে চলেচো—

কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমো গহ্বরে—

তখন ভাবি,

ক্ষ্যাপার মতন কেন এ জীবন
অর্থ কি তার, কোথা এ ভ্রমণ

তবে কি

মোর প্রেম দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছে কোন অনাদি কাহিনী,

আমার দুঃখদাহেই কি জ্বলে তোমার প্রদীপ-শিখা?

যেন সচেতন বহ্নি সমান
নাড়িতে নাড়িতে জ্বলে।

এই বলাকাতেও সেই লীলা দেখলাম। চাই ঘরের খবর, তাই কান পেতে বসে আছি। হঠাৎ দেখি সেই খবর চাপা দিয়ে বিশ্বের বার্তা এসে হাজির। কী শুনতে গেলাম, আর কী শুনতে পেলাম।

বিশ্বের বার্তা তো এলো। তবে সে এমন রুদ্রমূর্তিতে এলো কেন? এ দোষ কি তাঁর? তাঁর বিচার তো এমন নয়।

কিন্তু অপূর্ব তাঁর সব লীলা। তাঁকে শুধু সুন্দররূপে দেখলে সম্পূর্ণ দেখা হয় না। এই জগৎ সুন্দর বটে কিন্তু এর মধ্যে সেই পরম পবিত্র ও মহাতাপসের সংযমকেও দেখা চাই। যখন আমরা সংযম হারাই তখন আমরা বিশ্বের পূর্ণতার উপলব্ধি হতে বঞ্চিত হই। বিশ্বের সৌন্দর্যও তখন আমাদের কাছে হারিয়ে যায়। কারণ তখন বিশ্বের ছন্দ হতে আমরা ভ্রষ্ট হই। Harmony কথাটার ঠিক বাংলা শব্দ পাচ্ছি না। তাই তাকে বাধ্য হয়ে সুন্দর বলেচি। সুষমা ও সৌষম্যও বলা যেতে পারতো।

* চিত্রা বইখানি খুলে কবি বলতে লাগলেন।

"হে মোর সুন্দর"* কবিতাতে সৌন্দর্যকে সেই বিশ্বছন্দের সঙ্গে harmony অর্থেই ব্যবহার করেচি। আমাদের চল্‌তি কথায় যাকে সুন্দর বলে তার মধ্যে সেই বিরাট্ অর্থ নেই। এই harmony জিনিসটা বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতায় (unwritten unity) ধন্য ও সার্থক হয়েচে। বিশ্ব-শিল্পীর শিল্পশালায় তার অবাধ অধিকার। চল্‌তি সুন্দরের অনেক সময় যেখানে প্রবেশ নেই, তার যেখানে যাবার অধিকার নেই, harmony সেখানেও অবাধে করে প্রবেশ। অপরূপ লীলা দেখা যায় সেই অনাহুত intruder-এর।

বিশ্বশিল্পী যেমন একদিকে ছন্দে নিয়মে সৃষ্টি করচেন, তেমনি আর একদিকে তিনি ভোলানাথ; তাই শিশু-ভোলানো ছড়া, ছেলে-ভোলানো গান, নবজীবনের চঞ্চলতা ও ক্ষ্যাপামি তাঁর জগতে বেমানান নয়। ধরা-বাঁধা নিয়ম ও যুক্তি (Logic) সব সময়ে সেখানে চলে না। বেখাপ্পারও সেখানে স্থান আছে। ভাঁড়ুদত্ত সাহিত্য হিসাবে চলে, কিন্তু তার শঠতা ও নীচতার এই জগতে পরমায়ু নেই। যা ভালো তাই সৎ, অর্থাৎ যা টিকে থাকতে পারে। অসতের এই জগতে স্থান নেই। সাহিত্যেও এই একটা মস্ত পরখ। কবেকার কালিদাস আজও জীবন্ত। অথচ কত কবি তালপাতার আগুনের মত তখনকার দিনে সকলকে মাতিয়ে আজ কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন।

এই জগতে ক্ষ্যাপামির স্থান আছে, কিন্তু নেই নীচতার লোভের স্বার্থের। বিশ্বের নৈতিক নিয়মে মূলাঘাত করলে এখানে ঠাঁই নেই। বিশ্ব-বিধানে টিকবার মতো যা তাই তো বিশ্বে টিকবে। নীচতার স্বার্থের লোভের পরমায়ু নেই, তা সে দারুণ নিষ্ঠুর হয়ে আপনাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন। শঠতা ধূর্ত্ততা কূট-কৌশল (knavery, trickery) কিছুতেই কিছু হবার নয়। বৃহৎ ধর্মের সঙ্গে যা সঙ্গত তা-ই নিত্য কালের মধ্যে থাকে।

যুগে যুগে মানবলোকে কত ব্যাধি এসেচে। তাকে ক্ষ্যাপামি বল্লে ক্ষ্যাপামির অপমান করা হয়। এই ব্যাধি হোলো নীচতা ক্রূরতা ধূর্ত্ততা ও নিষ্ঠুরতা। এইসব জিনিস টিকবে না। কিন্তু কে এদের তাড়াবে? জগতের ছন্দের নিয়মে এদের আপনিই সরে পড়তে হবে। জগৎ তো হাসপাতাল নয় যে এর চিকিৎসার গন্ধে বিশ্ববায়ু বিষিয়ে থাকবে! হাসপাতালে রোগের

* ১১নং কবিতা

উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়, যে দিকটায় দোষ খুঁত ত্রুটি সেই দিকেই বেশি মনোযোগ (strong light) দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা কি সঙ্গত? জগতে হ্যামলেট (Hamlet) ও দুর্যোধন ঢের আছে; কিন্তু যত উজ্জ্বলভাবেই চিত্রিত হোক তবু তারা ভালোর আলোতে তলিয়ে গেছে। তাই এইসব স্থানে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিলে বিশ্ববিধি অনুসারে তা ঠিক হবে না।

তবে একটা মস্ত ভরসার কথা এই যে, যা সুন্দর তা অসহিষ্ণু নয়, কারণ তা ঠুন্‌কো নয়। তা সত্য, তা স্থির, টিকে থাকবার মত শক্তি তার আছে। আমরা যখন আমাদের বীভৎসতা দিয়ে সুন্দরকে আঘাত করি তখনও সৌন্দর্যের ধৈর্য নষ্ট হয় না। তার পরেও দেখি বনে ফুল ফোটে, পাখী গায়, আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের নানা বর্ণের খেলা চলে। এসব কি তবে ব্যর্থ? না, তা নয়। এতেই যে ক্রমে ক্রমে মানবের হৃদয় শুদ্ধ হচ্চে, এতেই যে ক্রমশ বিশ্বসৌন্দর্যের সঙ্গে তার সুর ও ছন্দের মিল হচ্চে। তবে, মানব-ইতিহাসে আমরা শুধু চাঙ্গেজ খাঁ তৈমুরলঙ্গের কথাই মুখস্থ করে আসচি, কিন্তু মানব-ইতিহাসে এইসব সুর মেলাবার সাধনা যে নিরন্তর চলেচে সে-কথা আমাদের মনেই আসে না। রোগের কথাই আমাদের মনে থেকে যায়, স্বাস্থ্যের কথাই যাই ভুলে!

মানব-ইতিহাসে সৌন্দর্য কি কম কাজ করেচে? বিশ্বের সৌন্দর্য দিয়ে ক্রমেই যে মানব-ইতিহাস শুদ্ধ হচ্চে। না হলে বর্বরতার আর যে অবসান হোতো না। আমরা লোভের দ্বারা প্রেমকে আঘাত করি। এই লোভ আমাদের দারুণ নিষ্ঠুর করে তোলে। প্রথম মহাযুদ্ধে* দেখেছি, পাটকলের ঐশ্বর্যে বিদেশী টাকাওয়ালারা যখন দিন দিন ফেঁপে উঠেচে তখন ঘরে ঘরে চাষার দল ছেলেপুলে নিয়ে অর্ধাশনে দিন কাটিয়েচে বা অনশনে প্রাণ দিয়েচে।

লোভ ও স্বার্থ যখন প্রেমকে অপমান করে আঘাত করে, তখন ভগবানের দেওয়া এই প্রেম কেন দারুণ হয়ে উঠতে পারে না? না, দারুণ হবার তার দরকার নেই। সুন্দর হয়েই সুন্দর যে তার দণ্ড দেয়, নিষ্ঠুর না হয়েও প্রেম যে তার দণ্ড দিয়ে যায়। মায়ের স্নেহ ও বিশ্বাস, প্রণয়িনীর প্রণয় ও ধৈর্য কি ব্যর্থ? না। আমরা বুঝি বা না বুঝি, নিরন্তর তাদের কাজ চলচেই। বিধাতা

* ১৯১৪-১৯১৮

যদি জগতে প্রেম না দিয়ে শুধু পুলিস ও আইন-শৃঙ্খলাই দিতেন তবে কি জগতে কোনো সৌন্দর্য বা কোনো মাধুর্য-মহত্ত্বই থাকতো? প্রেম তার স্বধর্ম হতে ভ্রষ্ট না হয়েই তার বিচার করে যাচ্চে।

তবু যদি অন্যায় আমাদের না ধুয়ে মুছে যায় তবে দিনে দিনে সেই পাপ জমতে থাকে। ক্রমেই বিশ্বের সঙ্গে ছন্দের অমিল হতে থাকে। তারপর একদিন সেই পুঞ্জীভূত অন্যায় আপন ভারে আপনি ভেঙে পড়ে। তার আপনার পুঞ্জীভূত পাপের ভারই তাকে রুদ্র হয়ে পিষে মারে। বাইরে থেকে আর কারও আসবার দরকারই হয় না।

একদিন অতিষ্ঠ হয়ে আমরাই বলি, 'হায় হায়, বিধাতার রাজ্যে কি এইসব পাপের বিচার নেই?' আবার যখন সেই আত্মসঞ্চিত পাপের ভার রুদ্ররূপে নেবে আসে তখন আমরাই কেঁদে বলি, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর! চাইনা এমন বিচার।' কিন্তু তখন কে শোনে? আমাদেরই পাপ রুদ্র হয়ে দারুণ দুর্যোগ, ভীষণ প্রলয় রূপে এসে যুগযুগান্তের সঞ্চিত আবর্জনাকে পাপ-বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কত কালের সঞ্চিত চোরাই মাল তখন কোথায় ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়।

যেখানে ছন্দ স্বধর্ম হতে ভ্রষ্ট হয় সেখানে অমিলটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেই রুদ্রের আবির্ভাব ঘটে। ঝড়ের পর যেমন প্রকৃতি আবার শান্ত সুন্দর হয়ে ওঠে, তেমনি বেসুরো অছন্দের পর সুর ও ছন্দ ফিরে আসে। কাজেই ছন্দই ছন্দের বিচার করে। তারপর দেখা যায় ফুল ফুটচে, পাখী গাইচে, প্রেম মৈত্রী আবার জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। বিশ্বছন্দ সুন্দররূপে মিলে গেছে। রুদ্ররূপে যিনি ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত হয়ে সব ভেঙে চুরে সুর মিলিয়ে গেলেন, তিনি তখন কোথায় আবার মিলিয়ে যান।

এই যে এবার দারুণ যুদ্ধের সূচনা, এরও মূলে রয়েচে মানুষের যুগ-যুগ-সঞ্চিত লোভ স্বার্থ নীচতা কপটতা। ধূর্ত্ততা ও নিষ্ঠুরতা কত চাতুরী দিয়ে আত্মগোপন করে জগতের দুর্ব্বল ও অসহায়দের রক্ত শোষণ করছিল। তাতে জগতের সামঞ্জস্য ও ছন্দ নষ্ট হতে-হতে একদিন এমন অবস্থায় এলো যে রুদ্ররূপে আবার তাঁকেই আসতে হোলো। রুদ্রই দারুণ হয়ে জগতের প্রলয়-তাণ্ডবে নাবলেন।)

বলাকার পঞ্চম কবিতাটি মহাযুদ্ধের খবর পাবার পরে লেখা। এইসব কবিতাগুলি কোথা দিয়ে কেমন করে আসে, কি ভাবে তার প্রকাশ হবে, সব

কিছু যেন আমাদের জানার মধ্যে নয়। মনের মধ্যে সুপ্ত চেতনায় যেন তারা আমাদের অজ্ঞাতসারেই রূপ পরিগ্রহ করে। বীজ হতে বৃক্ষ যে কোন্ রূপে কোন্ দিকে কতখানি বিস্তৃত হবে, আগে হতে তার বিবরণ কি দর্শনে-বিজ্ঞানে মেলে? সে রহস্য হোলো জীবনলীলার রহস্য। জীবনের অন্তর্গত গভীর লীলায় তার প্রকাশ-বৈচিত্র্য। তত্ত্ববাদীরা কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে এই রহস্যের সমাধান করতে পারেন না।

পঞ্চম কবিতার পরেই আমার আর একটা পালা চল্লো। কবিতার নির্ঝরিণী যেন পর্বতমালার এক উপত্যকা ছেড়ে অন্য উপত্যকার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চল্লো।

পূজার ছুটি, এলাহাবাদে গেলাম। সেখানে আমার ছয় নম্বরের কবিতাটি (ছবি) লেখা। যুদ্ধের পালা হতে ছুটি পেলাম। এক একটি বিশেষ স্থান ও কাল আশ্রয় করে এক একটি কবিতার গুচ্ছ ফোটে। অন্তরের অসীম আকাশে যেন এক একটি নক্ষত্রের পুঞ্জ নিয়ে এক একটি বিশেষ রাশি বা তারা-মণ্ডল (constellation) রূপ-পরিগ্রহ কোরলো। এটা এলাহাবাদের।

বুদ্ধগয়া হতে সঙ্গীদের বিদায় দিয়ে চারুকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) নিয়ে এলাম এলাহাবাদে। ভাগ্নে সত্যপ্রকাশের জামাতা শ্রীমান্ প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে রয়েচি। এইখানে একটি ছবি দেখে* আমার মন মহাযুদ্ধ ও বিশ্ব-সমস্যার পথ হতে মুক্তি পেয়ে নূতন পথ ধরলো। ছবি কবিতায় আমার নিজের মনের বেদনার প্রকাশ।

আমার অন্তরের সেই বেদনার কথা হয়তো এখানে একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলার দরকার।

প্রিয়জনকে আমরা কিছুতেই হারাতে চাইনে। জীবনে তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ আমাদের অসহ্য। কিন্তু জীবনাবসানে কি করে তাঁদের ধরে রাখ্বি? দেহের রূপখানি না হয় ধরে রাখলাম রেখার বর্ণে রচিত ছবিতে কি পাষাণের মূর্তিতে। কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কি? জগতের সুখ-দুঃখ উত্থান-পতনময় জীবন-গতি হতে বিদায় নিয়ে সে রইলো এক জায়গায় মূর্তিতে বদ্ধ হয়ে, আর আমি জীবনের গতিধারা বেয়ে চলেছি ক্রমাগত এগিয়ে। তবে আর তাকে আমি পেলাম কৈ? এই ছবিতো আমার পক্ষে সত্য নয়। সে অচল, আমি সচল। যোগ থাকে কিসে?

* তাঁরই পরলোকগতা পত্নীর ছবি

তবে কি প্রিয়জনকে মৃত্যুর পরে একেবারে বিদায় দেওয়াই বিশ্বের অলঙ্ঘ্য বিধান? না, তা কখনও নয়। বরং মৃত্যুর পরে আমাদের জীবনের সকল ব্রতে সকল লীলায় পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনকে জীবন্ত করে ধরে রাখাই তো আমাদের চিরন্তন আদর্শ। বলতে চাই, আমার জীবনে, তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ (স্মরণ, ২৭)।

যাঁরা ছবি বা মূর্তির মধ্যে প্রিয়জনকে বেঁধে রাখতে চান তাঁরা ভ্রান্ত, তাঁরা আমাদের ভারতীয় আদর্শ হতে ভ্রষ্ট। এইজন্য আমি মৃতের মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠাকে 'পাথুরে পিণ্ডদান' বলে তীব্রভাবে একদিন আঘাত করেছি। কিন্তু কিছুতেই পশ্চিম দেশ হতে নতুন আমদানি করা এই রোগ ঠেকাতে পারিনি। দিন দিন আমাদের দেশে এই বর্বর-প্রথা প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে চলেছে।

মৃত্যু ও পরলোক সম্বন্ধে ভারতীয় মন খুবই শান্ত গভীর ও উদার। মৃত্যু-ভয়ে ভীত হয়ে জীবনকে বৃথা আঁকড়ে ধরে থাকা বা ধরে রাখা তাঁদের শিক্ষা নয়। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ওষুধ-পত্র-মালিশের গন্ধে ঠাসা হাসপাতালী রকমের ঘর থেকে যেন সকলে আমায় বের করে, মুক্ত আকাশের তলে শান্ত নদীতীরে আমাকে যেন বিদায় দেয়, এইটিই আমি চিরদিন মনে মনে চাই। তবে বৃথা নিষ্ঠুরতা করে টানা হেঁচড়া করে অন্তর্জলী করাটাও আমি পছন্দ করিনে। বিদায় হবে বিদায়েরই মতো শান্ত সুন্দর ও স্নেহাশীর্বাদে ভরপুর। পুণ্য লোভের বা সদ্‌গতি লোভের টানাটানি সেখানে কোনো মতেই শোভা পায় না।

আমাদের দেশে সবাই পঞ্চভূতাত্মক দেহকে মৃত্যুর পরে অগ্নিতে দিয়েছেন। মনে মনে কামনা যেন দেহের পঞ্চভূত বিশ্বের পঞ্চভূতে মিশে যায়।

[illegible]ার প্রাচীন মিশর প্রভৃতি দেশে দেখা গেছে দেহকে নানা উপকরণে ব[illegible]াসে রক্ষা করে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা মানুষ করেছে। মৃত[illegible]ঙ্গে কত জিনিসপত্র দাসদাসী নিষ্ঠুরভাবে মাটিতে পুঁতে ফেলতেও তাদে[illegible] বাধেনি। হয়তো ভারতবর্ষেরও কোনো কোনো স্থান পর্যন্ত সেই সভ্যতা [illegible]স্তৃত ছিল। তাছাড়া তার প্রভাব অন্য নানা দেশে অল্প-বিস্তর পরে দেখা গিয়েছে। মৃতদেহকে সমাহিত করে তার উপর সুন্দর সমাধি রচনার মধ্যেও তার কিছু পরিচয় যেন রয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের আদর্শ কিন্তু এরূপ নয়। এ দেশে মানুষ চেয়েছে শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে পরলোকগতের আদর্শ ও তপস্যাকে বজায় রাখতে। মূর্তি দিয়ে

জীবন্ত আদর্শকে চেপে মারা আমাদের পথ নয়। বৌদ্ধদের সম্প্রদায়ের মধ্যে দেহধাতু রক্ষা বোধ হয় কোনো অনার্য প্রভাবের ফল। বৈদিক পথ এ নয়।

আত্মার অমৃতত্বে বিশ্বাসী ভারতীয় মন এইসব চেষ্টাকে ছেলেখেলা মনে করেই উপেক্ষা করেছে। তাঁরা দেখেছেন, আত্মা অজর অমর অমৃত অভয় ব্রহ্ম।

[আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো
ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ম্ ।*]

কাজেই অজর অমর অভয় আত্মার জন্য ভয় কি? দেহের পঞ্চভূত মরণান্তে বিশ্বের পঞ্চভূতে বিলীন হোক। তাই অগ্নিসংকার-কালে তাঁরা গম্ভীর মন্ত্রে বলেছেন,—এখন শরীর ভস্মসাৎ হোক, দেহবায়ু বিশ্ববায়ুতে বিলীন হয়ে অমৃত হোক, আমার কর্মময় চেতনা আজ কৃত কর্মকে স্মরণ করুক, তার তপস্যাকে স্মরণ করুক।

[বায়ুরনিলমমৃতমথেদং
ভস্মান্তং শরীরম্ ।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর
ক্রতো স্মর কৃতং স্মর । †]

মৃন্ময় মূর্তি বা চিত্রের পূজা এদেশী বস্তু নয়। তা পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্য দেশ হতে আমদানি। আমাদের শিক্ষা একেবারে তার বিপরীত। আমাদের আদর্শ হোলো,—মৃতের আদর্শ ও তপস্যাকে বজায় রাখ তোমার জীবনে। তাঁকে জীবন্ত রাখ। তাঁর আদর্শ ও তপস্যাকে ছবি ও মূর্তির পূজার চাপে পিষে মেরো না।—কিন্তু এই বিলেতী প্রথাই এখন দিন দিন আমাদের মনে চেপে বসচে। আমাদের দেশে বরং বহুকাল ধরে মহাপুরুষদের নামে দেবালয় রচনা করে দেবপ্রতিষ্ঠা দেবসেবা করা হোতো, তাঁদেরই মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা তো চলতো না। সেটা হোলো হালের আমদানি বিলেতী দুর্গতি।

মৃতদেহের ফোটো তোলার মত কুৎসিত বর্বরতা আমি কল্পনাও করতে পারিনে। অথচ দিন দিন এটাই আমাদের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াচ্চে। যাঁরা এই সব প্রতিমূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজার বিষয়ে উৎসাহ দিচ্চেন, তাঁরা একদিন

* বৃহদারণ্যক ৪, ১৪, ২৫
† ঈশ, ১৭

এর ফল টের পাবেন। যে গুরুকে তাঁরা মূর্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চান, একদিন ঐসব মূর্তির চাপেই সেইসব গুরুর অমৃতময় তপস্যা পিষ্ট হয়ে মরবে। এমন করেই আমাদের দেশে আজ তীর্থ ও মহন্তদের এই দুর্গতি। যা আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে তাকেই যদি আমরা নিজেরা মারি, তবে কে আমাদের সেই আত্মঘাত হতে রক্ষা করতে পারে ?

এখন অপ্রাসঙ্গিক হলেও এইখানে বলে রাখি, আমার পিতৃদেব খুব জোরের সঙ্গে জানিয়ে গেছেন যেন মৃত্যুর পরে তাঁর দেহভস্ম কোথাও প্রোথিত না হয়, তাঁর মূর্তি বা প্রতিকৃতি যেন কোথাও প্রতিষ্ঠিত না হয়। আমারও সনির্বন্ধ অনুরোধ রইলো, আমার মৃত্যুর পরে এই দুর্গতি হতে আপনারা আমাকে রক্ষা করবেন। যার বিরুদ্ধে আমি সারা জীবন যুদ্ধ করেছি, আমার জীবনান্তে সেই দুর্গতিই যেন আমার কোনোমতে না ঘটে।*

মনে করবেন না যে ইহলোকের পরে পরলোকের জীবনে আমার বিশ্বাস নেই। শাশ্বত জীবনে আমার গভীর বিশ্বাস। কিন্তু ছবিতে মূর্তিতে পরলোকগত প্রিয়জনকে বাঁচানোর চেষ্টা যে ব্যর্থ দুর্গতি তা না বলে পারবো না। দেহ নশ্বর, কিন্তু মানবের আদর্শ ও তপস্যা অমর। আমাদের জীবন দিয়ে যদি পরলোকগতদের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখি তবেই তাঁদের বাঁচিয়ে রাখা যায়। আর তাহলেই আমাদের চিরপ্রবহমান প্রাণধারায় তাঁদের সঙ্গে আমাদের যথার্থ যোগ থাকে, নইলে ছবিতে ও মূর্তিতে বদ্ধ প্রিয়জনকে পিছনে ফেলে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। সেই কথাই আমার ছবির সমাপ্তিতে বলেছি।

[নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েচ যে ঠাঁই ;
আজ তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েচে তার অন্তরের মিল।

নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।]

* কবিগুরুর মৃত্যুর নয় দশ বৎসর পরে মহামতি বার্ণার্ড শ' মারা গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনিও ঠিক এই অনুরোধটিই করে গেছেন।

সাত নম্বরের কবিতায়* আমি সম্রাটের মনের সেই বেদনাটিই প্রকাশ করতে চেয়েচি যা প্রিয়জনকে কখনো হারাতে চায় না। এই কবিতা কয়টি আমার পশ্চিম প্রদেশের কবিতাগুচ্ছের মধ্যে।

তাজমহল আমার আগেই দেখা ছিল। তাজমহল দেখায় আমার মনে যে ভাব দেখা দিয়েছিল, এতকাল তাকে কোনো রূপ বা প্রকাশ দিই নি। এতদিনে সেই ভাব রূপ গ্রহণ কোরলো। সকল সৃষ্টির মূলেই এই রহস্য। জীবনে বার বার তার প্রমাণ পেয়েছি। যে-সব ভাবকে আমি হয়তো ভুলেই গেছি তারা মনের মধ্যে গোপনে চাপা থেকে নিহিত বীজের মত দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর কাজ করেই চলেছে। তারপর একদিন নব অঙ্কুরে-পল্লবে তার নব আবির্ভাব দেখে আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে গেছি।

আট নম্বরের কবিতার† ব্যাখ্যা শুনলে মনে হতে পারে যেন আমি প্রাণ ও জীবনের তত্ত্ববাদের (abstract of life and spirit) রহস্য বা ঐ রকম আর একটা কিছু বলতে চাই। কিন্তু আসলে সে সব কিছুই নয়।

পৌষ মাস। এলাহাবাদের পৌষ মাস। খুব শীত। পরিষ্কার আকাশ। ছাদে বসে আছি। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু মিলিয়ে গেল। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এলো। তারপর আকাশের অন্ধকার পটে পুঞ্জ পুঞ্জ তারা ফুটে উঠলো। কাছে কেউ ছিল না, চারিদিক নিস্তব্ধ। আমার মন যেন অসীমের অপূর্ব পরশ পেয়ে রসের গভীরতায় একেবারে ডুবে গেল। আকাশব্যাপী অন্ধকারকে মনে হোলো যেন অদৃশ্য সৃষ্টিধারা, যার বেগ অবোধ্য। এই দৃশ্য নক্ষত্রতারার পুঞ্জগুলি মনে হোলো সেই বিরাট্ সৃষ্টিধারার উপরকার ফেনপুঞ্জ।

পদ্মাতে স্রোতের এই লীলাটি দেখে দেখে আমি অসীম অনন্তের এই রহস্য বুঝি। দেখতাম পদ্মার অবোধ্য বারিবেগ ক্রমাগতই চলেচে, তার বেগের একটু আধটু অনুমান করা যাচ্চে তার উপরকার ফেনা দেখে। সেই ফেনাও পদ্মারই বেগে সৃষ্ট। আকাশের এই তারাপুঞ্জের ফেনাগুলিও হয়তো সৃষ্টির বেগেই প্রকাশমান। এদের দিয়েই অদৃশ্য বিরাট্ বিশ্বধারার পরিচয়। জ্যোতির্বিদেরা এই প্রকাশটুকুই অনুভব করেন, কিন্তু বিরাট্ বিশ্বগতিকে কি তাঁরা অনুভব করেন? সেই গতি কি শুধু দৃশ্যমান এই পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রে?

* শাজাহান বা তাজমহল

† হে বিরাট নদী

তা নয়। কখনই নয়। বিশ্বের বিরাট্ গতির পরিচয় আমরা কি জানি? সেই গতি চলেচে সর্ব চরাচর সব অদৃশ্য বিশ্বকে ভরে নিয়ে। তাকে কালই বল বা আর যাইই বল, সর্বচরাচর ভরেই সেই অদৃশ্য গতিবেগ। দৃশ্য জগৎ কতটুকু? সদা-সচল বিরাট্ অদৃশ্য বেগপ্রবাহের উপরে তা শুধু একটুখানি ফেনার মতই ভেসে চলচে। ঐটুকু দৃশ্য ফেনা মাত্র দিয়ে আমরা তার তলায় চলমান অগাধ অদৃশ্য বিশ্বধারার একটু সূচনা পাই মাত্র। চলেচে যে অসীম চরাচর তার সন্ধান আমরা পাইনা, আমরা দেখি তার উপরকার ফেনপুঞ্জের গতিটুকু মাত্র। তার তলায় যে অগাধ অসীম গতি রয়েচে সেটা শুধু ধ্যানযোগে উপলব্ধি করতে হয়।

সেই সন্ধ্যায় আকাশে যে বিরাট্ অন্ধকারকে দেখছিলাম মনে হচ্ছিল, সেই তিমির-রাত্রিই যেন এই অদৃশ্য অতল অপার বিরাট্ বিশ্ব-নদী। জলে একটা ঢেলা ফেললে প্রথম একটি তরঙ্গ-চক্র হয়। সেই তরঙ্গ-চক্র আর একটি বৃহত্তর তরঙ্গ-চক্রকে উৎপন্ন করে, এমনি করে চক্রমালা বেড়েই চলতে থাকে। অকূল অপার জলে তার শেষ দেখবার মত শক্তি আমাদের নেই। এরই নাম সংস্কৃতে বীচি-তরঙ্গমালা। পৃথিবী ঘুরচে সূর্যের চারদিকে, সৌরজগৎ ঘুরচে আর কোন তারাকে ঘিরে, আবার সেই তারামণ্ডল ঘুরচে আর কোনো কিছুর চারদিকে, কোথাও কি তার শেষ আছে? এই ভ্রাম্যমাণ চক্রমালার কোথায় অবসান? সেটাও আমাদের শুধু ধ্যানগম্য সত্য, প্রত্যক্ষ তার নাগাল পায় না।

প্রাণের অসীম জগতেও চলেছে ঘূর্ণায়মান অনন্ত চক্রমালা। কুঁড়ি হতে ফুল, ফুল হতে ফল, ফল হতে বীজ, বীজ হতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হতে বনস্পতি—এক অবোধ্য বিরাট্ ধারা সদাই প্রাণবেগে প্রবহমান। আমার শরীরে আমার সর্বাঙ্গে আমার শিরায় শিরায় অণুপরমাণুতে বিশ্বব্যাপী এই প্রাণতরঙ্গমালা চলেচে। কায়াযোগবাদীরা এই রহস্যের কিছু পরিচয় পেয়েছিলেন, তাই বাউলেরা বলেন,—

যা আছে ভাণ্ডে
তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।*

বিশ্বজগতের মতো প্রাণজগৎও যে অপার অনন্ত, এই কথা দেখচি আমাদের

* আমি বল্লাম, এই কথা আমাদের দেশে নূতন নয়। অথর্ব-বেদ বলেন—আমারই অঙ্গে ভূমি অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও দ্যুলোকাতীত বিশ্ব (১০, ৭, ৩)। আমার নাড়ীতে সমুদ্র তরঙ্গিত—'সমুদ্রো যস্য নাড্যঃ' (ঐ, ১০, ৭, ১৫)। গোরক্ষ বলেন, ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সবই আছে এই

দেশে অতি পুরাতন। বিশ্বের প্রচণ্ড গতির তালেই আমার মধ্যে প্রচণ্ড গতিবেগ নিরন্তর চলচে।

আবার জগতের মধ্যে এই যে বসে আছি, মনে হচ্চে কি শান্ত কি স্থির বসে আছি, অথচ অহরহ অসীম বেগে চলচি। আমার চারদিকে দূরাৎ সুদূর বিরাট্ জগতে যেমন নিরন্তর গতি, আমার ভিতরেও দেহের অণুপরমাণুতে তেমনি নিরন্তর অদৃশ্য গতি। কী বিরাট্ এই বিশ্বসৃষ্টি-প্রবাহ, তাই ভাবি। সূর্য চন্দ্র তারাতে তার উপরকার একটুখানি মাত্র আভাষ দেখা যাচ্চে। অতল ধারার ফেনাতে সূচিত যেন তার একটু ইশারা। আবার আমাদের জনমে মরণে উত্থান পতনে আমাদের ইতিহাসে সেই অতল অপার অদৃশ্য প্রাণধারার উপরকার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় মাত্র পাই। সবই সেই সৃষ্টির উপরকার একটুখানি ফেনা। আমরা তার শান্ত মূর্তিটুকু মাত্র দেখি, কিন্তু বস্তুত সব শূন্য পূর্ণ করে ভেসে চলেচে অন্তহীন প্রাণধারা। সেই অন্তহীন বিকাশ-বিলয় উত্থান-পতনের কতটুকুই বা ফেনা হয়ে আমাদের ধরা দেয়?*

ভ্রাম্যমাণ নিখিল চরাচরের এই অদৃশ্য বিরাট্ প্রবাহকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে পুলকিত হয়ে আমি লিখেছিলাম,—

হে বিরাট্ নদী,
অদৃশ্য নিস্তব্ধ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

দেহে—"ব্রহ্মাণ্ডবর্তী যৎকিঞ্চিৎ তৎ পিণ্ডেঽপ্যস্তি সর্বথা।" রামানন্দ, কবীর, রবিদাস প্রভৃতি সবারই এই একই কথা। দাদূর কায়াবেলী গ্রন্থখানাতে আগাগোড়া এই তত্ত্ব। ধরমদাসজী বলেন, আমি বিরাট্। চন্দ্রে গিয়ে লাগছে আমার আঁচল, সূর্যে লাগচে আমার দেহ—

চন্দ্রলগন মেরে আঁচরা
সূর্যলগন মোর দেহা হো!

বেদ হতেই এই সুর শোনা যাচ্চে—যে মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখেচে সেই সত্যকে যথার্থস্থানে দেখেচে—

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্
তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্। (অথর্ব ১০, ৭, ১৭)

* লিঙ্গপুরাণ বলেন, অসীমের কোলেই সীমা ও রূপের সৃষ্টি (১০৪, ৭০, ৭৬); বিষ্ণুপুরাণও সেই কথাই বলেন।

কাজেই এই কবিতাটি একটি তত্ত্ব মাত্র নয়, এ আমার আনন্দরূপ। তবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়তো এটাই তত্ত্ব হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত পদ্মার প্রবাহের মতো সৃষ্টির অসীম অনন্ত প্রবাহকে প্রত্যক্ষ করে অপূর্ব আনন্দে তাকে প্রকাশ করেছিলাম। এর সত্যরূপ আনন্দরূপ অনুভব করা চাই। নইলে আমার এই কবিতাটির স্বরূপ ঠিক উপলব্ধি হবে না।

আমি বহুকাল ছিলাম নদীর উপরে, তাই এই বিশ্ববেগ সেদিন আমার কাছে কালো রাত্রির পদ্মানদীর মতোই বোধ হলো। সেই অদৃশ্য বিরাট্ বিশ্বনদীর উপরকার ফেনা যেন থেকে থেকে আমার কাছে দীপ্যমান হয়ে উঠছিল, যেন gleam করছিল।

[আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "আপনার এই লেখার মধ্যে কি পাশ্চাত্ত্য মনীষী বের্গসঁর চিন্তার কিছু প্রভাব আছে" ? কবি বলিলেন—]

তা কেমন করে বলবো। বের্গসঁর লেখা আমি পড়েচি এবং তাঁর চিন্তার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাও রয়েচে। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়ও হয়েচে।

গত বছর আগষ্ট মাসে ফরাসী দেশে প্যারী নগরে গিয়েচি। এক ইহুদী ভদ্রলোক, কাহ্‌ন সাহেব (Kahn), আমাদের ফ্রান্সের উত্তরে যুদ্ধক্ষেত্র দেখাতে নিয়ে গেলেন। মানুষের দুর্গতি ও নিষ্ঠুর প্রলয়-লীলা দেখে মন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। আমার মনের ব্যথার কথা কাহ্‌ন সাহেব বুঝলেন। তিনি তাই ভাল আলাপ আলোচনার জন্য বের্গসঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। সেদিন আমাদের মণ্ডলীতে সুধীর রুদ্রও ছিলেন। বের্গসঁ ভালো ইংরাজি বলতে পারেন। যদিও আমাদের সময় ছিল কম, তবু অল্প সময়েই আমাদের আলাপ বেশ জমলো। তিনি আমার লেখায় খুব সায় দিলেন। আমার অনেক সত্যই তাঁর ভালো লেগেছে বল্লেন। তিনি বল্লেন, 'পাশ্চাত্ত্যেরা বড় precise। তবে ভারতীয় মনের মতো অন্তর্দৃষ্টি তাদের নেই। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে বলে পাশ্চাত্ত্যদের বাধ্য হয়ে precise হতেই হয়। ভারত তার ধ্যান-সাধনা দিয়ে জগতের তত্ত্বকে অন্তর্দৃষ্টিতে ধীর ভাবে পেয়েছে।' আমার 'সাধনা' ও 'Personality' সেইজন্যই নাকি তাঁর এত ভালো লেগেছে। এখানেই ভারতীয় সাধনালব্ধ অন্তর্দৃষ্টির মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য। অন্তত বের্গসঁ তাঁর মনের ভাব যে এই রকম তা বললেন। মোটকথা ভারতের অন্তর্দৃষ্টি ও মনীষার প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা আছে তা তিনি জানালেন। তাঁদের মনীষার প্রতিও যে আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে তাও আমি বল্লাম।

য়ুরোপে একদল আছেন যাঁরা ভারতীয় যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে য়ুরোপের কাছে ঋণী প্রমাণ করতে চান। নইলে এদেশে তাঁদের প্রভুতার পক্ষে কিছু অসুবিধা হয়। আবার সেই সুরে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশেও বহুলোক এখানকার সব দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে আগাগোড়া পাশ্চাত্ত্যের কাছে ঋণী বলতে চান। আমার চিন্তার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকবে না এমন কথা কেমন করে বলবো? সর্বযুগের সর্বদেশের তপস্যাকে আমি শ্রদ্ধা করে তাদের আশীর্বাদ জীবনে গ্রহণ করেছি। প্রাণের উপরে প্রাণের প্রভাব পড়বেই, নইলে সে প্রাণ নয়, নির্জীব, সে পাথর। কিন্তু দেখতে হবে, যে-কথাটা বলচি তার কোনো মূল কি ভারতে পূর্বে কোথাও ছিল না? য়ুরোপীয়েরা ভারতের ভক্তিবাদকে একেবারে খ্রীষ্টধর্মের কাছে ঋণী সাব্যস্ত করতে চান। যেহেতু খ্রীষ্টধর্মকে ভারত একসময় ভদ্রতা করে আশ্রয় দিয়েছিল, তাই তাঁদের এই দাবী। হয়তো কিছু প্রভাব ঘটেও থাকবে, কিন্তু ভারতে কি তার পূর্বে কোথাও ভক্তি ছিল না? আর্য-দ্রবিড় কারও মধ্যেই কি ভক্তি কখনও ছিল না? এখানে তাঁরা শুধু কে-আগে কে-পিছে এই হিসাব করেই কে ধনী কে ঋণী এই সত্য নির্ণয় করতে চান। কিন্তু খ্রীষ্টের বহু আগে বুদ্ধ। অথচ খ্রীষ্টধর্মের উপরে বুদ্ধের কোনো প্রভাবই কি তাঁরা মানতে রাজি?

ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হলে যখন পাশ্চাত্ত্য একদল ধর্ম-ব্যবসায়ী বলতে প্রবৃত্ত হলেন, এইসব কথা খ্রীষ্টধর্মেরই প্রভাবে লেখা, তখন আমাদের দেশেরই বহুলোক সেইকথা আরও জোরে প্রতিধ্বনিত করতে প্রবৃত্ত হলেন। ঘরের লোককে পর করতে আমাদের মতো আর কেউ নেই। তার বহু দুর্গতি চিরদিন আমরা ভুগেচি। আজও আমরা সেই দুর্গতি ভুগচি, তবুতো চৈতন্য হয় না। যাক্ তখন আমাকে বাধ্য হয়ে কবীরের অনুবাদ করে দেখাতে হোলো, এই জাতীয় চিন্তা ভারতে ইংরাজ আমলেই আসে নি। এইসব চিন্তা তারও পূর্বে এই দেশে ছিল, কবীরের মধ্যেও ছিল। কবীরেরও পূর্বে ছিল। কতকাল হতে এইসব ভাব চলে আসছে তা বলা শক্ত। হয়তো বেদ-উপনিষদেরও পূর্ব হতে চলে আসছে এই সব চিন্তার ধারা। এইগুলো আমাদের খুঁজে দেখা দরকার।

আমাদের দেশের মতেও পুরুষ বা আত্মা ক্রমাগতই চলচে। হংসের মতোই সে লোক হতে লোকান্তরে যাত্রা করে চলেচে। তার মন্ত্র

'চরৈবেতি'

অর্থাৎ এগিয়ে চলো। আমাদের দেশে লোকে মনীষী সাধক ও গুরুদের কাছে চেয়েছেন, 'গতি দাও, মুক্তি দাও।' মধ্যযুগের সাধকেরাও সবাই গতিরই জয়গান করেছেন। বৌদ্ধাদি দর্শনে বস্তুমাত্রই গতিতে আপন আপন রূপ নিচ্চে ও তার পরক্ষণেই সেই রূপটি হারিয়ে আবার নব নব রূপ নিয়ে চলেচে। সব নাম ও রূপই নৃত্যের ও গতির ক্ষণিক লীলা মাত্র। কোনো বস্তুরই কোনো স্থির-সত্তা নেই। জীবেরও গতির বিশ্রাম নেই, প্রকৃতিরও নেই।

[প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ (কঠ, ৬, ২)।]

প্রাণলীলায় বিশ্বচক্র পরিধির মত ক্রমাগত ঘুরচে। বিশ্রাম আছে তার কেন্দ্রে। সেই বিশ্বকেন্দ্রই পরমাত্মা। তাই পরমসত্যকে চলচে ও চলচে না, দুইই বলা চলে।

[তদেজতি তন্নৈজতি। (ঈশ, ৫)]

অদৃশ্য বলে যা মনে হচ্চে যেন অচল, তাও চিন্তার ও মনের চেয়ে বেশি বেগে ধাবমান।

[অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ (ঈশ, ৪)]

এই সব তত্ত্ববাদতো এই দেশে ছিল। অন্তত আমার প্রাণের মধ্যে যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহই নেই। আমার ছেলেবেলায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হতে আমার কবিতায় গানে নাটকে সর্বত্র এই গতি-ব্যাকুলতা। তবু য়ুরোপের মনীষীদের গতির কথা পড়ে আমি মনে যে প্রভূত সায় ও আনন্দ পেয়েচি তাতে সন্দেহ নেই। আর যদি প্রাণের সহজ ধর্মে তার কিছু প্রভাবও আমার চিন্তার মধ্যে এসে থাকে তাতেই বা কি? মোট কথা, গতিই আমার ও ভারতীয় চিন্তাধারার এক প্রধান কথা। বলাকাতে সেই গতিরই জয়গান করা হয়েচে। এখানে দেশী বিদেশী প্রভাবের বিচারে কোনো লাভ নেই।

দীনতম মানুষ হতে রাজা মহারাজা সম্রাট্ পর্যন্ত সবাই সেই বিশ্বপ্রবাহে যাত্রা করেছেন।

[আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।—(শাজাহান)]

নদী* কবিতাতে আমার উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা বৃহৎ বিশ্বতত্ত্ব

* 'বলাকা'র ৮নং কবিতা

(Cosmic Truth) আমার কাছে এসেছিল। সেটা আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বলে তার আনন্দটা কাব্যরূপ নিয়েচে, আর তার মধ্যে তত্ত্বও আছে বলে আপনাদের কাছে তার ব্যাখ্যা করে বলাও সম্ভব হয়েছে।

লোকের মনে একটা ভুল ধারণা আছে। তাঁরা মনে করেন যে-সব কবিতার মধ্যে কোনো গভীর তত্ত্ব আছে সেগুলিই বুঝি কঠিন। বস্তুত সেইগুলিই সব-চেয়ে সহজ। কঠিন বলে মনে হলেও সেগুলি বুঝিয়ে বলা যায়। সেইসব কবিতার মধ্যে এমন কিছু চিন্ময় অর্থ আছে যা অন্যের মনের কাছেও রয়েচে। কাজেই সেইসব কবিতায় পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেওয়া সম্ভব।

ব্যবসার ক্ষেত্রে যেমন যার কিছু অর্থ আছে তারই credit আছে, অর্থাৎ অন্যের কাছে সে ধার চাইলে অর্থ পায়। কাজেই তার পক্ষে কারবারে লেন-দেন করা সহজ। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে-সব কবিতার মধ্যে কিছু তত্ত্ব বা অর্থ আছে তারা পাঠক ও শ্রোতার কাছে অর্থগত সহায়তা পেতে পারে, তারা পাঠকদের কাছে জ্যোতি-দীপ্তি-রস দাবী করতে পারে। ভিতরে অর্থ থাকার ফলেই তাদের পক্ষে বাইরের আয়োজনের সহায়তাও দাবী করা চলে। একতো তাদের নিজের অর্থ আছে, তার উপরে বাহ্য সহায়তাও তাদের পক্ষে পাওয়া সহজ। এ ভারি সুবিধা।

আবার এমন কবিতাও আছে যা বাইরের সহায়তার আশাই করতে পারে না। যদি বোঝা গেল তো ভাল, নইলে আর কোনো উপায় নেই। রাগ করে না হয় বলা গেল, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্। কিন্তু এতো গালাগালি দিয়ে শুধু মনের ঝাল মিটানো। তাতে বোঝবার কি সুবিধা হবে? আমি Lyric কবিতার (ভাবগীতিকার) কথা বলচি। তার ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব নয়, আর তার প্রয়োজনও নেই। বলাকার দশ নম্বরের কবিতা সেই শ্রেণীর।

যার বাইরের সম্পদ্ আছে তার অর্থের পরিচয় দেওয়া চলে। তার মূল্যগত হিসাবের জমা-খরচ ও মোট অঙ্কটা দেখবার চেষ্টা বুঝি। কিন্তু যার রসানন্দ অন্তরে, তার পরিচয় দেই কিসে? Lyric কবিতায় বাইরের সহায়তার আশা কেমন করে কেউ করবে? সে সহায়তা Lyric কবিতা চাইতেও পারে না। চাইলেও তাতে অত ভার সয়না। তার ভিতরে যে অপরূপ অবর্ণনীয় (ineffable) রস আছে, তা ভাগ্যক্রমে পেলাম তো পেলাম, না

পেলাম তো প্রতিকারের কোনো উপায়ই নেই। পরব্রহ্মের বিষয়ে উপনিষৎ বলেছেন—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে
অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কদাচন ॥*

এই Lyric কবিতাতেই তাই আনন্দ যদি বা মেলে, বাক্য আর মেলে না। এই আনন্দের প্রকাশ বাক্যের নয়। এতো তত্ত্ব বা Thought নয় যে ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু সুবিধা করে নিতে পারি। আনন্দ যদি তার অন্তরে অন্তরে না পাই তবে আর কোনো উপায় নেই। ইঙ্গিতেই তা বুঝানো—ইঙ্গিতেই তা গ্রহণ করা। তার আর কোনো পথ নেই।

এইসব কথা বলেও তো বিপদ ঘুচলো না। আমরা এখন এমনই Materialist (জড়চেতন) হয়েচি যে অর্থ না পেলে কিছুতেই তুষ্ট নই। তার প্রমাণ, আমরা আনন্দের ক্ষেত্রেও অর্থ খুঁজে বেড়াই। এই ক্ষেত্রে মূল কথাও যে আনন্দ, অর্থ নয়, তা বোঝাই কেমন করে ?

যাকে ভালোবাসি তার কাছে অর্থ কি চাইতে পারি ? সেখানে চাই প্রেম। সেখানে যদি অর্থ চেয়ে বসি তবে প্রেমের পাতিত্য ঘটে। তাতে আমাদের অন্তরাত্মার জাত যায়, সে ধর্মভ্রষ্ট হয়। অর্থ চাইতে পারেন উপপত্নী, ধর্মপত্নীর পক্ষে তা অসম্ভব। ধর্মপত্নী কেমন করে উপপত্নীর আসনে নাববেন ?

আমরা প্রেমকে লোভের দ্বারা অপমান করি বলেই ক্রমে ক্রমে আমরা নিষ্ঠুর হয়ে উঠি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ প্রেমের ও মৈত্রীর। সেখানে যখন লোভ এলো, তখন দিনে দিনে মানুষের মনে কী নিষ্ঠুরতাই না জমে উঠলো ! তাতেই আজ ধনবান লুঠচে নির্ধনকে, প্রবল মারচে দুর্বলকে, বুদ্ধিমান ঠকাচ্চে সরলকে, সংঘবদ্ধেরা দলন করচে অসংহত নিঃসহায়কে। এই দোষেই জগতে দ্বেষ-বিদ্বেষ দুঃখ-দ্বন্দ্ব যুদ্ধ-বিগ্রহ ক্রমেই প্রবলতর ও নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠচে। লোভই সব বিপদের মূলে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও লোভ এসে জুড়ে বসলে আনন্দের ফুল নিংড়ে নিংড়ে সেই নিষ্পেষিত ফুলের ভিতর থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা চলবে।

নদী কবিতায় আমার মনের উপলব্ধি ও আনন্দকে প্রকাশ করেচি অথবা

---

* তৈত্তি, উ, ২, ৪, ১

প্রকাশের চেষ্টা করেছি। কিন্তু অনেক সময় প্রকাশ করার সুযোগও ঘটেনি। একবারকার কথা বলি। লোহিত সাগর (Red Sea) দিয়ে যাচ্ছিলাম। অপরূপ সূর্যাস্ত হোলো। মনে হোলো এমন অপরূপ রমণীয়তাকে তো ধরা গেল না। এই চঞ্চলাকে যে ধরতে পারলাম না সেই বেদনা ক্রমাগত মনকে ব্যথা দিতে লাগলো। পরবর্তী কোনো কোনো গানে সেই ব্যথার রেশ বেজেছে।

[সে কোন্ বনের হরিণ
'রইলো' আমার মনে··· *]

তাকে বাঁধা তো গেল না। এই না-ধরা-দেওয়া বনের হরিণকে বাঁধতে গিয়ে রামচন্দ্র কম দুঃখ পান নি। ঘরের লক্ষ্মী হারিয়ে বনে বনে তিনি কেঁদে বেড়িয়েচেন।

এই সব অধরাকে ধরতে গিয়ে হতভাগা কবিদেরও কম দুর্দশা পেতে হয় না। আমার মনের কথা মনেই রইলো।. Subjectiveকে Objective করা গেল না। বিধাতার মনে যে একদিন অন্তরের ভাবকে প্রকাশ করবার ব্যাকুলতা ছিল, তা-ই বিশ্বব্যাপী বাষ্পলোকরূপে নীহারিকারূপে সব আচ্ছন্ন করেছিল। ক্রমে যখন তা পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতির্ময় নক্ষত্রে প্রকাশ পেলো তখন যেন তিনি সোয়াস্তি পেলেন। অন্ততঃ আমাদের মনে এই রকমই হয়। এই লোহিত সাগরে অস্তগামী সূর্যের আলোকে বর্ণের যে মহোৎসব দেখলাম তা আমার মনেই রয়ে গেল। নক্ষত্রের মতো তা দীপ্যমান হয়ে উঠলো না। মনের মধ্যে চাপা দেওয়া স্বপ্নের মতো তা আমারই রইলো। বেদনায় মন বড় অশান্ত হয়ে উঠলো।

ক্রমে মন শান্ত হয়ে এলো। মনে হোলো যা মনে করচি ঠিক তা নয়। এই সবই তো সৃষ্টির উদ্যমের মধ্য দিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেচে। সেই সৃষ্টির আনন্দধারার মধ্যেই রয়ে যাচ্চে। কেজো লোকেরা বলবেন, 'কই, তার সবটা কাজে লাগলো কৈ ?' আমি বলি, গঙ্গা যে বয়ে চলে, কী বিপুল তার জলরাশি! তার সবটা কি জীবজন্তু বা গাছপালায় পান করে নিঃশেষ করতে পারে ? সব অভাব মিটিয়েও যে বিপুল জলরাশি শুধু বয়েই চলে যায়, সে কি শুধু বৃথাই বয়ে যাওয়া ? ঐ যে ধারার গতি, সংগীত, বিপুল বেগ, তার কি কোনো অর্থই নেই ? ঐটে বন্ধ হলেই নিরানন্দ গতিহীন দেশ রোগে অস্বাস্থ্যে মুমূর্ষু হয়ে উঠবে।

---

* গীতপঞ্চাশিকা

আজকের সন্ধ্যার এই অবর্ণনীয় সৌন্দর্য-কমলটি সৃষ্টির মধ্যে ধীরে ধীরে বিকসিত হয়ে চলেছে। \ অতএব এ রইল, যদিও আমি একে প্রকাশ করতে পারলাম না। আমার মনের এই আনন্দ যে চিরদিন ধরে বিশ্বের নানা গানে নানা সৌন্দর্যে ক্রমাগত বিকসিত হতে থাকবে, সে খবর কি আমি কখনো পাব ? সে কথা কি কখনো জানব ?

যদিও আমি জানলাম না, তবু আমি আমার এই আনন্দের দ্বারাই সেই সৃষ্টিতে কিছু দিলাম। প্রত্যেকের চিত্তের সুখদুঃখবেদনার অনুভবগুলি এই হিসাবে শাশ্বত বা অব্যর্থ; তার মৃত্যু নেই। কবে কোথায় কি ভাবে তার প্রকাশ যে হবে, তা কে জানে ? একটি মনের আনন্দ অপর আর একটি মনে নিঃশব্দে সঞ্চারিত হতে হতে ক্রমাগতই চলেছে। একদিন না একদিন তা কোনো ভাবে প্রকাশ পাবেই, কখনই তা ব্যর্থ হবে না।

তবে দেখা যাচ্ছে যা আমি কবিত্বরূপে প্রকাশ করচি তাই শুধু সত্য নয়। কবিত্বরূপে যা প্রকাশ করতে পারলাম তাও একান্তভাবে আমার নয়। কতকাল ধরে চিত্ত হতে চিত্তে নিঃশব্দে চলতে চলতে আমার এই রচনায় আজ তা ধরা পড়ল। কাজেই তাও শাশ্বত।

সমস্ত প্রকৃতিতে ও সব মনের মধ্যে যে আনন্দ ও উদ্যম তা-ই কবি বা গুণীর কাছে ধরা পড়ে। এই ধারাটি কত যুগের কত চিত্তের কত ব্যক্তির সুখ-দুঃখ-ভোগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে ফুল হয়ে বা সৃষ্টিরূপে বিকসিত হয়ে ফুটে ওঠে। আজকের আমার এই অনুভবও হয়তো কোনোদিন কোনো কবির চিত্তে আনন্দরূপে প্রকাশ পাবে। আজ আমি জীবনে যা আনন্দরূপে উপভোগ করচি সেই ধাক্কাটাই ভাবীকালে ধ্যানে কর্মে কারও হাসিতে বা আনন্দে সার্থক হবে; হয়তো কারও বাণীতে বীণাতে বা তুলিতে তা-ই মূর্তিমান হয়ে উঠবে।

প্রকৃতির মধ্যে ফুলের ধারাটি যদি মৃত্যুহীন হয় তবে মানবচিত্ত দিয়ে প্রবহমান এই আনন্দধারাই বা শাশ্বত নয় কেন ? আজকের এই আনন্দ একদিন না একদিন, যে-কোনো রূপেই হোক না কেন, প্রকাশ পাবেই।

আমার নিজের জীবনের বিকাস ও পরিপূর্ণতা এই সব নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেচে। এটা পরম সত্য। আমার এই পরিপূর্ণতা (perfection) আমার একলারই সাধনা নয়। সারা বিশ্ব-চরাচর তার দিকে চেয়ে আছে। সমস্ত বিশ্বের প্রতীক্ষা রয়েছে বলেই আমি চলেছি। তবে

তার মধ্যে এই ইচ্ছাটুকুই আমার নিজস্ব। আমার সঙ্গে বিশ্বের একটি নিগূঢ় যোগ আছে বলেই বিশ্বের শক্তিও আমার মধ্যে কাজ করছে—একই মর্ম-কেন্দ্রের আকর্ষণে যে সবাই বিধৃত হয়ে রয়েছে। আমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত হলে এমনটি হত না। তখন আমার মধ্যে বিশ্বের কোনো শক্তিই পৌঁছত না বা কাজ করত না। তা হলে আমার ইচ্ছা ও গতি অল্পেই ক্ষীণ হয়ে আসত, বেগ অচিরেই পরাভূত হত।

আমার চলার মধ্যেও বিশ্বগতির সার্থকতা রয়েছে। আমি একক নই। আমার সঙ্গী দোসর আছে। তাই সাথে সাথে চলাতেই আমার চলার আনন্দ। আবার আমার গতি ও বিকাসের আনন্দেই প্রকৃতি-পুষ্প-পল্লব, চন্দ্র-সূর্য-তারা উজ্জ্বল ও পরিপূর্ণ। আমার বিকাসের সঙ্গে যোগেই বিশ্ব এত সুন্দর, এত মনোরম। আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিরাট্ ইচ্ছার যোগ রয়েছে বলেই আমার প্রত্যেক পদক্ষেপে এত আনন্দ।

সেই আনন্দকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করবার জন্যই আমার হৃদয়-বাতায়ন খুলে দিতে হয়। যেন দেখতে পাই ও বলতে পারি 'তোমার চিত্ত আমার চিত্তকে ঘিরে কি অপরূপ ভাবে কাজ করছে। চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখি, তোমার ইচ্ছা ও আনন্দই আমার ইচ্ছাকেও এগিয়ে নিয়ে চলেছে।' শিব-শক্তির এই ছন্দোময়ী যোগযাত্রা হৃদয়েরই অনুভূতি। এসব কথা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা কঠিন।

আমার গানকে আমার আপন সুরে আমি গাইলাম। তারপরে আমি আমাকে তাঁর যোগে-যুক্ত রূপে দেখলাম। দেখি তাঁর বিশ্বে আমার চিত্ত মেলে দিয়েছি। তখন আমার সুরে তাঁর বিশ্বসুর ঝংকৃত হয়ে উঠল। কেন? কেনইবা সেই বিশ্বসুর এত মনোহর লাগে? আমার গানকেই দেখলাম যে তাঁর সুরে ধ্বনিত হচ্চে। তা নইলে আমার আনন্দ কেন? তাই, বিশ্বগুণীর সুরেও আমারই গান আজ চুপ করে শুনচি, দেখচি।

'এইক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে'* কথাগুলি লিখবার সময় কি ভেবে লিখেছি আর এখন তা পড়ে কি বুঝচি তার মধ্যে ঢের তফাৎ দেখতে পাই। বিশ্বের সঙ্গে আমার যোগ যখনই উপলব্ধি করি তখনই বুঝতে পারি আমার 'প্রত্যক্ষ'টা বিচ্ছিন্ন (isolated) নয়। অতীতকে সে

* 'বলাকা'র ৪০ নং কবিতা।

যায় দিয়ে আসে না। বর্তমান দিয়েই তার সব প্রাপ্তি নয়। আবার বর্তমানেরও সবটা সে এখন পায় না। বর্তমানেরও অনেকখানি প্রবাহরূপে ধারা বেয়ে বেয়ে রস-মূর্তিতে ধরা দেবে। সেই রসটিই অনাদি কালের অনন্ত স্পর্শের পরম-উপহার (contribution)। এটা তত্ত্বমাত্র নয়। এই রসরূপ ভাবটি একেবারে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি (feeling)। এইজন্য রস মাত্রই তার আশ্রয়-স্বরূপ ব্যক্তিটিকে ছাড়িয়ে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি উপলক্ষ্য মাত্র। এমন কত ব্যক্তির মধ্য দিয়ে বিকসিত হতে হতে এখানে এসে সে পৌঁছেচে, তার বিকাস পরিপূর্ণ হয়েছে।

(এখানে ৪০ নম্বরের কবিতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

তবেই বোঝা যাচ্ছে রসানুভূতির মধ্যে গতির এতখানি মহত্ত্ব কেন? 'বলাকা'তে 'নদী' কবিতায় তার কতকটা বলা হয়েছে। এই 'বলাকা'য়ই আর একবার আমি গতির রহস্য কিছু বলেছি। সে আমার 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'* কবিতায়।

কাশ্মীরে ছিলাম ঝিলমের উপরে। পদ্মায় থাকতে যেমন মনোভাব হত সেই মতো আবার একটা ভাব মনকে ভরপুর করে রয়েছে।

চারিদিকে সব স্তব্ধ। হঠাৎ আমার মাথার উপর দিয়ে একদল বলাকা চলে গেল। চারিদিকের মৌন স্তব্ধতা ভঙ্গ করল বলেই যে বলাকা আমার মনকে টানল তা নয়। বলাকার মধ্যে একটি মর্মকথা (idea) আছে যার জন্য এই 'বলাকা' লেখা। নদীর চরে পাখী বাসা নিল, ডিম পাড়ল, সব ঠিক করে বসল। তখন আবার কোথা হতে তার কিসের আবেগ এল যে এক অজ্ঞাত বাসার দিকে সে উড়ে চলল। সর্বত্রই তো এই চলবার লীলা। নদী-গিরি-অরণ্য জীব চরাচর সবাই চলেছে। পৃথিবী সূর্য সৌর-জগৎ নীহারিকা সবাই মিলে বলাকার মতো কোন্ অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে উড়ে চলেছে। কেনই বা চলবার এমন ব্যাকুলতা—

হেথা নয় হেথা নয়
অন্য কোথা অন্য কোনখানে।

এই যে সার বেঁধে চলা এই তো বিশ্বসংগীতের স্বর-পংক্তি।

'হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল' কবিতায় তার এক রূপ, এখানে

* 'বলাকা'র ৩৬ নং কবিতা।

অন্য রূপ। সত্য একই, একই বিরাট্‌ বিশ্বসংগীতের কথা, ভিন্ন ভাবে বলা মাত্র।

যাকে আমরা গতি-হীন স্থিরতা ও স্তব্ধতা বলি তাকেও ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে তার মধ্যে গতি ধরা পড়বে। উপনিষদের বাণীতেও বুঝি চলা ও না-চলা দুইই একই সত্যের দুই রকম প্রকাশ। দূর থেকে দেখলে যা স্থির মনে হয়, সামনে গিয়ে দেখলে দেখা যায় তাই সচল।

এই কথাই ঈশ-উপনিষৎ বল্লেন—

তদেজতি তন্নৈজতি
তদ্‌দূরে তদ্‌ উ অন্তিকে।

আমি আমার Personalityতে বলেছি—স্তব্ধতা আর কিছুই নয়, শুধু সুরকে অতিশয় ঠায় করে শোনা, যেমন সা.........। তবে তার আদ্যন্ত জলদ করে গাইলে তাই খুব ঠাসা সচল সুরে বেজে ওঠে। বৃক্ষের বৃদ্ধি তো খুব ধীরে ধীরে কিন্তু সেখানেও যদি 'পল'কে 'বৎসর' করে বিস্তৃত করে দিতে পারি তবে সে গাড়ীর মত হু হু করে চলে। গাছের বৃদ্ধির ছন্দটা খুব দীর্ঘ বলে তার গতি টের পাই নে।

দিনের আলোয় চারদিকের সব কাছের জিনিসের সচলতা দেখতে পাই। রাত্রিতে দেখি সুদূরের গ্রহ-চন্দ্র-তারা। তাদের গতির ছন্দটা দীর্ঘ। রাত্রিতে যখন সবই মনে হয় স্থির তখন পাখীর পাখার শব্দ বেগের খবর দিয়ে গেল।

আমিই চিরদিনই নিজেকে নদীর চরের হাঁসের মত দেশান্তরের পাখী মনে করেছি। হংসের মতো আমিও যেন এসেছি কোন্‌ মানস-লোক হতে। যেদিনই অজানার ডাক আসবে, সেদিনই আবার উড়ে চলে যেতে হবে। এইজন্যই দীর্ঘদিন আমি কোনো কিছুতে বাঁধা পড়তে পারিনি। আমার জীবনে নিত্য নূতনের ডাক আছে। মুকুলকে বিদীর্ণ করে ফুল আসে, ফুলকে অতিক্রম করে আসে ফল, ফলকে ছাড়িয়ে বীজ, বীজের বাঁধন ভেঙে বের হয় অংকুর।

আমার জীবনও এক একটি বাসা বেঁধে তাতে বেশি দিন বাস করতে পারেনি। ভেঙে চুরে আবার তাকে বের হতে হয়েছে। এখানে বাউলের গান মনে পড়ে—

'পথ ছেড়ে দে পথ ছেড়ে দে।'

গান গেয়েছি—

ঘরের ঠিকানা হোলো না গো,
মন করে তবু যাই যাই…†

সে ঠিকানা কি ভগবানের মধ্যে? কিন্তু তিনি আমায় ফিরিয়ে দিয়ে বলেছেন 'সে ঠিকানা মানুষেরই মধ্যে'।

তাঁকে খুঁজতে গিয়ে বার বার এই জবাব পেয়েছি 'আমাকে পাবে মানুষের মধ্যে'। সেখানে আমি কবি হয়ে মানুষের সুখে দুঃখে ভাবে চিন্তায় তাঁরই সাড়া পেয়েছি। আবার তাঁর অসীম অনন্ত অপার স্বরূপও আমাকে কম ব্যাকুল করেনি। কাজেই আমি যেমন শাশ্বত শান্তির আনন্দ জানি তেমনি প্রকৃতি ও মানবের গতিতেও আমার কম উৎসাহ নেই।

প্রকৃতির জগতে দেখি গাছপালা অরণ্য সবই যেন ক্রমাগতই চলেছে। মানব-জগতেও দেখি সব চিন্তা সব কর্ম ক্রমেই বিকসিত হতে হতে কোথায় যেন যাত্রা করেছে। সমাজের-নগরের-রাষ্ট্রের জীবনে মানবের চিন্তা ও কর্ম ক্রমাগতই এগিয়ে চলেছে। নিখিল-মানবের চিন্তা বাণী ও সাধনা দলে দলে যাত্রা করে ক্রমাগতই চলেছে, আমাদের চিন্তা বাণী ও সাধনাও তার সঙ্গে গিয়ে যোগ দিচ্চে। আমাদের চিন্তাও আজকের নয়, এর পেছনেও কত জনের কত যুগের কত চিন্তার নিরন্তর ধারা আছে। একে heredity বা সামাজিক সম্পদ্ বলা একই কথা। আমাদের অন্তরে বেদনায় যে-আঘাত আসে তাতে সেই নিখিল-মানবের চিন্তা-ধারাকেই ঝংকৃত করে তোলে। আমাদের বাণীতে সেই ধারা বেজে ওঠে।

আবার সেই ধারা আমাদের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে আমরা মূক হয়েই থাকতাম। ভাষা সাহিত্য কলা রাষ্ট্র সংস্কৃতি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমাগত আমাদের যা দিয়ে সেই নিখিল-চিন্তার ধারাকেই আমরা ধ্বনিত করে তুলছি। নির্জন গুহাতে থাকলে আমরা বোবাই হতাম। মন্দিরে যে আজ * বলছিলাম, 'হাজার হাজার বছরের পুরাতন আলো কোন্ সুদূর নক্ষত্রলোক হতে আজ এখানে এসে পৌছল। কত যুগ ধরে উড়তে উড়তে মানবীয় কত অব্যক্ত মহাভাব এসে আজ আমাদের হৃদয়ে একটু ঠাঁই চাইছে। বাণীরূপে একটু প্রকাশ চাইছে।'

† নৈবেদ্য।   * বুধবার, ২৭ পৌষ, ১৩২৮ ; ১১-১-১৯১২।

অস্ফুট চিন্তারও সার্থকতা আছে। তারাও ক্রমাগত সংহত ঘনীভূত (collective) স্রোতে মানবচিন্তাকে ধাক্কা দিতে দিতে চলেছে। নগণ্যেরা (insignificant) না থাকলে এই চিন্তার স্রোতটা বজায় থাকত না। প্রতিজনে চিন্তা করতে না পারলে বহুজনের অব্যক্ত ভাবধারার সহায়তা না পেলে কোনো মহাচিন্তাশীলেরই উদ্ভব হতে পারত না। সবাই না জেনেও চুপ করে অজ্ঞাতসারে ব্যূহবদ্ধভাবে (collectively) মানবীয় চিন্তার এই গতি ও সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করচে। এক এক জন মহামনীষীর কণ্ঠে তা বাণী হয়ে প্রকাশ পায়। সেই হিসেবে নগণ্য হলেও প্রত্যেকটি মানবের মূল্য আছে। তাদের সঞ্চিত সংহত (collective) সাধনাই মহামনীষীদের সাধনাতে দীপ্যমান।

প্রকৃতির জগতে প্রাণের গতিবেগটি অপূর্বভাবে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। প্রাণের সেই প্রচণ্ড বেগকে সেবার প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সেবার পৌষ-উৎসবের পর (২৯ পৌষ, ১৩২১) শান্তিনিকেতন হতে মাঘোৎসবের জন্য কলকাতা যাচ্চি। শীতের মধ্যে একটু বসন্তের হাওয়ার আমেজ পেয়ে রেলের দুই ধারে ফুলের দল যেন কোন্ এক প্রাণলীলার নিগূঢ় তাড়ায় একেবারে হুড়মুড় করে ভিড় করে বের হয়ে আসছিল। ইংরেজীতে একে hurriedly rushing বলা চলে। এই সব ফুলের দল দলে দলে যেন কোথায় পা ফেলে (march করে) এগিয়ে চলেছে। এমনটি বহুদিন দেখি নি। অকাল-বসন্তের কোন্ ব্যাকুল ডাক এদের মর্মে এসে প্রবেশ করেছে? এই রসটি গানেই প্রকাশ হতে পারত। কিন্তু গান জিনিসটা বড়ই খামখেয়ালী, অথচ গান জিনিসটা একেবারে আত্মনিষ্ঠ (exclusive) বস্তু। তাই সেদিনকার আনন্দ আর গানের সুরে ধরা দিল না। সুরের অনুরণনে সেদিন তাকে আর পাওয়াই গেল না। মনের এই আনন্দটা মনের মধ্যে তখনকার মত চাপা রইল। আট নয় দিন পরে তাই কবিতার* আকারে মূর্তিমান্ হয়ে দেখা দিল।

এই যে প্রাণের আহ্বান, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই যৌবনের বেগে। বিশ্ব-চরাচরের প্রাণযাত্রার সঙ্গে যৌবনের যোগ। বিশ্বযোগের মর্মকথা হল 'যৌবনই সত্য, জরা সত্য নয়'। জরাকে জীবনের যথার্থ স্বরূপ (positive aspect) বলা চলে না। সে গৌরবের দাবি যৌবনেরই, যদিও তার উপরে

* 'বলাকা'র ২১ নং কবিতা।

মাঝে মাঝে জরা-মৃত্যুর আবরণ এসে পড়ে। পরিপূর্ণতাই যৌবন। যদি কারও তরুণ বয়সেও এই পরিপূর্ণতার অভাব দেখি, ভরসার অভাব দেখি, তবে সেখানে যৌবনের বদলে জরাকেই দেখছি বলতে হবে।

জগতে মৃত্যু আছে, জরা আছে। কিন্তু সেইসব অভাব ও জীর্ণতা ছাপিয়ে ওঠে অন্তরের পূর্ণতা। জীবনেও তা উপলব্ধি করি। আমার নিজের জীবনে তো দেখচি জরা আসচে, পাতা ঝরার সময় উপস্থিত, তখনও দেখি কোথা হতে যেন প্রাণের প্রচণ্ড বেগ আসচে, সামনে এগিয়ে চলবার নির্দেশ (message) আসচে। সে সংবাদ সে নির্দেশ তো জরার নয়। সে বাণীতে ক্ষয় নেই, সে বাণী পূর্ণতার। এই বাণী কার? এ যেন আমারই যৌবন আমারই কাছে ফিরে এসেচে, তার দাবি জানাচ্চে। বিদায় নিয়েও দেখি সে আমাকে ছেড়ে চলে যায় নি। বারবার সে যায়-আর-আসে। নিরন্তরই সে যাতায়াত করে।

প্রত্যেক বসন্তে প্রকৃতির রাজ্যে যেমন যৌবনের ডাক আসে, তেমনি মানব-ইতিহাসের মানস-সমুদ্রেও সেই ডাক আসে, ব্যক্তিগত জীবনেও আসে। সেই ডাক দিন-ক্ষণ মানে না, পঞ্জিকা মানে না। সে-ই যেন ধ্রুব সত্য। যাকে আমরা প্রকৃত সত্য (reality) বলি এই ধ্রুব সত্যের কাছে তা ছায়া মাত্র।

যে-দিন 'পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে' কবিতাটি* লিখি সে-দিন পৌষমাস। হঠাৎ সেদিন দেখি দক্ষিণ হাওয়া চলেছে, মনকে জাগিয়ে তুলেছে। আমারও জীবনের তখন পৌষমাস, পাতা ঝরার সময়। কিন্তু সেই ডাক তো তখন সে-সব বাধা মানল না। সেই দিনের কি বাণী? সে বাণী বল্লে, 'চেয়ে দেখ, তোমার অনন্ত যৌবন। সে জরা মৃত্যু মানে না, সেই তোমার বিগত যৌবনই আবার আজ তোমার দুয়ারে উপস্থিত। বারবার জীবনে এরই দেখা পাবে। সে দিনক্ষণ অনুকূল প্রতিকূল কিছুই মানে না। সেই-ই প্রকৃত সত্য (reality)। তাকে অস্বীকার করার জো নেই।'

'ফাল্গুনী'তেও এই কথা। জরা ও শীত তার বাইরের আবরণ মাত্র। বসন্তই যথার্থ সত্য। নিখিল-চরাচরে প্রাণরূপে যৌবনরূপে সেই তো সদাই এগিয়ে চলেছে। 'বলাকা'তে সেই চঞ্চলেরই কথা। এই যৌবন কোথায় নিয়ে চলেছে? সে স্থির নীড় ছেড়ে কোন্ নিরুদ্দেশের দিকে করেছে যাত্রা? 'ফাল্গুনী'তে সর্ববাধাজয়ী জীবনের উদ্দাম চাঞ্চল্যের কথা। কৃত্রিম সব নিয়মগড়া

* 'বলাকা'র ১৩ নং কবিতা।

মিথ্যার প্রাচীরকে জীবনের বেগে ভেঙে চুরে এই যৌবন এগিয়ে চলে। জরা মৃত্যু বসে বসে যেসব আবর্জনার বাধা স্তূপাকার করে তোলে সেই কৃত্রিম প্রাচীরকে না ভাঙলে জীবন চলবে কেমন করে?*

বন্ধন সত্য নয়, যদিও বাইরে থেকে দেখতে তা সত্যেরই মতো। এ হল তার ছদ্মবেশ। তাকে ছিন্ন করে উড়িয়ে দিয়ে তার অনিত্যতাই প্রমাণ করতে হয়। জীবনের মৃত্যু নেই, মৃত্যুই মরে। জীবনের বেগ মন্দ হয়ে এলেই জরা-মৃত্যুর পুঞ্জীভূত প্রাচীর খাড়া হয়ে উঠে লক্ষ্যকে আড়াল করে নতুন জীবন ও সাধনার প্রতিকূল হয়ে ওঠে। শাস্ত্র এসে চিদ্‌বস্তুকে বাধা দেয়, রীতি এসে ঋতকে তাড়ায়। Institution এসে ideaকে শৃঙ্খলিত করে চেপে মারে। তখন মনে হয় institutionটাই পাকা, ideaটা কিছুই নয়। তাই যৌবন সেই সব মিথ্যা জরার বাধাকে ভেঙে ধূলিসাৎ করে এগিয়ে চলে যায়। এই তো গেল চিরপ্রবহমান জীবন-স্রোতে ভেসে চলা। এটাই 'বলাকা'র ভিতরের কথা। 'বলাকা'র সর্বত্রই সেই একই কথা। তবে অন্য ভাবও কখনও কখনও এসে পড়েছে, যেমন পৌষ মাসেও মাঝে মাঝে বসন্তের হাওয়া এসে নাড়া দিয়ে যায়।

এইরকম একটা ভাব 'চৈতালি'র যুগে আমার মনে বারবার আঘাত করেছে। 'গীতালি'র শেষের দিকে অনেক গানে এর আভাস আছে। আসলে এই ভাবটা আমার জীবনের আগাগোড়াই চলেছে, তবে কখনও তা খুব প্রবল ভাবে কখনও শান্ত গতিতে। মৃত্যু কখনও জীবনকে পরাস্ত ও ব্যর্থ করে না, মৃত্যুই বরং জীবনকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করে।

আসল কথা জীবন ও মৃত্যু পরস্পর-বিরোধী নয়। একটি আর একটিকে পূর্ণ করে।

[যথাহশ্চ রাত্রী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ]

দিন ও রাত্রি উভয়েই উভয়কে পূর্ণ করে চলেছে, কেউ তো কাকেও ধ্বংস করচে না। জীবন-মৃত্যুর দোলাতেই গতির ঐশ্বর্য দীপ্যমান হয়ে ওঠে। তাল বিনা সুর যেমন অর্থহীন, আবার সুর বিনাও তাল তেমনি নিরর্থক। চলবার সময় আমরা একপায়ে চলি অন্য পায়ে দাঁড়াই। উভয়ে মিলেই গতি।

[যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা।]

* এইখানে ১৬ নম্বর কবিতার ('বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি') ব্যাখ্যা ও আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুও জীবনকে তাই বলতে পারে,

আমি মৃত্যু তোর মাতা
নাহি মোরে ভয়।

আমি তোরে করে দিই
প্রত্যহ নবীন।

এই কথাই অবসানভয়ভীত দিনকে মাতৃরূপা রাত্রি সর্বক্ষণ বলে।

কাজেই মৃত্যু যখন জীবনের পথ রোধ করে দাঁড়ায় তখনি সে মিথ্যা হয়ে যায়। যখন সে জীবনকে পরিপূর্ণ করে এগিয়ে দেয় তখন তো সে মিথ্যা নয়। কিন্তু সেই মৃত্যু জরা নয় জীর্ণতা নয়। পৃথিবীতে মৃত্যু ভয়ংকর নয়, ভয়ংকর হল জীর্ণতা। এই জীর্ণতাতেই জীবনের সব ঐশ্বর্য ও প্রাণশক্তি চাপা পড়ে যায়। জরার ভার দুর্বহ, মৃত্যু তো সব ভার শেষ করে জীবনকে লঘু করে এগিয়েই নিয়ে যায়।

এইসব কথাকে 'দর্শন' (Philosophy) বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। বিশ্বের মর্মগত যেসব সত্য জগতের নিয়মের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে যোগযুক্ত তাকে দর্শন বলে গাল দিয়ে অস্বীকার করলে বা উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? সত্য হতে হলে জীবনকে নিয়ে জীবনেরই ভিত্তির উপরেই দর্শনকে গড়ে উঠতে হবে। জীবন হতে বিচ্ছিন্ন (detached) চিরন্তন সমস্ত সংস্কৃতি হতে বিযুক্ত দর্শন তো মিথ্যা, তা কিছুই নয়। আলগ-লতার মত প্রাকৃত সত্যের মাটির সঙ্গে যে দর্শনের মূলগত কোনো যোগ নেই, সে দর্শন ঝুটা। তার কোনো অর্থই নেই।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেরই আপন আপন দর্শন আছে। এমন কি যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়ী (materialist), তারও 'দর্শন' আছে। নইলে সে তার মতামত যুক্তি দিয়ে অন্যকে বোঝাতে যাবে কেন? তার 'অন্ন-ব্রহ্ম' মতবাদ যদি তার নিজস্ব Philosophyর উপর প্রতিষ্ঠিত ও সংযুক্ত হয় তবে তাও আর উপেক্ষণীয় নয়। বিশ্ববিধানের সঙ্গে যুক্ত হলে যে-কোনো মতবাদেরই সংকীর্ণতা দোষ কেটে যায়। তখন সে ক্রমশঃ পবিত্র ও শুচি হয়ে ওঠে।

যে জলধারা সাগরের সঙ্গে যুক্ত তা-ই তো সদা-পবিত্র নদী। সাগরে না গিয়ে যদি সে আপনাতে আপনি বদ্ধ হয় তবে ক্রমে সেই জল পঙ্কিল বিল হয়ে অশুচি হয়ে ওঠে। তাই আমাদের দেশে সব শাস্ত্র ও পুরাণই চেষ্টা করেছেন

এই কথা দেখাতে যে বিশ্বসৃষ্টি ও চরাচরের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে।* আচার-বিচারকেও শুচিতা ও কল্যাণ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শাস্ত্রকারগণ তাদেরও দর্শনের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে স্থাপিত করতে চেয়েছেন। তবে সেই দর্শনের মূলও সত্যকার এই জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই। নকল মনগড়া কৃত্রিম মতবাদের মিথ্যা ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত দর্শনের দ্বারা সেই কাজ হয় না। সেই রকম উঞ্ছবৃত্তিতে আমাদের দৈন্যেরই পরিচয়।

তাই আমার জীবনের প্রতি ভালবাসার কথাতে জীবন-দর্শন সম্বন্ধে এত কথা বলতে হচ্ছে। জীবনকে সত্য বলে জানি, তাইতো তাকে একান্ত করে ভালবাসতে পারি।

জীবনকে আমি ভালোবেসেছি বটে,

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।†

জীবনে,

এমন একান্ত করে চাওয়া

এও সত্য যত

এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া

সেও সেই মতো—‡

কাজেই জন্ম-মরণ উভয়ে মিলেই পরিপূর্ণ সত্য।

আসল জীবন ও মৃত্যু যেমন পরস্পরে পূর্ণ, সীমা ও অসীমও তেমনি পরস্পরে পূর্ণ। সীমার মধ্যে ছাড়া আমাদের কাছে অসীমের আর আত্মপ্রকাশের কোনো উপায় নেই। তবে যা সীমা, তা ক্রমাগতই পরিবর্তনশীল। সেটাই তার প্রকৃতি। সে যখন চরম ও পরম অসীম সত্য হবার দাবি জানাতে আসে তখনই সে নিশ্চেষ্ট কঠিন নিরেট মৃত্যু হয়ে ওঠে। এই নিশ্চেষ্ট মৃত্যুতে মুক্তি নেই, স্রোতের প্রবাহ নেই, fluidity নেই। এই মৃত্যুই জীবনের বিপরীতধর্মী। সীমার এই কঠিন বেড়া ভেঙে ফেলা ছাড়া অসীমের আর গতি নেই। মানব-ইতিহাসে দেখা গেছে বারবার মানবের

* পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র এইজন্য জগতের সৃষ্টি ও বিধি লইয়া বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দর্শন হিসাবে চরকের ভূমিকা অপূর্ব বস্তু।

† 'বলাকা'র ১৯ নং কবিতা।

‡ 'বলাকা'র ১১ নং কবিতা।

মহাসাধনা যখন মিথ্যা সংস্কারের মতো (convention) মতবাদে ও বুলিতে জড়িয়ে মরতে বসেছে, তখনই সেই বাধা ভেঙে আবার তাকে বিশ্বজীবনের মহাস্রোতে যুক্ত করে দিতে হয়েছে।

ভারতের মনীষীরাও তো স্বীকার করেন এক এক লোকে যখন জীর্ণতা ও convention এসে ব্যক্তি-বিশেষকে বা জীবকে চেপে মারতে চায়—তখন ভগবানই মৃত্যুরূপে তার দ্বার মুক্ত করে তাকে লোকান্তরে নবজীবনের অধিকার দিতে এগিয়ে নিয়ে যান।

[মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।]

এরই নাম জন্ম-জন্মান্তর। এই জীবনেও আমাদের বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্যের সীমা লঙ্ঘন করতে হয়। মোট কথা দৈহিক কোনো প্রাচীর আমাদের আত্মার শাশ্বত পথকে চিরকাল রুদ্ধ করে রাখতে পারে না।

ভ্রূণরূপে বীজবদ্ধ নূতন জীবন কিছুদিন পর্যন্ত আবরণের মধ্যে বাড়তে থাকে তখন সেই আবরণটার খুবই দরকার। কিন্তু যখন ভ্রূণ বড় হয়ে আবরণটাতে আর আঁটে না অর্থাৎ বাধা পেতে থাকে তখন আবরণকে ছিন্ন করে তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে বৈকি। তখনই পরিণত ভ্রূণ জরায়ুকে ছিন্ন করে।

জরায়ু কথাটি চমৎকার। অভিধানে দেখেছি তার মানে যা জরাপ্রাপ্ত হয়েছে, যেমন সাপের খোলস, ভ্রূণের আবরণ ইত্যাদি। বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য এই অবস্থাগুলিও এক একটি জরায়ু অর্থাৎ ভ্রূণাবরণ। প্রত্যেকটি জীর্ণতাপ্রাপ্ত অবস্থাকে (stage) বিদীর্ণ করে বের হয়ে জীবনকে তার পরবর্তী অবস্থা সুরু করতে হয়। এরই নাম জীবনের প্রবাহ।

জীবন ও মৃত্যু, 'হাঁ' ও 'না' (positive and negative) দুইই সত্য। কিন্তু জরা মৃত্যু তো দেখতে পাইনা বা দেখতে চাইনা, দেখি আনন্দ ও যৌবন। কাজেই আমাদের কাছে দুটোরই মূল্য সমান নয়, 'হাঁ' অর্থাৎ positive জীবনকেই মহত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠতা দেই। ব্যক্তির জীবনে জন্মজন্মান্তর-ধারা রয়েছে। তবে মাঝে মাঝে স্মৃতির বিচ্ছেদ (memory-gap) আছে, যদিও আমাদের মধ্যে একটা অন্তর্লীন (sub-conscious) স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারা রয়েছে। তাতে একটা আবৃত্তি (cycle) সমাপ্ত করলে পুরাতন সূত্রের সঙ্গে যোগটি মেলে।

ফল না পাকলে বীজের মধ্যে অমরত্ব (immortality) আসে না। পাকলেই সেই সম্ভাবনা আসে। জ্ঞানও বীজের মতো। পাকলেই তা সার্থক,

তখন আবার নতুন cycleএর সম্ভাবনা। 'জীবন-দেবতা' প্রভৃতি কবিতায় জীবনের পুরাতন সূত্রটির জন্য আমি ব্যাকুলভাবে হাতড়ে বেড়িয়েছি (grope)। আবৃত্তিটিকে তখনই সুসমাপ্ত বলব যখন তার দুই দিকের সূত্রগত যোগটি সুসঙ্গত হয়ে মিলেছে।

ডিমের মধ্যে যে পক্ষীর ভ্রূণ রয়েছে সে তো ডিমের বাইরের বৃহৎ জগতের কোনো খবর রাখে না। কোনো প্রমাণও তার নেই। তবু পাখীর বাচ্চা ডিমটি ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। সেই কামনার মধ্যে তার না-দেখা বৃহত্তর জগতের সঙ্গে অন্তরগত যোগের প্রমাণ মিলবে। যুক্তিতে ও ন্যায়ে (Logic) কোনো প্রমাণ না থাকলেও তার ব্যাকুল কামনার মধ্যে আন্তরিক প্রমাণ রয়েছে। তাই সে নিঃশংসয়ে আপনার এতদিনকার আশ্রয়টিকে ভাঙবার জন্য আপনি ক্রমাগত ঠোকর মারতে থাকে। এতদিনকার বাসাকে যেন আজ তার না ভাঙলেই চলবে না।

একে অকৃতজ্ঞতা (ingratitude) বলতে পার, কিন্তু অসত্য তো বলতে পার না। এরই নাম বৈরাগ্য। আমরা বিষয়ীকে শ্রদ্ধা করি না, বৈরাগীকেই পূজা করি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে বিষয়কে আমরা তত সত্য মনে করি না যত সত্য মনে করি বৈরাগ্য অর্থাৎ বিষয়-বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলবার চেষ্টাকে।)

কবি কালিদাস যে কত বড় মূর্খ ছিলেন সেটা বোঝাতে গিয়ে আমরা বলি তিনি যে ডালে বসেছিলেন সেই ডালই কাটছিলেন। অথচ পক্ষী-শিশুও তো সেই কাজই করে। বৈরাগ্যও তাই করে। তবে, পক্ষী-শিশুর তো নিন্দা করিনে। কারণ প্রাণের দায়ে পক্ষী-শিশু এটা করে। এ ছাড়া তার উপায় নেই। আত্মার এই ব্যাকুল বৈরাগ্যের তাগিদকে (urge) অবৈজ্ঞানিক বলতে পারি কিন্তু এই তাগিদ এড়াবার উপায় নেই। আমরা এই তাগিদেই সীমার পর সীমা অতিক্রম করে করে ক্রমাগতই চলি, ব্যক্তিত্বকেও ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিরন্তর চলি।

জীবন-মৃত্যু সীমা-অসীম দুইই আছে। জীব ব্রহ্মে লয় হয়ে যায় একথা যাঁরা মানেন না তাঁরাও রাধাকৃষ্ণ যুগল তত্ত্ব মানেন। এই যুগলের একটিকেও বাদ দিলে চলে না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে এই দুইই আছে। রাধা ছাড়া কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ ছাড়া রাধার অর্থ কি? একটি আর একটিকে পূর্ণ করছে (complementary)। প্রতি আত্মাতেই সীমা-অসীমের যুগললীলা রয়েছে।

এই ভাবটাকে আমি প্রকাশও করেছি—

অসীম সে চাহে সীমার
নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের
মাঝে হারা।*

সীমাও তো উপেক্ষণীয় নয়। তার মধ্য দিয়েই অসীম আপনাকে প্রকাশ করতে পারেন, নইলে অসীমের তো প্রকাশই হতে পারে না।

এর মধ্যে হয়তো একটা তত্ত্ব (Philosophy) আছে। অনেক সময় সেই তত্ত্ব জানি না বা বুঝি না। তাতে কিছু আসে যায় না। তত্ত্ব না বুঝলেও তার আনন্দ আমরা পেতে পারি। সীমা যে একটা কিছু হয়ে আপনাকে ব্যক্ত করতে পারে এই হওয়াটাই একটা পরম আনন্দ। যেই সে ব্যক্ত হল অমনি তার গতি হল, বেগ হল, প্রকাশ হল, চরাচর তার সেবায় লেগে গেল। তখন তাকে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য আলো দেয়, মেঘ জল দেয়, বায়ু বীজন করে, সম্মুখে এগিয়ে যাবার জন্য মৃত্যু এসে তার দ্বার খুলে দেয়।

[ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।
(ক উ, ৬, ৩)]

সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের যোগে প্রত্যেকটি প্রকাশের মধ্যে একটা মহোৎসব লেগে যায়। এই আনন্দ তো একটা তত্ত্ব মাত্র নয়।

যে সন্তান কোথাও ছিল না, সে যখন এল মায়ের কোলে, তখন কী উৎসব, কী সমারোহ! তখন মনে হয় এ ছাড়া এতদিন ছিলাম কি করে? একে ছাড়া আমার চলবে কেমন করে? অসীমের ক্ষেত্রেও সীমার এই প্রকাশটুকু ঠিক সেই রকমের। কোথায় সে এতকাল ছিল জানি না। সে যেন অপূর্ব। এই জন্মটুকু পেয়ে সকলকে সে একেবারে ধন্য করে দিল। সে যে আসলে কী, কী তার মূল্য, কিছুই জানি না, তবু তার প্রকাশের আনন্দেই আমরা ধন্য। এই যেমন radio-activity—এর তত্ত্ব কে জানে? যাঁর যা খুশি বলুন। তবে তাকে যে দেখি ছুঁই এ কী অপূর্ব রহস্য! প্রকাশের

* উৎসর্গ, ১৭নং কবিতা।

কী মহোৎসব বিশ্বকে পূর্ণ করচে! প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে পরম সত্তারই অপরূপ প্রকাশ!*

কী ভাগ্যে আমরা বাস্তব রূপে সত্তা লাভ করে ধন্য হলাম, সার্থক হলাম। বিশ্বব্যাপী অব্যক্ত নীহারিকাও যদি ক্ষুদ্রতম একটুখানি ব্যক্ত-সত্তাতে প্রকাশ লাভ করে, তবে সে সার্থক সে ধন্য। কারণ তখন অরূপ ভাবসত্তা সীমা ও নাম-রূপ পেয়ে ব্যক্তিত্বের আনন্দে ও প্রকাশের সার্থকতায় কৃতার্থ হল। আজ যে আমি মানবব্যক্তিত্ব লাভ করেছি তাতেই আমি ধন্য।

[কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির 'পরে
ধুলামাটির মানুষ।
('বলাকা', ২৪ নং কবিতা)]

এই বিশ্ব-বসুধাও কত যুগযুগান্তরের তপস্যার ফলে আমাকে আজ মানবরূপে পেয়েচে। আমি যতই ক্ষুদ্র হইনা কেন, আমার এই দেহে আমার এই রূপে আমার এই প্রেমে স্বর্গও আজ কৃতার্থ। বাহির হতে দেখলে আমার এই ব্যক্তিত্ব যতই অপূর্ণ হোক না কেন তবু আমার মহিমার অন্ত নেই। আমার সুখদুঃখের জন্মমৃত্যুর তরঙ্গে অসীম স্বর্গ তার খেলবার দোলা পেয়ে আনন্দোৎসবের সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হল। তাইতো চরাচরকে পূর্ণ করে নানারঙের খেলা। আমার আসবার পূর্বেকার অব্যক্ত সৃষ্টি আমারই মধ্যে এতদিনে বর্ণ পেয়েছে বাণী পেয়েছে। আমার গানে তার মূক হৃদয় সংগীত-ঝংকারে ঝরে বাহির হয়েছে। এই তো পরমানন্দ।

(ছেলেবেলা থেকে একটা ভাবাবেগ আমাকে পূর্ণ করে (idea possess-) রয়েছে, তাকে আমি নানা আকার দিয়েচি। অল্প বয়সে আমার সেই ভাবাবেগকে কোনো রকমে আঁকু বাঁকু ক'রে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।

মায়ামোহত্যাগী এক সন্ন্যাসী ভালবাসার বাঁধন সীমার শৃঙ্খল ছিঁড়তে চায়। জীবনের সব আনন্দকে তুচ্ছ মায়ামোহ ক্ষুদ্র মনে করে সব ছেড়ে পর্বত-গহ্বরে তপস্যার জন্য সে গেল। আপনাকে কেন্দ্র করে কী নিরানন্দে তার দিনগুলি তখন চলচে। ঘটনাক্রমে একটি নিরাশ্রয় বালিকার দিকে তার স্নেহ-ধারা ধাবিত হল। তখন মায়ার দূতী মনে করে ক্রোধে তাকে সে ত্যাগ

* 'বলাকা'—১৯ নম্বর কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

করল। সে কী অন্তর্যুদ্ধ (struggle)! কিন্তু, হায়, সন্ন্যাসী যতই দূরে যায় ততই সেই বালিকাটির কান্নার ধ্বনি হৃদয়ে বাজে। এ যে প্রকৃত সত্য reality, বেদনাতেই তার অনুভব। সেই নতুন সুরে সন্ন্যাসী তখন সব দেখতে লাগল। সব প্রকৃতির আনন্দ তখন তার প্রত্যক্ষ হল।*

তখন সে দেখল জীবনকে বর্জনে কোনো সাধকতা নেই, গ্রহণেই তো সার্থকতা। এই সীমাকে পাওয়ার মধ্যেই অসীমকে স্পর্শ করা যায়। সীমার মধ্যে যে অসীম তাকেই প্রত্যক্ষ করা চলে। অসীমকে উপলব্ধি করবার আর তো কোনো উপায় নেই। তখন আমরা প্রত্যেকটি সীমার মধ্যেই সার সত্যকে (reality) দেখি। তখন দেখি মায়া মোহ প্রভৃতি আমাদেরই রচিত কৃত্রিম সব বাধা, সত্যের আনন্দকে আড়াল করে সব দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার এই ভাবটা প্রথমে অজ্ঞাতসারে পরে জ্ঞাতসারে উত্তরোত্তর আমার নানা কবিতায় বরাবরই দেখা দিয়েচে। চিরদিনই আমি এই কথাই বলচি যে সীমাতেই অসীম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি।

ঈশ-উপনিষদে আছে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে
অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো
য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥

অর্থাৎ যাঁরা শুধু অবিদ্যাকে উপাসনা করেন তাঁরা অন্ধতমোলোকে প্রবেশ করেন আর যাঁরা শুধু বিদ্যাকে উপাসনা করেন তাঁরা আরও অন্ধতর লোকে প্রবেশ করেন। ঈশ-উপনিষৎ আরও বলেন,—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা
বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥

বিদ্যা অবিদ্যা উভয়কে যাঁরা যুক্ত করে দেখেন তাঁরাই সত্য দেখেন। সীমা হতে বিযুক্ত অসীম যেমন ব্যর্থ অসীম হতে বিযুক্ত সীমা তেমনই অর্থহীন। রূপ ছাড়া ভাব একটা অনর্থ (abstraction) মাত্র, আবার ভাবহীন রূপও একটা

* মুনিঋষিদের তপস্যাভঙ্গগুলি দেখাইতেই কি তাই পুরাণকারেরা এত উৎসাহ বোধ করিয়াছেন?

খাপছাড়া উন্মত্ততা। 'Absolute', 'Finite' এসব গায়ের জোরের কথা। বিশ্ব-চরাচরের কোথাও এইসব খুঁটা খুঁটির স্থান থাকলে এই সৃষ্টি হতেই পারত না।

যে বিষয়ী সে অন্ধ। যে সব কিছুকে ছেড়ে শূন্য অনন্তকে নিয়ে রইল সে আরও অন্ধ। কারণ তার মধ্যে বস্তু (content) কিছুই নেই। এইসব কথা আঠারো বছর বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখবার সময়ে বুঝি নি। তারপর না জেনে ও না বুঝে বারবার এই কথাই বলেছি। কে যেন আমাকে এই কথা না বলিয়ে ছাড়ে নি। পরে দেখেছি এই তত্ত্বই ভারতের সর্বতত্ত্বের সারতত্ত্ব।

এটা আমার তত্ত্ববাদ (Philosophy) মাত্র নয়। আমি কবি বলেই এটা বুঝেছি। প্রকাশের পূর্বের বেদনা যে কী তা আমি জানি। তারপর যখন সে বাণী হয়ে দেখা দেয় তখন যে কী আনন্দ তাও জানি। তার উদ্ভব এক অপূর্ব ব্যাপার। ছন্দ-সৌন্দর্য-সুর নিয়ে অপার অকূল সাগর হতে উর্বশীর মতো তার জন্ম। অব্যক্তের মধ্য হতে আজ ব্যক্তের উদ্ভব হল। অসীম যেই সীমায়-রূপে-সৌন্দর্যে-ছন্দে-সুরে ধরা দিল তখনই সে সত্য হল। তখনই পরমানন্দ। অসীমের মহিমাই সীমায়।

কবিতা-ব্যাখ্যা

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,…

১৩২১ বৈশাখে আমার মন কর্মশ্রান্ত। ভাবছি কিছু কাল ক'সে কুঁড়েমি করব। কিন্তু চালানেওয়ালার মতলব অন্যরকম। সবুজপত্রের মারফতে তিনি তাঁর নতুন হুকুম হাজির করলেন। তিনি জানেন যৌবনের শক্তি ও প্রাণের ডাক শুনলে আমার পক্ষে তা আর অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। 'বলাকা'র কবিতায় ও 'হালদার গোষ্ঠী'র-গল্পে আর বিশ্বভারতীর গোড়াপত্তনের চেষ্টায় অফুরন্ত কাজের সাগরে ঝাঁপ দিলাম।

'বলাকা'র এই প্রথম কবিতাটি 'সবুজের অভিযান' নামে 'সবুজপত্রে' বের হয়।* দেখা যাচ্ছে ১৫ই বৈশাখ কবিতাটি শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছিলাম।

---

* ১৩২১ বৈশাখ।

ব্যাখ্যা—বীজের মধ্যে প্রাণ এলেই অংকুর হয়ে সে বীজের আবরণ বিদীর্ণ করে। প্রাণের ধর্মই এই। পুরাতনের অর্থহীন বন্ধনকে ভাঙাই হল তার কাজ। আপ্ত বাক্য ও শাস্ত্রের বাঁধন যৌবনের জন্য নয়। যৌবন সব কিছু ভেঙে-ভেঙে পরখ করে-করে সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। প্রবীণতা চায় সব বিপদ-ব্যথা-ক্ষতি এড়িয়ে পরের অভিজ্ঞতা আশ্রয় করে নিরাপদে থাকতে। এই অভিজ্ঞতার বোঝা আবার সে তার উত্তরাধিকারীদের ঘাড়েও চাপিয়ে রেখে যেতে চায়। আপ্ত শাস্ত্রের বাঁধি বোল না মেনে সব কিছু প্রত্যক্ষ করতে গেলেই পদে পদে বেদনা আছে। অথচ পরের অভিজ্ঞতাকে জীবনের কর্ণধার করতে যৌবন নারাজ। বাঁধা পথের নির্বিঘ্নতা সে চায় না, এই তো যৌবনের ধর্ম। কাজেই প্রবীণ ও নবীনের পথ ভিন্ন। (১ম)

যৌবনই বিশ্বের শাশ্বত ধর্ম। জরাই মিথ্যা। জরাসন্ধের জরাবন্ধন দুর্গ ভেঙে চূর্ণ করে যৌবন উড়ায় জীবনের জয়ধ্বজা। ঝুনো প্রবীণদের পাকা আর যৌবন-পথের পথিকদের কাঁচা বলা হয়েছে। (২য়)

প্রবীণেরা চারিদিকের প্রাণ-চেষ্টাকে কিছুতেই দেখবেন না। চারিদিকের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ যেন নেই। মাটিতে তাঁদের পা পড়ে না। নিজেদের কৃত্রিমতার বাঁশের উচ্চ মাচাতে বসে-বসেই তাঁরা তৃপ্ত। এই কৃত্রিম মাচাই তাঁদের অচলায়তন। (৩য়)

যৌবনকে ঠেকাতে গিয়ে সাঁচায় মিছায় যে যুদ্ধ লাগবে সেটাই পরম লাভ। তার জন্যই যৌবনকে আহ্বান করা। (৪র্থ)

যিনি বিশ্বস্রষ্টা তিনিই তো নিয়মভাঙা ক্ষ্যাপা ভোলানাথ। সেই নটরাজের তালে তালে নৃত্য করতে করতে বিজয়-পতাকা নিয়ে যৌবন করুক তার জয়যাত্রা। বাঁধনের পূজাবেদী ভাঙুক। দ্বার ভেঙে ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি আসুক। (৫ম)

বাঁধা পথ শেষ হয়ে যাক। অবাধ অজানার পথে যাত্রা সুরু হোক। পুঁথির বিধান না মানলে যদি বিপদ আসে, তো আসুক। সেই বিপদের দেখা পাওয়া যাবে বলেই হৃদয় নৃত্য করচে। (৬ষ্ঠ)

তুই চিরযুবা। সব জীর্ণতা ভেঙে ফেলে অফুরন্ত প্রাণ লুটিয়ে দে। নব-জীবনের উন্মত্ততায় তুই মাতিয়ে দিবি। বজ্র-বিদ্যুতে ভরা ঝড়ের মেঘই তোর জয়পতাকা। নবীন বসন্তই তোর চিরদিনের বন্ধু। তারই মতন তুই চিরনবীন, তুই অমর। (৭ম)

আলোচনা—গতির ছন্দে ও নৃত্যেই অরূপ করে রূপ-পরিগ্রহ। যাঁরা রূপের উপাসক তাঁরা গতিকে বরণ না করে পারেন না। আচারের অতিবন্ধনে মানব-সমাজ যখন আপন সার্থকতার প্রকাশ (expression) হারিয়ে ফেলে তখন কবিরাই তাকে আঘাত করে গতির জন্য করেন জাগ্রত। বৈদিক ঋষিরাও এ-কাজ করেছেন। মধ্য যুগে সাধক কবীর প্রভৃতির দলও এই ধাক্কাই দিয়েছেন, আর বাউলদের তো কথাই নেই। একলা আমাকে দোষ দিলে হবে কি?

আমাদের দেহ চায় বসে পড়তে, অথচ আত্মা নিত্য-সচল। জড় প্রকৃতির বাঁধনে বদ্ধ হলেও চিন্ময় আহ্বান শুনে আত্মাকে জাগতেই হবে। স্থিতিশীলেরা তাই প্রকৃতির দোহাই দেন আর গতিশীলেরা করেন আত্মার জয়-ঘোষণা। জীবনের ধর্ম গতি, দেহের ধর্ম স্থিতি।

২ নং

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।… …

৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২১) রামগড়ে বসে লেখা।

'সর্বনেশে' একটা রূপক বা symbol নয়। অন্তরে বা বাহিরে যদি সে সর্বনেশে আসে তবে কেমনতরো হবে তার অভ্যর্থনা? গ্রহণে না পলায়নে? —এটাই ছিল চিন্তনীয়। অন্তরের ও সমাজের যতরকম প্রচ্ছন্ন সম্পদ সবই দেখা দেয় দুঃখ-কালে। দুঃখের দিন ছাড়া অপ্রত্যক্ষ সেই সম্পদের দেখাই মেলে না। গত যুদ্ধকালে কত অখ্যাতনামা দীনহীন জন আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন ও নিজেদের স্বরূপ প্রকাশিত করেছেন।

ব্যাখ্যা—বেদনা ও কান্নার বন্যার মধ্যে সর্বনাশা এলেন। বাইরে হানাহানির ঝড়ঝঞ্ঝায় মাতামাতির সূচনা চলেচে। এই তো তাঁর আসবার যোগ্য সময়। (১ম)

মৃত্যুলীলার রূপ নিয়ে জীবনই সমাগত। নটরাজের এই এক নৃত্যলীলা। সর্বস্ব সমর্পণ করে বিষম বেদনার মধ্যে তাঁকে বরণ করে নিতে হবে। (২য়)

জ্ঞানের অভ্যাস অজানা অজ্ঞাতের ডাককে বাধা দেয়। আজ দুঃখ-মরণের আহ্বানে নিরুদ্দেশের ডাকে সেই অতিপরিচিত জরাজীর্ণ অভ্যাসের মূলোচ্ছেদ হল। চিরপরিচিত সংস্কারের ভিত হল অভ্যস্ত নির্দিষ্ট আশ্রয়। ঝড়ে এই ভিত

নষ্ট হোক। ব্যক্তির জীবনে ও মানবের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এইরূপ আহ্বানের যুগ আসে। তখনই অভ্যস্ত ও অজানার, ঘর ও বাহিরের বিরোধ (conflict) বাধে। (৩য়)

যদি সেই সর্বনেশের ডাক আসেই তবে ছাড়তে হবে সব দুর্বলতা। যে-ঝড়ে তাঁর ডাক আসে, তাতে যদি ঘরের শিকল ভেঙেই থাকে তবে সব সুখ-দুঃখ ভাসিয়ে দিয়ে বাইরেই ছুটে যা। (৪র্থ)

চিরদিনের ঘরকে ছাড়তে হলেই যে সর্বনাশ হল তার কি মানে? জীবনের পূর্ণতার জন্যই এক এক সময় পুরাতন ঘরকে ছেড়ে নূতন ঘরের দিকে পা বাড়াতে হয়। পিতার ঘর ছেড়ে পতিগৃহে গিয়েই ধর্মপত্নী লাভ করে তার সার্থকতা। পরিচিত ভূমি তার পিতার ঘর, অজানা লোক তার পতিগৃহ। অন্তরাত্মাকে তাই পরিচিত পিতার ঘর ছেড়ে অজানা লোকের পতিগৃহে আনন্দে যাত্রা করতে হবে। এতে যত দুঃখই থাক তবু কাঁদতে কাঁদতে এই যাত্রা করতেই হবে। অপরিচিত 'সর্বনেশে' বলে পতিগৃহকে এড়ালে চলবে না।

(আলোচনায় কবিগুরুর নিষ্কর্ষ স্থানান্তরে আছে)।

৩নং

আমরা চলি সমুখ পানে……*

আলোচনা—এই কবিতায় যৌবনের জয়-ঘোষণা রয়েছে। মৃত্যুর গণ্ডি ভেদ করে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সত্যের পরিচয় মেলে। বিশ্বব্যাপী জাগরণ ও নবজীবন আসচে। আমার বেদনার মধ্য দিয়ে বিধাতা বিশ্বব্যাপী সত্যকেই যেন প্রকাশ দিতে চাচ্ছেন। আমার বেদনাটা তার উপলক্ষ্য মাত্র। আমাদের অন্তরের সঙ্গে বিশ্বের একটা অপূর্ব অব্যবহিত অতন্ত্র (wireless) যোগ দেখা যাচ্চে।

বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির চেয়ে বড় বিশ্ব-মানবের সাধনার কথাই এখানে বলা হয়েছে। মৃত্যুকে পার হয়ে অমৃত লাভ করতে চলেছে প্রলয় যাত্রা। একদল এখনো পুরোনো যুগের জাতীয়তাবাদকেই আঁকড়ে ধরে আছেন। তাঁদেরও যুদ্ধ চলেছে ভাবীকালের সঙ্গে। তাঁদেরও আর আশ্রয় নেই।

---

* গ্রন্থ-ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মাথার উপরের আশ্রয় ও পায়ের তলার ভরসা উভয়ই তাঁদের সরে গেছে। পুরাতন সংস্কারের সব বোঝা আর সেই অপদেবতার মন্দির-রক্ষার দায় তাঁদের কম দুঃখ দেবে না। তবু তাঁরা নবজীবনকে এখনো স্বীকার করবেন না।

আর একদল ঘরছাড়া আছেন যাঁরা নবযুগের স্রষ্টা। আশা ও আলোকের পথে তাঁরা চলেছেন। বাধাবন্ধ মুক্ত করে চলতে গিয়ে অনেক বিঘ্ন বিপদ রক্তপাত তাঁদের সইতে হয়েছে। পুরাতনের উপাসকেরা ভুলে যান একদিন তাঁদের সংস্কারও নতুন ছিল, অনেক বাধা তাঁদেরও সরাতে হয়েছিল। তাই পুরাতনপন্থী জরার উপাসকেরা মনে করেন এই সত্যই চরম, এতেই পরম ও শাশ্বত কল্যাণ। তাই তাঁরা আর সব কিছুকে বাধা দেন। এইসব পুরাতনের ভক্তেরা ভূতবাদী,—ভূত অর্থই তো পুরাতন। তাঁরা ভূতের বোঝা বইচেন। পুরাতন বোঝার ভারে তাঁরা মানবের যথার্থ মহিমা ভুলে গেছেন। মানব-মহত্বের শাশ্বত বাণী তাঁরা আর জানেন না। অথচ কোন যুগে আথর্বণ ঋষি বলে গেলেন,

যে পুরুষে ব্রহ্মবিদুস্
তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্।*

মানবের মধ্যে যাঁরা ব্রহ্মকে দেখেছেন তাঁরাই তাঁকে ঠিক জায়গায় দেখেছেন। তিনিই মহামানব নারায়ণ। পুরাতনের ভক্তেরা এই মহামানবকে বলি দিয়েছেন জাতি ও ভৌগোলিক উপদেবতার কাছে। এঁদের সঙ্গে তাই ভবিষ্যতের সাধক ও নবযুগরচয়িতাদের বিরোধ। এইসব যুগস্রষ্টার দল নিন্দা-দুঃখ-অপমানে অবিচলিত থেকে উদার ও বিশ্বজনীন আদর্শকে বিশ্বাস ও পূজা করচেন। বহু লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করে তাঁদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

পুরোনো যুগের অন্ধকার রাত্রি যেন শেষ হয়ে আসছে, বিশ্বজনীন নবযুগের পূর্ব-সূচনা যেন দেখা দিয়েছে—এই রকম একটা তাগিদ মনের মধ্যে এসেছিল বলেই এই কবিতা লেখা। এই কবিতায় আমার নিজের কথা বলতে গেলেও বিশ্বব্যাপী সত্যের কথাই বেরিয়ে এসেছে। আমার কথার ছলে নানা লীলায় সেই সত্য আপনাকেই প্রকাশ করেছে।

ব্যাখ্যা—যাঁরা দুঃখ দুর্গতিকে অগ্রাহ্য করে নির্ভয়ে এগিয়ে যাবেন তাঁরাই

জয়ী হবেন। বেদনার ভয়ে পিছিয়ে পড়ে থাকলে কপালে অনেক দুঃখ আছে। পুরাতনের উপাসকেরা নবযুগের রচয়িতাদের গতিপথে বাধা দিতে গিয়ে হয়তো অনেক ফাঁদ পাতবেন। তাতে নবীনদের ঠেকাতে পারবেন কেন? তাঁরা রক্তাক্ত চরণে রৌদ্র ছায়ার মধ্য দিয়ে এগিয়েই যাবেন। পুরাতনীরাও রক্ষা পাবেন না। আপন ফাঁদে তাঁরা আপনারাই জড়িয়ে মরবেন। (১ম)

নবীনদের তো থামবার জো নেই। রুদ্রের ডাক এসেছে। সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। রুদ্রই যে ঈশান অর্থাৎ চালক। আলোর ভাষাতেই তাঁর ডাক। দ্বার বন্ধ করে সেই জ্যোতির্ময়ের দীপ্ত আহ্বানকে যারা এড়াতে চায়, তাদের কেঁদে কেঁদে মরতে হবে। আলোয় পাগল আমার মন আজ সেই বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত হতে চাচ্চে, কে তাকে বাধা দেবে? (২য়)

তাঁর আহ্বানের বলে সব বাধা জয় করে অগ্রসর হতে হবে। তিনিই তো রয়েছেন সাথে। যারা গণ্ডির মধ্যে আপনাকে বেঁধে রাখতে চায় তারাই তাঁর সঙ্গলাভের পরম সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হল। এর চেয়ে দুঃখ দুর্গতি আর কি হতে পারে? (৩য়)

ঈশানের বিষাণ বাজছে, বাধা বন্ধ দূর হয়ে যাচ্ছে। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে তাতে সাড়া দিতে হবে। মৃত্যুর সাগর মন্থন করে অমৃত রস আনতে হবে। ওরা জীর্ণ জীবনের মায়া ছাড়তে না পেরে মৃত্যুর মধ্যে পচে মরছে। জীবনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে গিয়ে জীবনকেই হারাবার মতো দুর্গতি আর কি কিছু আছে? (৪র্থ)

৫৪নং

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে……*

ব্যাখ্যা—যে শঙ্খে তোমার আদেশ ধ্বনিত হচ্ছে তা নিয়ে কি খেলা করতে পারি? যে শঙ্খ নতুন পথের যাত্রীদের অভয় দিয়ে পথ দেখাবে তাকে পূজার ছলে অকর্মণ্য করে রাখবার কী অধিকার আমার? যারা তাঁর পতাকা তুলে দুঃখ দুর্গতির মধ্যে গান গেয়ে চলবে তাদের চালাবার জন্যই তো তোমার এই শঙ্খ। (১ম)

*গ্রন্থ-ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মন চাচ্ছিল শান্তি। তাই পূজার ঘরে অর্ঘ্য সাজিয়ে বসা গেল। যে শঙ্খে বিশ্বযাত্রীদের কাছে যুগের আহ্বান আসবে সেই শঙ্খকে আমার পূজার সামান্য উপকরণ মাত্র করে রাখার অর্থ হল তাকে অপমান করা। (২য়)

আরতির শান্ত প্রদীপে বা রজনীগন্ধার রম্য আনন্দে আমার সান্ধ্যকৃত্য আজ সম্পূর্ণ হবার নয়। বৃহৎ জগতের ডাক আজ এসেছে। জাতীয়তা প্রভৃতি ছোটো-খাটো দেবতার সঙ্কীর্ণ পূজায় আপনাকে বাঁধতে গেলে চলবে না। হে প্রভু, তোমার নীরব শঙ্খ ধ্বনিত করবার জন্য আমাকে আজ ডাক দিয়েছ। এখন আরাম বিরাম খুঁজলে চলবে কেন? রক্তজবার মালা গেঁথে যুদ্ধযাত্রায় বের হতে হবে। পূজা বা সৌন্দর্যের রজনীগন্ধার সময় তো আজ নয়। (৩য়)

অন্তরে আমার যৌবন সঞ্চার কর, দীপ্ত দীপকতান শোনাও। যাত্রা সুরু হোক। মানব-তপস্যার প্রসার কতদূর তা তো জানি না। অনভ্যস্ত পথে যাত্রায় মন ভয় পায়। সেই পথে যাত্রার আহ্বানই তোমার শঙ্খে। তোমার এই শঙ্খ বিষম ভারি। তা হোক—বিশ্বমানবকে ডাক দেবার জন্য তবু তাকে দুই হাতে তুলে ধরব। মাটিতে তাকে পড়ে থাকতে দিলে আজ চলবে কেন? (৪র্থ)

সহজসাধ্য নয় এই যাত্রা। চক্ষের ঘুম বিদায় নেবে, সর্বাঙ্গে অস্ত্রক্ষত হবে, চারিদিকে হাহাকার ধ্বনিত হবে, তার মধ্যেই মহোল্লাসে বাজবে তোমার শঙ্খ। (৫ম)

তোমার কাছে আরাম চাইতে গিয়ে এখন লজ্জায় মরি। মালা না দিয়ে যদি তোমার রণ-খড়্গ দাও তবেই আজ হয় ভালো। দুঃখ আঘাত যা আসে আজ সব সইতে হবে। তোমার শঙ্খ আমার বুকের মধ্যে বাজবে। আমার প্রাণের সব ভয় দূর হবে। সর্বশক্তিতে তোমার অভয় শঙ্খকে আজ বাজিয়ে তুলতে হবে। (৬ষ্ঠ)

৫নং

মস্ত সাগর দিল পাড়ি

গহন রাত্রিকালে......*

৫ই ভাদ্র কলিকাতায় বসে কবিতাটি লেখা।

য়ুরোপে তখন যুদ্ধ চলেছে,—এই চিন্তাটা মনের মধ্যে সুপ্ত চৈতন্যলোকে

* গ্রন্থ-ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কাজ করছিল। অন্তর-লোকে সমাহিত আমি যেন দেখছি ঝড়ে নৌকোর পাল তুলে দিয়ে যুদ্ধের প্রমত্ত সাগর পার হয়ে নিত্যকালের কর্ণধার এগিয়ে আসছেন। এমন দুর্দিনে তাঁর আসা কেন? কার জন্য কি সম্পদ্ নিয়ে তিনি আজ আসচেন?

এখানে দুটি প্রশ্ন। কি তাঁর সম্পদ্ এবং কোন্ ঘাটে তিনি এসে নাববেন? শাশ্বত কালের এই কর্ণধার মানবের জন্য কি বর নিয়ে আজ এলেন? কোন্ দেশে কার হাতে তিনি সেই সম্পদ্ দেবেন?

আমার সুপ্ত চৈতন্যের মধ্যে দেখছিলাম যেন আমার 'খেয়া'র যুগের কোনো ভাব এসে আবার আমার মন জুড়ে বসেছে। 'খেয়া'র প্রথম কবিতাতেই বড় বেদনায় এই প্রশ্ন ছিল,

আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা-শেষের শেষ খেয়ায়?

সেই প্রশ্নের উত্তর যেন এতদিনে মিলেছে। এখানে যেন সেই বেদনার অবসান হয়েছে। প্রথমেই দেখতে পেয়েছি—

ঐ যে আমার নেয়ে।

খেয়াতে 'প্রচ্ছন্ন' কবিতায় ভয়ে ভয়ে মনে ভেবেছি—

হেথায় ভিখারিণীর লজ্জা কি গো
ঝরবে নয়ন জলে
তারে রাখবে মলিন বেশে?

এখানে ভাবছি—

অগৌরবার বাড়িয়ে গরব
করবে আপন [illegible]
বিরহী মোর নে[illegible]

'প্রচ্ছন্ন' কবিতায় আমার মনের এই আশা মনেই ছিল—

আমার দৈন্য-খানি যত্নে রাখি,
রাজৈশ্বর্যে তব—
তারে দিব বিসর্জন,
ওগো অভাগিনীর এই অভিমান
কাহার কাছে কব
তাহা রৈল সংগোপন।

এখানে দেখতে পেলাম

দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক পরশ পেয়ে।
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আসবে নেয়ে॥

এই ভরসাতে পূর্ণ হয়েই আমার এই কবিতাটির অবসান। কাজেই এই কবিতার আদি ও অন্তে 'খেয়া'রই সুর আবার যেন নতুন ভাবে বেজে উঠেছে। এতদিনে যেন তার প্রশ্ন ও সন্দেহের সমাধান হয়েছে। আমি দেখছি—

ব্যাখ্যা—সাগর মত্ত, ঝড় বয়েছে, রাত্রি গভীর, এমন দুর্দিনে কি ভেবে কূল-ছাড়া আমার নেয়ে পালে ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে তরী বেয়ে আসচেন? নিয়ম দিয়ে বিধিবিধান দিয়ে সংযত আরামের লোকপ্রচলিত কূল ছেড়ে মত্ত সাগরের মধ্যে কেন তিনি পাড়ি ধরলেন? কালো রাতের কালিঢালা আকাশ ও সাগর যেন উন্মত্ত দিগন্তে মিশে গেছে। ক্ষ্যাপা ঢেউয়ের দল উধাও হয়ে যেন কোথায় নিয়ে চলেছে। এমন দুর্দিনে কোন্ সংকল্প নিয়ে তাঁর এই পাড়ি দেওয়া? (১ম)

'খেয়া'র যুগে আমি যে হতভাগিনী ভিখারিণীর কথা ভেবেছি, সে অর্ঘ্য সাজিয়ে বৃথাই বসে থাকে। কেউ যদি হতভাগিনীকে শুধায় 'কি চাও?' তবে সে নয়ন নত করে নিরুত্তরে বসে থাকে। অভাগিনীর প্রার্থনা সে জানাবে কোন্ সাহসে? শুধু মনে মনে সে কল্পনা করে একদিন না একদিন তিনি তার খবর নিতে আসবেন। যখন তিনি আসবেন তখন সেই আনন্দ সে ধারণ করবে কেমন করে? সময় তো হায় বয়েই গেল, ভিখারিণীর সব আশা তবে কি ব্যর্থ ই হবে?*

এতদিনে বুঝি সেই হতভাগিনীর জন্য অভিসারে আমার নেয়ে বার হয়েছেন। এখনো তাঁকে দেখা যায় নি, তবে দারুণ অন্ধকারের মধ্যেও তাঁর সাদা পালের একটু চমক একটু প্রকাশ মাঝে মাঝে চোখে পড়চে। কোন্ ঘাটে তাঁর তরী যে ভিড়বে তার সন্ধান কে জানে? রাতারাতিই সেই কর্ণধার পথ-হারা পথ দিয়ে সেই নামহীনা হতভাগিনী বিরহিণীর উদ্দেশে ছুটে যাবেন। খ্যাতিহীন তার আঙিনার খবর তো আর কেউই জানে না। সেইখানে

* খেয়া—'প্রচ্ছন্ন'।

সে তার পূজার বাতি জ্বালিয়ে কতকাল পথ চেয়ে আছে। এমন উন্মত্ত রাত্রে মত্ত ফেনিল ক্ষুব্ধ সাগর পার হয়ে সেই অগৌরবাকে জীবনের চরমতম গৌরব দিতে তাঁর এই যাত্রা। (২য়)

এই তুফানে এই আঁধারে ঘর-ছাড়া উদাসী আমার নেয়ে কাকে খুঁজচেন? তার জন্য তরী বেয়ে কোন্ সম্পদ্ তিনি এনেছেন? কিন্তু সেই অগৌরবা তো ধনসম্পদ্ বা শক্তির ভিখারিণী নয়। শক্তি ও সম্পদ্ দিতে তিনিও আসেন নি। তাঁর হাতে শুধু রজনীগন্ধা ফুলের একটি গুচ্ছ। যে ফুল দিনের বেলায় সকলের দৃষ্টির অগোচরে থেকে রাতের অন্ধকারেই ফুটে আপনার অন্তরের সম্পদ্ নিঃশব্দে বিতরণ করে এ সেই ফুল। সেই ফুলই তো তাঁর পূজার যোগ্য উপায়ন। যাকে দেবার জন্য এই ফুল সেও অন্ধকারেই আপনার অনাড়ম্বর তপস্যায় রত। নতুন প্রভাত আসচে, নবীন নাবিক আসচেন তার যোগ্য উপহার নিয়ে। সেই উপহার হল প্রেমের পুষ্পমালা। (৩য়)

পথের পাশেই পূজারিণীর উপেক্ষিত ঘরখানি, কারও চোখে পড়বার মত নয়। সেই পূজারিণীরই জন্য কি সবার অগোচরে তিনি তরী বেয়ে আসচেন? দরিদ্রা পূজারিণীর তৈলহীন রুক্ষ কেশ, অশ্রুসিক্ত আঁখি। তার ঘরের ভিত ভাঙা, বাদল বায়ে থেকে থেকে দীপের ছায়া ঘরময় কাঁপছে। দৈন্য ও ভয়ের মধ্যে তার বাস। কখন না জানি এই শিখাটুকুও নিবে যায়, এই ভয়। সেইখানে দৈন্যে ভয়ে সংকোচে প্রতীক্ষমাণা অখ্যাতা অজ্ঞাতা পূজারিণীর নাম নিয়েই কি আজ তিনি আসচেন?

এতদিনে কি তাঁর চমক ভাঙল? এই দীনহীনার কথা কি এতদিন তাঁর মনে পড়ে নি? না, না। তিনিও তার জন্য কম উৎকণ্ঠিত নন। কবেই তিনি বাহির্ হয়েছেন, কত যুগ ধরে তিনি তার জন্য কাল-সমুদ্র পার হয়ে আসচেন। তরী বেয়ে এখনো তাঁর পৌঁছতে দেরী হবে, রাত্রির অবসান এখনো তো হয় নি। তবে প্রভাতের সূচনা যেন একটু একটু এখনই পাওয়া যাচ্ছে।

তাঁর আগমন কেউ বুঝবে না, কারণ তাতে তো কোনো সমারোহ হবে না। শুধু নবজ্যোতির উদয়ে আঁধারটুকু কেটে যাবে, ঘরখানি আলোয় ভরে উঠবে। বাইরের কোনো সম্পদ তিনি দেবেন না, শুধু দৈন্যকে ধন্য করে শূন্যতাকে তিনি পূর্ণ করে দেবেন। তাঁর পুলকভরা পরশ পেয়ে বিরহিণীর দেহ পুণ্য হবে ধন্য হবে। এতকাল মনে মনে তার কত সন্দেহ কত ভয়ই

হচ্ছিল,—তার এতকালের প্রতীক্ষা, নীরব জাগরণ, সার্থক হবে কি না। কিন্তু এখন তার চিরদিনের সব সন্দেহ বিনা তর্কে নীরবে দূর হবে। আজ কর্ণধার তার জীবনের কূলে আসচেন। (৫ম)

আলোচনা—যুদ্ধের পূর্বের ও পরের এই পাঁচটি কবিতায় যুদ্ধের পর্ব শেষ হল।

ইতিহাস-বিধাতা বিরাট্ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুরস্কারের বরমাল্য নিয়ে আসচেন। সেই মালা পাবে কে? আজ যারা শক্তিমান ধনবান বিখ্যাত, তাদের জন্য তিনি আসচেন না। তারা সব ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত, কিন্তু ধনরত্নের বোঝা তো আজ তাঁর হাতে নেই। তাঁর বর হল প্রেমের শান্তি। সৌন্দর্যের ও পবিত্রতার মালাই তাঁর পুরস্কার। রজনীগন্ধার গুচ্ছ, পরিপূর্ণতার কুসুমদল আজ তাঁর পুরস্কার। ধনী ও শক্তিমানেরা এই মালার প্রতীক্ষা করে নি, তারা চেয়েছে সম্পদ প্রভুত্ব রাজশক্তি। যে অখ্যাতা তপস্বিনী আপন অঙ্গনে তাঁর পূজায় রত, আমার নেয়ে তাঁর রজনীগন্ধার মালা তারই জন্য নিয়ে আসচেন। যে বিরহিণী ভয়ে শঙ্কায় চিরপ্রতীক্ষমাণা তাকেই তিনি প্রেমের পরিপূর্ণতার ও শান্তির বরমাল্য দেবেন। কারণ সে তো কোনো ধনসম্পদ চায় না। এতকাল এই ভয় নিয়েই সে রাত কাটিয়েছে—'এই দুর্দিনে আমার এই অখ্যাত ঘরের পথ চিনে কি তিনি আমার কাছে আসতে পারবেন? তাঁর পদস্পর্শে কি এই দেহ এই গেহ ধন্য হবে?'

এখন ধন্য হয়ে সে বলতে পারবে, 'তোমার হাতের এই প্রেমের মালাই আমি চিরদিন কামনা করে আসচি, এর বেশি আর কিছুই তো আমি চাই নি।' এই দীনদুঃখিনী দুর্বলা হোক দরিদ্রা হোক অখ্যাতা হোক, কিন্তু এতকাল সে এইজন্যই তার পূজার প্রদীপখানি জ্বালিয়ে নিরন্তর তার নিঃশব্দ সাধনা করে এসেছে। শত শত যুগের যুদ্ধ-বিপ্লবের ঝটিকাতে ফেনিল সমুদ্র পার হয়ে, তারই জন্য শান্তির সৌন্দর্যের পুষ্পহার নিয়ে বিধাতা আসচেন। শত শত শতাব্দীর পথ পার হয়ে তিনি আজ চাচ্চেন দুঃখ-কোজাগরীর চিরজাগ্রত সেবিকাকে।

কোন্ ঘাটে তিনি তরী ভিড়াবেন, কোন্ ঘর তাঁর লক্ষ্য, কাকে তিনি চান, তা কি কেউ জানত? এ তাঁর এক অপরূপ অভিসার! সেই সর্বহীনা হতভাগিনীর গলায় তাঁর বরমাল্য পরিয়ে দেবার জন্যই তাঁর এই যুগযুগান্তরের অভিসার! ঐশ্বর্য নয় শক্তি নয়, শুধু এই তাঁর বরমাল্যটুকু অখ্যাতা পূজারিণীর

গলায় পরিয়ে দিতে এত কাণ্ড? হাঁ, তারই জন্য। এইরকমই তাঁর অপূর্ব অভিসার। সব ইতিহাসের এটাই মর্মগত সত্য।

গত মহাযুদ্ধে একদল লোক বসে বসে নানা কূট কৌশলে আয়োজন করছিলেন যেন যুদ্ধের পর সব শক্তি ও সম্পদ্ তাঁদেরই হাতে আসে। কিন্তু আর একদল অখ্যাতনামা তাপস চেয়েছিলেন যেন পৃথিবীতে প্রেমের ও কল্যাণের রাজ্য আসে। পৃথিবীর এই প্রলয়-কাণ্ডের মধ্যে মানব-ইতিহাসের পরম ও চরম সার্থকতাকে তাঁরাই বিশ্বাস ও উপলব্ধি করেছেন। এই ভিখারিণীর মত তাঁরা পরাজিত লাঞ্ছিত, কিন্তু মনুষ্যত্বের চরমতম সার্থকতার প্রতীক্ষাতেই তাঁদের তপস্যা। ব্যক্তিবিশেষ জাতিবিশেষ বা দেশবিশেষের জন্য তাঁদের এই তপস্যা বা প্রার্থনা নয়। বিশ্বের সবাই সার্থক হোক, কেউ যেন দুঃখী ও বঞ্চিত না থাকে, এইজন্যই তাঁরা দুঃখের রাতে কর্ণধারের পথ চেয়ে চেয়ে জেগে বসেছিলেন। সংসারের সবারই গতি তাঁদের আদর্শের বিপরীত পথে, তবু তাঁরা তাঁদের তপস্যার প্রদীপ না নিভিয়ে নিঃশব্দ সাধনা চালিয়েই গেছেন। তাঁরাই এতকাল ভয়ে ভয়ে সংকোচের সঙ্গে এই নাবিকের প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য করেই সেই নাবিক আজ তাঁর বরমাল্য নিয়ে ঘাটে তরী লাগাবেন। এতদিনে তাঁদের সব শূন্যতাকে তিনি পূর্ণ করে দেবেন।*

৬নং

তুমি কি কেবল ছবি
শুধু পটে লিখা।……

তত্ত্ববাদীরা বলেন আনন্দের জন্য পরব্রহ্ম আপনাকে পুরুষ-প্রকৃতি এই দুই রূপে ভাগ করলেন। তার মধ্যে পুরুষ বা আত্মা চিরযাত্রী, অফুরান পথে সে ক্রমাগতই এগিয়ে যেতে চায়। মা হয়ে প্রিয়া হয়ে কন্যা হয়ে নানা ভাবে প্রকৃতি তাকে অনুনয় করে,—'যেয়ো না, থাকো'। সৌন্দর্য হল প্রকৃতির এই ব্যথিত অনুনয়। সৌন্দর্যের মধ্যে তাই এত বেদনা। তার কাতর বাণী, 'দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ, একটু দাঁড়াও।' এই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি, সংস্কারবশতঃ আমরা তার কাতর বাণী আর শুনতে পাই না, তাকে

* গ্রন্থ-ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

নানাভাবে ব্যবহার করি মাত্র, তাকে অন্তরঙ্গ করি না। কবিদের মনে এই বেদনাটিই রূপ-পরিগ্রহ করে।

আমাদের বড় ত্বরা, একটু দেরী সয় না। তাই সৌন্দর্যকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে দ্রুত চলে যেতে চাই। হৃদয় দিয়ে সৌন্দর্যকে না দেখে তাকে শুধু ব্যবহার বা exploit করাও একরকমের জড়বাদ (materialism)। এই নিষ্ঠুর বধিরতা ও অন্ধতা থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র সৌন্দর্যই।

ছবিকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তুমি কি শুধু পটে আঁকা মানুষের কৃত্রিম রচনা? এই যে তোমার দিকে চেয়ে আমার চিত্তে বেদনা ও চেতনার উদ্রেক হয়েছে সেই তুমি কি শুধু পটের উপরে আঁকা কতগুলি রেখা ও বর্ণ? তোমার মধ্যে আর কি কোনো বস্তু নেই? আকাশের গ্রহ-চন্দ্র-তারার মত কোনো সত্যতা কি তোমাতে নেই?

পাখীর নীড়ে ডিমগুলি থাকে। তা' দিতে দিতে যখন ভ্রূণগুলি ফুটে ওঠে তখন তারাও পাখী হয়ে উড়ে যায়। নদীর চরে ভবিষ্যৎ হংসের ভ্রূণ পরবর্তী পূর্ণজীবনের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। আকাশের সুদূর নীহারিকার নীড়ে যেন এইরূপ সব নক্ষত্র-ভ্রূণ প্রতীক্ষা করছে—কবে তারা হংসের মতো নক্ষত্ররূপ নিয়ে অজানা মানসলোকে যাত্রা করবে। অসম্পূর্ণ হংস হলেও ভাবীযুগের জন্য তাদের সত্যতা প্রতীক্ষা করছে।

ব্যাখ্যা—এই দীপ্ত গ্রহ-তারা-রবির দল যেন অন্ধকার রাত্রিতে মশাল-হাতে তীর্থযাত্রীদের মতো চলেছে। অনন্ত যোজনের মধ্য দিয়ে অসংখ্য যুগ ধরে তাদের যাত্রা। এরা এমনই পরিপূর্ণ সত্য তীর্থযাত্রী। তুমি ছবি কি ভ্রূণের মতোও সত্য নও? জীবন্ত তীর্থযাত্রীর মতোও সত্য নও? হায় তুমি কি শুধু পটে-আঁকা কতগুলি রেখা ও বর্ণের অর্থহীন সমষ্টি মাত্র? (১ম)

জগতের সবাই চলেছে। চিরচঞ্চল সব পথিকের মধ্যে একা তুমিই বসে থাকবে? জগৎ-যাত্রার পথে যারা পথিক হয়ে বেরিয়েছে তাদের সঙ্গে তোমার কি কোনো যোগ নেই? দলছাড়া হয়ে সবার কাছ থেকে নির্বাসিত হয়ে একলা গতিহীন বসে থেকে লাভ কি? সবার মাঝে থেকেও কেন তুমি থাকবে এমন দূরে, স্থিরতার অন্তঃপুরে, বদ্ধ গতিহীন হয়ে?

শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে যা পাই অনেক সময় তা সত্য নয়। যা সত্য তা অন্তরে বাহিরে সর্বকালে পরিব্যাপ্ত। তাই সবরকম ভাবে পেলেই আমরা সত্যকে বিশ্বাস করতে পারি। শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে সৌন্দর্যকে দেখা তো তাকে অপমান

করা। এই নাস্তিকতাই (materialism) আমাদের সহজে পেয়ে বসে। শিল্পী ও কবিরাই আমাদের উদ্ধার করতে পারেন। শিল্পীরা রূপ দেখিয়েই অরূপের কথা মনে জাগিয়ে দেন, কবিরা অরূপের মর্মকথা বলেই রূপের সার্থকতা দেখান। কবি ও শিল্পী কেউ একা পূর্ণ নন। উভয়ে উভয়কে পূর্ণ করে বিশ্বরহস্যের সর্বাঙ্গসম্পন্ন পরিচয় দেন। এঁদের যুক্ত সাধনাতেই আমরা জড়তা ও জড়বাদ হতে মুক্তি পেতে পারি। কাজেই ছবির সার্থকতা আছে। শিল্পীর হাতের এই সৃষ্টি তার পরিপূর্ণতা পাবে কবির হাতে।

একটা প্রশ্ন হতে পারে—এই যে সত্তা, সৌন্দর্যই কি তার মূল, না সৌন্দর্যেরই মূল হল সত্তা? অর্থাৎ জগতে যা কিছু আছে তা কি সুন্দর বলেই থাকবার অধিকার পেয়েছে? না, যা আছে, তা আছে বলেই সুন্দর? এমন করে ভাগাভাগি করে দেখলে চলবে না। বৃহদারণ্যক বলেন, সৎ অর্থাৎ যা আছে, তা আছে বলেই এই রস বা আনন্দ।

[সত্তো হেব রসঃ (২,৩,৪)]

আমাদের ভক্ত সাধকেরা বলেন তিনি আছেন বলে সৎ। আবার সৎ বলেই তিনি আমাদের চিৎ বা চৈতন্যকে জাগান, আর সৎ এবং চিৎ বলেই তিনি আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দই তাঁর পূর্ণ পরিচয়। যেখানে একান্তভাবে সত্তার উপলব্ধি, সেখানেই আনন্দ। এই আনন্দেই সত্যের চিন্ময় ঐক্যকে উপলব্ধি করি।

এই সাধনায় কবির সহায় শিল্পী এবং শিল্পীর সহায় কবি। উভয়ের সাধনা একত্র হলে জগতের সব মোহান্ধকার দূর হতে পারে। কবি ও শিল্পী রূপে হরিহরাত্মা সেই মহাগুরুর কৃপা বিনা সত্যের উপলব্ধি হওয়া কঠিন।

এই যে ধরণীর তুচ্ছ ধূলি, এও ধরণীর আঁচলের মতো হাওয়ায় উড়চে, দিকে দিকে চলেছে। এই ধূলিও কত বিচিত্র সাজে সাজছে ও পৃথিবীকে নানাভাবে মনোরম করে তুলচে। বৈশাখে যখন ফুল শুকিয়ে ঝরে যায় তখন যেন ধরণীও বিধবার মতো তার বসন্তপুষ্প-আভরণ ঘুচিয়ে ফেলে। তখন এই ধূলিই সেই তপস্বিনী ধরণীকে বিধবার গৈরিক পরিয়ে দিয়ে তপস্বিনী সাজিয়ে দেয়। বসন্তের মিলন-উষাতে এই ধূলিই আবার সুন্দরী ধরণীর অঙ্গে পুষ্পপল্লবের পত্রলেখা রচনা করে। এই ধূলির উপরে যে তৃণ, তারা সবার পায়ের তলায় আছে পড়ে। তারাও চঞ্চল। কখনও তারা ম্লান ও শুষ্ক, কখনও তারা নবীন ও উজ্জ্বল। কখনও তারা অঙ্কুরিত, কখনও বা তারা দোলায়িত। এদের মধ্যে গতি-বিকাশ

আছে বলেই ওরা জীবন্ত ও সত্য। তুমি তো স্তব্ধ গতিহীন। তবে কি তুমি ছবিমাত্র, তুমি কি তবে সত্য নও? ধূলি ও তৃণের মধ্যে যে পরিবর্তন ও গতিলীলা তাও কি তোমার নেই? জীবনলোকের মধ্যে তুমিই কি একমাত্র মৃত স্তব্ধ হয়ে রয়েছ? (২য়)

আজ তুমি জীবনহীন হয়ে এই ছবির মধ্যে বদ্ধ হয়ে স্তব্ধ রয়েছ বটে, কিন্তু একদিন তুমিও তো জীবন্ত ছিলে। তখন তুমিও সবার সঙ্গে পথে পথে চলতে, নিঃশ্বাস তোমারও বক্ষে দোলা দিত। চলায়-ফেরায় সুখে-দুঃখে তখন তোমার প্রাণ নিত্য কত বিচিত্র লীলা ও ছন্দ রচনা করেছে। বিশ্বছন্দে ও লীলায় তোমার প্রাণ ছন্দে ছন্দে তখন লীলায়িত হয়েছে। সে আজ কত কালের কথা। আমার ব্যক্তিগত জীবন-জগতে তুমি তখন গভীর সত্য ছিলে বলেই তখন তোমাকে সত্যরূপে জানতে পেরেছিলাম।

যাকে অন্তরে-অন্তরে ভালবাসি তার inspiration বা প্রাণপরশ পেয়েই এই জগৎ সুন্দর। তোমার তুমিত্বের তুলিতে রঞ্জিত হয়েই জগৎ আমার কাছে তখন এমন সুন্দর ছিল। তখন তোমার রসেই নিখিল রসময়, তোমার মাধুর্যেই আমার বিশ্ব সুন্দর ও মধুময় হয়ে ধরা দিয়েছিল। বিশ্বের আনন্দবার্তাকে মূর্তিময়ী বাণীরূপে তুমিই আমার কাছে বহন করে আনতে। নহিলে এই বিশ্ব আমার কাছে মূক ছিল। তখন আমার সব-কিছুর সঙ্গেই তোমার নিবিড় একটি যোগ ছিল। (৩য়)

এক সাথেই তো দুজনে চলছিলাম। হঠাৎ উভয়কে আড়াল করে মাঝখানে প্রাচীরের মতো অন্ধকার রাত্রির মতো দাঁড়াল এসে মৃত্যু। সেই হতে তুমি থেমে গেলে, কিন্তু আমি আজও এগিয়ে চলেছি। দিন-রাত্রিতে সুখে-দুঃখে আমার চলা আর তো থামল না। আকাশ-সাগরে আলো-অন্ধকারের জোয়ার-ভাঁটা নিত্যই চলেছে, তার মধ্যে আমিও দিন-রাত চলেছি। কিন্তু তুমি আর আমার পাশে নেই।

আমার পথের দুধারে ফুলের দল চলেছে। বেলি-কদম্ব-মালতী-শিউলি-বকুলের দল ঋতুর পরে ঋতুতে উৎসব-যাত্রায় নব নব সাজে সেজে চলেছে। নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে এদের গতি অপরূপ গন্ধে ও সৌন্দর্যে ভরপুর। আমার জীবন-নির্ঝরিণী সহস্র ধারায় দুরন্ত বেগে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছুটেছে। মৃত্যুর স্তব্ধতা আমার জীবন-নির্ঝরিণীকে থামাতে পারে নি, শুধু তার চলার নূপুরকে ধ্বনিত করে দিয়েছে। মৃত্যুই প্রাণধারায় এগিয়ে যাবার পথ কেটে দিয়েছে।

মৃত্যুই জীবনকে ছন্দে ছন্দে নানা তারে ঝংকৃত করে নানা দিকে প্রসারিত করে দিয়েছে।

কাল কি হবে জানি না, এর পরে কি রয়েছে তাও জানি না, তবু তাঁর বাঁশি আমাকে কোন্ অজানা সুদূর লোকে ক্রমাগত ডেকে নিয়ে চলেছে। আজ আমার এই পথ-চলাই ভাল লাগছে,—

আমার পথ চলাতেই আনন্দ।

এই চলা ভালবাসি বলেই তো জীবনকে ভালবাসি। তাঁর বাঁশির সুরে জীবনের গতিছন্দে অজানার পানে চলাতেই আমি ধন্য।

তুমিও তো এক দিন আমার সাথে সাথী হয়ে ছিলে। আমরা যখন পথের গতিতে মত্ত তখন হঠাৎ কখন তুমি পথ ছেড়ে নেবে দাঁড়ালে। তারপর আমরা তো ক্রমাগতই চলেছি, কিন্তু তুমি যেখানে নেবে গেলে সেখানেই থেমে দাঁড়িয়ে রইলে।

আজ এই ধূলি এই তৃণ এই রবি শশী সবাই চলেছে, সবার পিছনে তুমি গতিহীন স্তব্ধ হয়ে শুধু ছবি হয়েই রইলে। আমার নিত্য-সচল জীবন-সঙ্গিনীকে হারিয়ে আজ যদি তোমাকে ছবির মধ্যে স্তব্ধ প্রাণহীন রূপে পাই তবে আমার কি কোনো সান্ত্বনা আছে? (৪র্থ)

আমার দৃষ্টি হঠাৎ খুলে গেল। বুঝলাম মিথ্যা প্রলাপ বকছি। তুমি কি শুধু ছবি? কখনও না। কে বলে তুমি রেখার বন্ধনে বদ্ধ শুধু স্তব্ধ ছবি? আনন্দ মাত্রই তো অরূপ চিন্ময়। সেই আনন্দই তো নানা রূপে প্রকাশিত। প্রকাশের জন্যই তাকে সীমাবদ্ধ হয়ে রূপ পরিগ্রহ করতে হয়েছে। আনন্দের সেই সব রূপ-পরিগ্রহ কি মিথ্যা? নদী মেঘ সবই তো আনন্দের মূর্তিমান্ সৃষ্টি। রূপ-সৃষ্টিতে যদি সীমার রেখায় আনন্দ মূর্তিমান্ না হত আর সীমান্বিত বলেই যদি তা মিথ্যা হত তবে নদীর এই আনন্দ-বেগ থাকত কোথায়? তোমার মধ্যে যে আনন্দের প্রকাশ, তুমি যে সৃষ্টির আনন্দকে বাণী দিয়েছ, সে আনন্দ তো থামে নি। তোমার মধ্যে প্রকাশিত সেই আনন্দই তো আজও আমার হৃদয়ে বিশ্বের অমৃতরসকে এনে দিয়েছে।

রূপে রেখায় বস্তুময়ী মূর্তি বলেই যে কেউ আনন্দ দিতে পারে তা তো নয়। বিশ্ব-আনন্দকে বহন করে আনে বলেই সে আনন্দ-রূপ। বিশ্বসৃষ্টির মূল আনন্দের যে বার্তা সে নিয়ে আসছে, তারই সে স্বরূপ। তার মৃত্যু হবে কেমন করে? তবে তো বিশ্বেরই প্রলয় হত।

তোমার চিকণ-চিকুরের ছায়াখানি এখনো বিশ্বভুবনে বর্তমান। তুমি মিথ্যা হলে চঞ্চল-পবনে-লীলায়িত সংগীত-মুখর মাধবী-বনও তোমার চিকুর-লীলার মত লুপ্ত হয়ে যেত। বিশ্বের অন্তরস্থিত আনন্দের যে বাণী তুমি এনেছিলে তা চিরকাল ধরে নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশ করবে। তোমারই কৃষ্ণকেশের ছায়া আজও বিশ্বের নানা রূপের মধ্যে আমার কাছে ঘনিয়ে উঠছে।*

তোমার মধ্যে যে প্রেম আমি পেয়েছি সে কি শুধু কোনো বিশেষ এক ব্যক্তির? সে কি বিশ্ব-প্রেমেরই এক অপূর্ব অঞ্জলি নয়? কূপে উৎসে নির্ঝরে যে নানাবিধ জল পাই তা কি পৃথিবীর অন্তরস্থিত একই অতল প্রাণরসধারার বিচিত্র রূপ নয়?†

তুমিই সেই বিশ্বরসকে আমার কাছে প্রত্যক্ষ করিয়ে গিয়েছ। তোমার কাছেই সেই রস-দীক্ষা পেয়েছি। তাই আজ আমার সকল রস-ভোগে তোমাকেই পাই। তুমি আমায় শুধু আপনাকেই দাও নি। তুমি আমাকে তোমার মধ্য দিয়ে বিশ্ব-আনন্দকে দিয়েছ। কাজেই তুমি আছ।

তুমি কি এতদিন আমার মনের মধ্যে ছিলে না? আজ অন্তরে বিলীন বলেই তো তুমি আর আমার বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নও। তাই ভুল হয়, মনে করি তোমাকে বুঝি হারিয়েছি। আজ তুমি 'অবোধ-পূর্ব' হয়ে আমার অন্তরের চিন্ময় লোকে বাসা নিয়েছ (assimilated), তাই ভুল হয়। আমার নয়নের সম্মুখে না থেকে আজ তুমি আমার অন্তরের গভীর লোকে জীবনের

* তুলনীয়-

তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী
এঁকে গেছ সব ভাবনায়
সূর্যাস্তের বরণ চাতুরী।

—স্মরণ, ১৩

† এখানে তুলনীয় সন্ধ্যাবন্দনার এই মন্ত্রটি—

শং নঃ আপো ধন্বন্যাঃ শমু সন্তনূপ্যাঃ।
শং নঃ খনিত্রিমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ
শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ।

অর্থাৎ, সব জলই আমাদের কল্যাণ করুক—সে জল মরুরই হউক, বা বিলেরই হউক, সেই জল কূপেরই হউক বা পুষ্করিণীরই হউক, তাহা পাত্রস্থিত জলই হউক বা বর্ষার জলই হউক।

মূলে বিরাজিত। আজ আমরা প্রেমে উভয়ে একাত্ম হয়ে গেছি। এর নাম কি হারানো?

যারা আমাকে নিরন্তর চারিদিকে ঘিরে রেখে আমার সকল সত্তাকে চৈতন্যে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিচ্চে, সব সময় কি তাদের কথা সচেতন ভাবে স্মরণ করি? অন্তরের প্রাণের কথা, বাইরের আকাশ ও পবনের কথা কি সব সময়ে মনে আসে? অথচ তারাই আমার সত্তার মূলে। তাদের কথা মনে করি নে বলেই তারা যে নিরন্তর আমার জীবনে কাজ করছে না এ-কথা কখনো সত্য নয়। আকাশের অগণিত তারা সারারাত্রি আমাকে ঘিরে চলেছে। চোখ চেয়ে না দেখলেও তাদের নৃত্যময় সংগীতে ও দীপ্ত আনন্দে আমার মন অলক্ষ্যে নিরন্তর ভরে উঠছে। তাদের কথাও তো মনে থাকে না। তাই বলে কি তারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে?

পথ চলতে চলতে প্রকৃতির ফুলকে মনে করি ভুলেছি। তবু সে কি নিরন্তর তার কাজ করছিল না? আমার প্রাণের নিশ্বাস-বায়ুকে তার সৌরভে মধুময় করে সে নিরন্তরই আমার ভুলের শূন্যতাকে পূর্ণ করেছে। তাতেই আমার অগোচরে আমার সকল 'না-দেখা' পূর্ণ হয়ে উঠছে, আমার ভুলে-যাওয়া মন ভরে ভরে উঠছে।

বাইরের চেতনায় ভুলে গেলেই যে ভোলা হল তা নয়। আমার বিস্মৃতির মধ্যে বিলীন থেকেও তুমি আমার গভীর চিন্ময় জীবনে আনন্দময় ছন্দের দোলা নিরন্তর দিচ্ছ। জানি বা না জানি আমার মর্মের কেন্দ্রে বসে আজ তুমি নিঃশব্দে তোমার কাজ করছ। বস্তুরূপে (objective) আমার কাছে বিদায় নিয়েও চিদ্রূপে (subjective) তুমিই আজ আমায় পরিপূর্ণ করে রয়েছ। এও প্রেমের এক অপূর্ব লীলা। আজ যে বসুন্ধরার শ্যামলতা দেখছি সে তোমারই শ্যামলতা। আকাশ-ভরা এই নীলিমার মধ্যে তোমারই নীলিমা। আজ আমার বিশ্বের আনন্দের মধ্যে তোমারই আনন্দ। আজ তোমাতে আমার নিখিল তার ছন্দের মিল (rhyme) পেয়েছে। আমার গানে যে সুর আজ বাজছে সে সুরও যে তোমারই সুর সে কথা কে না জানে? এতদিন তুমি বাইরে ছিলে, এখন আমার অন্তরে প্রবেশ করে তোমার প্রেরণায় (inspiration) আমাকে ভাবময় কবি করে তুলেছ। তাই তো আমার সংগীত-ধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রেরণা-রূপে আজ তুমি আমার অন্তর-লোকে, সৌন্দর্য-রূপে তুমি আমার নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। তবে কেমন

করে বলি যে তোমাকে হারিয়েছি ? তুমি আজ আর শুধু ছবি নও, তুমি আমার প্রাণে চেতনায় আনন্দে সর্বত্র ভরপুর।

একদিন কোন্ এক শুভ প্রভাতে তোমাকে পেয়ে তারপরে মনে হল যেন রাত্রির অন্ধকারে তোমাকে হারিয়ে ফেললাম। তোমাকে কি কখনো আমি হারাতে পারি ? আলোর জগৎ হতে বিদায় নিয়ে তুমি আমার অন্ধকার জগৎকে অপরূপ লীলায় ভরে দিলে। দিনের পাওয়াই কি বড় পাওয়া ? দিনে আর আমরা কতটুকু দেখি ! রাত্রির অন্ধকারে সেটুকু জগৎ আমরা হারাই বটে, কিন্তু অগণিত গ্রহচন্দ্রতারায় তখন অসীম লোক আমাদের কাছে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। না জেনে অন্ধকারের মধ্যে কী-গভীর-করে তোমায় পেলাম ! এখন তোমাতে আমার বিশ্ব চরাচর দীপ্যমান, আমার বিশ্ব নিখিলে তুমিই পরিপূর্ণ রূপ। আজ আর তুমি আমার কাছে শুধু ছবি নও, আজ তুমি আমার বিশ্ব চরাচর। (৫ম)

৭নং

এ-কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,……*

১৩২১ সালের ১৫ই কার্তিক এলাহাবাদে লেখা। এর পূর্বের কবিতাটিতে নিজের মনের বেদনার কথাই প্রকাশ করেছি, এটাতে শা-জাহানের বেদনার প্রতি আমার অন্তরের দরদটি (sympathy) জানিয়েছি। 'বলাকা'তে কতগুলো কবিতা আছে যাতে আমার পক্ষে stanza ভাগ করা সম্ভব হয় নি। অন্তরের কথা একেবারে একস্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, মাঝখানে হয়তো একবার মাত্র একটু দম নিয়েছি। এটা সেই শ্রেণীর।

গতিই জগতের মূল সত্য। এই গতি আছে বলেই কোথাও কোনো মলিনতা জমতে পারে না। জমলেই তখন মৃত্যু এসে সব ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দিয়ে যায়। মৃত্যু ছাড়া জগতের শুদ্ধি থাকে না। কাজেই মৃত্যু অপরিহার্য। অথচ মৃত্যুই সব বিচ্ছেদ ও বেদনার মূলে। শা-জাহানের সেই মৃত্যু-বেদনার প্রকাশ এই তাজমহল। এই অপূর্ব রচনার দ্বারা তিনি মনের এই ঘোষণাটি রেখে যেতে চান—'ভুলি নাই, ভুলি নাই।' মৃত্যুর বাধা সত্ত্বেও

* গ্রন্থ-ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ভুলি নাই, এই কথাটিই যেন চিরদিন থেকে যায়।— এই স্মৃতি-বেদনার মূলে প্রেম রয়েচে বলেই তার গৌরব। প্রেমের সেই গৌরবেই তাজমহল ধন্য। শা-জাহানের সাম্রাজ্যও এই গৌরব দাবি করতে পারে না। শা-জাহানের প্রেম-বেদনাই তাজমহলকে সত্য করে তুলেছে, নহিলে তাজমহল তো একটা বহুমূল্য পাষাণ-স্তূপ মাত্র, তা তার মধ্যে যত রচনা-কৌশলই থাক না কেন।

ব্যাখ্যা—শা-জাহান, তুমি জানতে যে জীবন-যৌবন-ধনমান সবই মিছে, কালের স্রোতে সব ভেসেই যায়। অথচ তুমি জানতে তোমার অন্তরের প্রেমটিই সত্য, তাই তোমার প্রেম-বেদনাও সত্য। সেই অন্তর-বেদনাকেই তুমি চিরন্তন করে রাখতে চাইলে। শক্তিকে উপেক্ষা করে প্রেমকেই তুমি কাল-জয়ী করতে চাইলে। শক্তিকে যদি চিরস্থায়ী করে রাখতে চাইতে তবে তারও বহু ক্ষেত্র ও উপায় ছিল। কিন্তু শক্তির চেয়ে প্রেমকেই তুমি চিরন্তন ও মহনীয় বলে জেনেছিলে। তোমার রাজশক্তিকে লোকে যতই বজ্র-কঠিন মনে করুক তুমি জানতে সন্ধ্যাকাশের বর্ণচ্ছটার মতো তা অবাস্তব। তোমার রাজশক্তি কালের স্রোতে ভেসে যায় যাক্, কিন্তু তোমার মৃত্যুহীন প্রেম-বেদনার দীর্ঘশ্বাসটি যাতে মূর্তিমান্ হয়ে থাকতে পারে তাই ছিল তোমার মনের ব্যাকুল কামনা।

মণি-মাণিক্যের ঘটা যেন রিক্তহস্ত যাদুকরের মায়া। ওই সব রাজশক্তির মায়া যদি লুপ্ত হয়ে যায় তবে যাক্। শুধু এই তাজমহলখানি কালের কপোল-তলে একবিন্দু অশ্রুজল হয়ে চিরকাল টলটল করতে থাকুক। এ তো আর মায়া নয়, এর মূলে যে প্রেম রয়েছে।

কালস্রোতে অবশ্য নিরুপায় হয়ে আমরা এগিয়ে যেতে বাধ্য। প্রেম চায় প্রিয়জনের দিকে ফিরে চাইতে, কিন্তু তার জন্য অবকাশ কৈ? জীবনের খরস্রোতে আমাদের শুধু ঘাট হতে ঘাটে ধাওয়া করে যেতে হয়, একঘাটে নৌকা বোঝাই করে অন্য ঘাটে খালি করে দিতে হয়। মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় এসে হয় উপস্থিত। বসন্তের মাধবী আসতে না আসতেই তার পরমায়ু যায় ফুরিয়ে। মাধবী যায় তো যাক্, তার হয়ে গেল তো গেল। আবার কুন্দফুলে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি সাজানো চলুক। হায়, এতেও কি শিক্ষা হল না? আবার নতুন করে সৌন্দর্যের অর্ঘ্যপাত্র সাজানো! আবার নতুন আয়োজন!

এটা মানুষকে লক্ষ্য করেই বলা। প্রকৃতি একটা রূপক মাত্র। মানুষ যখন

একটি বিদায়ের বেদনায় কাতর, তখনই আবার তাকে নতুন মিলনের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। বসন্ত হতে শরৎ-হেমন্ত, হেমন্ত হতে বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ক্রমাগতই চলেছে। দাঁড়াবার সময় নেই, সঞ্চয়ের সময় নেই। স্থিরতা কই?

কিছুই তো রাখা যায় না, তাই তোমার শঙ্কা, কেবলই হারাবার ভয়। তাই তোমার হৃদয় চেয়েছিল সৌন্দর্য দিয়ে নিষ্ঠুর কালের হৃদয় ভুলিয়ে যদি তাকে একটুখানি দাঁড় করানো যায়। কালের হৃদয় ভোলাবার দাবি সৌন্দর্যেরই আছে। Keats তো বলেছেন—A thing of beauty is a joy for ever. সেই ভরসাতেই তুমিও চেয়েছিলে তাজমহলের সৌন্দর্য-মালা গলায় দিয়ে মহাকালকে বরণ করে সৌন্দর্য-ব্যাকুলতায় ভুলিয়ে তাকে আপন করে স্থির করে নিত্য করে রাখতে।

মরণই তো কাল। তার তো রূপ নেই। সেই রূপহীন মরণকে মৃত্যুহীন অপরূপ সৌন্দর্য দিয়ে তুমি বরণ করলে। কান্নার অবকাশ কই? তাই সৌন্দর্যের নীরবতায় অশান্ত ক্রন্দনকে নিত্য করে বাঁধলে। প্রেমের যে গোপন নামে তুমি নিভৃত মন্দিরে তোমার প্রেয়সীকে ডাকতে সে-নাম তো আর কেউ জানে না। সেই-নামে কানে-কানে-ডাকাটুকুই তুমি এইখানে রেখে গেলে। শুধু প্রেয়সীর কানের জন্যই যে-নামটি ছিল সেই নামটি অনন্তের কানে রেখে গেলে। প্রেমের করুণ কোমলতা স্থির-নিশ্চল কঠিন পাষাণে ফুটল বটে তবু প্রেম তার সজীব কোমলতাটুকু হারাল না। প্রেমের চিরপরিবর্তনশীল কোমলতা সৌন্দর্যের সুকুমার মঞ্জরী হয়ে কঠিন পাষাণেও নিত্য হয়ে ফুটল।

মর্ত্যলোক হতে বিরহী যক্ষ নিজের অগম্য স্বর্গলোকে একদিন মেঘকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন। কবির সেই মেঘদূত যেমন মন্দাক্রান্তা ছন্দে অগম্য অলকাপুরীর দিকে উড়ে যেতে পেরেছিল, তেমনি হে সম্রাট্, তোমার অরূপ প্রেমের এই সরূপ সৃষ্টিটি সৌন্দর্যের ছন্দে অনন্তলোকের দিকে যাত্রা করেছে। এই প্রেম-মন্দিরের বাণীও অপূর্ব ছন্দে ও গানে মেঘের পথে যাত্রা করে সেই অলক্ষ্যের পানে চলেছে, যেখানে তোমার বিরহিণী প্রিয়া আকাশের নব নব সৌন্দর্যে মিলিয়ে আছে। সেই করুণ সৌন্দর্য ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে বিলীয়মান।

উষায় সন্ধ্যায় নিশীথে পূর্ণিমায় খণ্ড-চন্দ্র-কিরণে তাজমহল নব নব শোভায় শোভিত। তাজমহল যে তোমার প্রেমের বার্তাবহ। সে উষার আকাশে প্রদোষের আকাশে নব নব সুরে ও রাগে নিত্য নব প্রেম-বাণী বলে।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় দৃষ্টির অতীত হয়েও চামেলি যেমন তার সুগন্ধে হৃদয় ভরে দেয়, তেমনি আজ তোমার প্রিয়া দৃষ্টির অতীত হয়েও হৃদয় ভরে ভরে দিচ্ছে।

পূর্ণিমার শুভ্রতায় চামেলি আজ আপন শুভ্রতা মিলিয়ে দিয়েছে। অশরীরী চামেলির করুণ লাবণ্য আজ পূর্ণিমার লাবণ্য-বিলাসকেও আপন মৃদু সৌরভে করুণ করে দিয়েছে। অপরূপ সেই প্রেমলোক হতে দর্শনভিক্ষু নয়ন ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে ফিরে আসে।

প্রেমের এই সৌন্দর্যলোকে ভাষা তো পৌছয় না। সেই অরূপলোক-বাসিনীকে দেখতে চক্ষু অক্ষম। যক্ষ যেমন আপন অগম্য অলকাপুরীতে সর্বত্রগামী মেঘকে পাঠিয়েছিলেন, তেমনি ইন্দ্রিয়ের অগম্য লোকে সম্রাট্ সৌন্দর্যের দূতকেই পাঠালেন। সর্বলোকেই সৌন্দর্যের অব্যাহত প্রবেশ। 'ভুলি নাই ভুলি নাই' এই বাণী নিয়ে প্রেমের এই দূত যাত্রা করল। কাল তাকে ঠেকাতে অক্ষম। তাই 'ভুলি নাই' এই বাক্যহীন বার্তা যুগ যুগ চলেছে। এই সৌন্দর্য কালের হৃদয় হরণ করে নিত্য-বার্তা হয়ে রইল। কালের হস্ত অতিক্রম করে এই সৌন্দর্যদূত সেই অশরীর অবিগ্রহ প্রেমবার্তাকে নিত্যকাল বহন করে চলল।

হে সম্রাট্, তোমার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের মতো তোমার রাজ্যও কোথায় উড়ে গেছে। তোমার শক্তির যত দূত ছিল সবাই আজ কোথায় চলে গেছে। বন্দীদের গান, তোমার ভোগ্য পুরসুন্দরীদের নৃত্য, সবই শেষ হয়ে গেছে। শুধু যে সৌন্দর্য ছিল তোমার অভোগ্য, সেই পবিত্র সৌন্দর্যই নিত্য হয়ে রয়ে গেল। তোমার ঐশ্বর্যের ও ভোগের সহায়গণ যে যার বিদায় নিয়ে গেছে। শুধু অম্লান শ্রান্তিহীন তোমার এই সৌন্দর্যদূত তোমার প্রেমবার্তা নিয়ে আজও চলেছে। রাজ্য আসে রাজ্য যায়, কিন্তু তার 'ভুলি নাই ভুলি নাই' বাণী নিরন্তর এই আকাশে ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

মিছে কথা। কে বলে যে ভোলো নাই? স্মৃতির পিঞ্জর খুলে কোন্ কালেই তুমি বাহির হয়ে গেছ। অতীতের চির-অস্ত-অন্ধকারের মধ্যে কি তোমার হৃদয় আজও বদ্ধ আছে? মুক্ত পথের পথিক তোমার হৃদয়ও কি বিস্মৃতির পথে বাহির হয়ে যায় নি? এ তো সমাধি-মন্দির মাত্র। মৃত্যুর এই মন্দিরে আজ হৃদয় কোথায় আছে? এই মন্দির মৃত্যুকেই যত্নে আচ্ছাদন করে রাখতে পারে, জীবনকে ধরে রাখতে পারে কি? পুরুষ-প্রকৃতি-লীলায় করুণ এই বিশ্বজগতে কোনো দিন আত্মাকে কি কেহ বেঁধে রাখতে পেরেছে?

'যেতে নাহি দিব' বলা বৃথা, দেবযানী কচকে কবে বেঁধে রাখতে পেরেছে? নিত্যকাল লোকে লোকান্তরে যে সেই পথিকের নিমন্ত্রণ। অতীতের চির-অন্ত-অন্ধকারে বদ্ধ হয়ে সে স্থান-বিশেষে থাকবে কেমন করে? স্মরণের বন্ধন না ছিন্ন করলে বিশ্বপথে জীবন তার মুক্ত গতি পাবে কেন?

মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;—

এখানে শা-জাহানকে লক্ষ্য করে 'মহারাজ' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। মানব-জীবনকে সম্বোধন করে এখানে 'মহারাজ' বলা হয়েছে। মানব-জীবনের যে অপার মহিমা তাই বোঝাবার জন্য তাকে মহারাজ বলা হয়েছে। সেখানে শা-জাহানও মানব-জীবনের অসংখ্য প্রতিনিধিদের একজন মাত্র। তাঁর সেই মানবত্ব তাঁর সম্রাটত্বের চেয়েও মহত্তর।

মহারাজ, তোমাকে বাঁধবে কে? উৎসব-শেষে মৃৎপাত্রের মত এই পৃথিবীর উৎসব শেষ করে এই ধরাকে পায়ে ঠেলে তুমি চলে যাও। দেহের পর দেহ অতিক্রম করে আত্মা প্রমাণ করে দেয় যে দেহের চেয়ে সে মহত্তর। কীর্তিকে অতিক্রম করেই তুমি বুঝিয়ে দাও যে কীর্তির চেয়ে তুমি বিরাট্। তোমার কীর্তিকে ফেলে তুমি চলে গেছ, তাই তুমি আজ আর এখানে নেই।

যে প্রেম মোহবশতঃ স্থানে বা কালে আবদ্ধ, যে প্রেম অচল থাকে (static) ও অচল করে রাখে, সে চেয়েছিল পথের মধ্যে সিংহাসন পেতে বসে বিলাসের সম্ভাষণে তোমার পায়ে জড়িয়ে ধরে রাখতে। কিন্তু পা হল চলবার-ই জন্য, তাকে বাঁধতে যাওয়া তো তার উচিত ছিল না। কাজেই সেই বাঁধনে যে তুমি বদ্ধ হও নি সে ভালই হয়েছে। প্রেমের সেই বিলাসলীলা আজ ধূলার মধ্যে মিশিয়ে গেছে।

প্রেম-বিলাস তোমাকে ধরে রাখতে পারে নি বটে, কিন্তু পথের ধূলা তোমার জীবন-মাল্য হতে উড়ে-পড়া বীজকে প্রাণের অংকুর করে ফুটিয়ে তুলেছে। পথে যেতে যেতে তোমার জীবন-মাল্য হতে যে জীবন-বীজ খসে পড়েছিল তা তো মরবার নয়। ধূলায় পড়ে সেই বীজ অংকুরে উদ্গত হয়ে উঠল। যেদিন প্রেমলীলা তার বিলাস ছেড়ে দীনহীন পথের ধূলা হতে পারে সেদিন সে জীবনের বীজকে ফুটিয়ে তোলবার অধিকার পায়। তখন সেই নব-উদ্গত জীবন আকাশ-পানে বহু উর্ধ্বে উঠে চারিদিক দেখে করুণ গম্ভীর সুরে বলে,

নিদ্রায় অসাড় হয়ে পড়ে আছি, কিন্তু তোমার ধারা নিরন্তর চলেছে। অব্যক্ত সৃষ্টির উপর ব্যক্ত সৃষ্টি স্পন্দিত। তার ভীষণ কায়াহীন বেগে শূন্য আকাশ শিউরে উঠচে। বস্তুহীন কালের বা সৃষ্টির আলোড়নে পুঞ্জপুঞ্জ বস্তু-ফেনা জেগে ওঠে। ধাবমান অদৃশ্য সৃষ্টি হতে দৃশ্য সৃষ্টির তীব্রচ্ছটা বর্ণস্রোতে বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে। বেগের আবর্তনে সূর্য-চন্দ্র-তারার দল বুদ্বুদের মত এক একবার দেখা দিয়েই প্রলয়-পয়োধি-জলে যাচ্চে মিলিয়ে।

তোমার চলবার পথে কে বাঁচল, কে মরল, কার সুখ, কার বেদনা, সেদিকে তোমার দৃক্‌পাত মাত্র নেই, তাই তুমি ভৈরবী, অনাসক্ত হয়ে তুমি নিরন্তর চলেছ। কে তোমাকে বাঁধবে? অনন্তের পথে সন্ধ্যাকালীন নিরুদ্দেশ-অভিসারের এই গতি-সংগীতই তোমায় রাগিণী। সেই সুরের শব্দ নেই। কার দিকে তুমি চলেছ? কে তোমাকে ডাকে? অন্তহীন দূরের ডাক কি নিরন্তর তোমার কানে আসচে? কেমন সেই সর্বনাশা প্রেম, যার ডাকে সর্বচরাচর আপন সর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে ছুটে চলেচে, পত্র-মুকুল-ফুল-ফল-বীজ সব ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে? তাই কেউ স্থির হয়ে ঘরে থাকতে পারল না।

সেই উন্মত্ত অন্ধকারে তোমার গতির ছন্দে গ্রহতারকাময় তোমার বক্ষোহার ঘন ঘন দুলচে আর দীপ্যমান নক্ষত্রের মণিপুঞ্জ ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্চে। নীহারিকার মধ্যে ঝড়ের মত বিক্ষিপ্ত তোমার কেশপাশ এলিয়ে ছুটেছে। কি অপরূপ বিরাট্‌ অভিসারে তুমি নিরন্তর চলেছ ধেয়ে! কি সর্বনাশা সেই প্রেম যে একটু দাঁড়াবারও সময় নেই? সব ফুল ফল ছড়িয়ে চলেছ, তোমার কণ্ঠহার হতে পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রের মণি ঝরে ঝরে পড়চে,—দাঁড়াবার জো নেই!

নিরন্তর তুমি চলেছ। শুধু ধেয়েই চলেছ। এখন কোনো এক মুহূর্তে যেখানে আছ সেইখানে আর অনন্তকালে কখনও তুমি ফিরে আসবে না। ফিরে আসবার (retrace করবার) তোমার উপায় নেই। পথ চলার বিপুল আনন্দে সব পাথেয় উড়িয়ে লুটিয়ে দিয়ে তুমি নিরন্তর ধেয়েই চলেছ। তার জন্য কোনো শোক বা ক্ষতিবোধ নেই। পথের আনন্দবেগে সব পাথেয় ক্ষয় করে ধ্বংস করে চলাই তোমার যাত্রার উৎসব।

রিক্ততাতেই এই যাত্রার পূর্ণতা। এই যে ফাল্গুনে ফুলে-ভরা তোমার ডালি, এই যে আম্রপল্লবে-ভরা তোমার থালা, এসব তুমি কখনো জমিয়ে রাখ না। তাই কিছুই পচে না, বিকৃত হয় না। তাই সবই পবিত্র। অচলতার সঞ্চয়ই হল বিকার। যা কিছু আমরা ভোগ্য ও ব্যক্তিগত মনে করে বেড়া দিয়ে

সঞ্চিত করে রাখি তা-ই বিকৃত হয়ে ওঠে, ভোগ্য বস্তুর সঞ্চয় বলেই তা অপবিত্র। যে অনাসক্ত রিক্ত হয়ে নিরন্তর চলতে পারে সে-ই তো সদা শুচি ও সুন্দর। সঞ্চয় হল মহাকালের কাছে ব্যর্থ ছেলেখেলা। বালুর ঘরে শিশুর খেলনা সঞ্চয় করার মত তার কোনো অর্থই নেই। বিশ্বগতির ঝড়ে সেসব কোথায় যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে! গতির মধ্যে যে সংগতি (harmony) তাই হোলো 'পরমত্ব' (perfection)। বোধগম্য করবার জন্য এই সচলতাকে স্তব্ধ অচল মনে করি বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে সত্যিই যদি তা অচল হয় তবে তা মৃত্যু বই আর কিছু নয়। চলতে চলতে এই যে ঝরা, এই যে ক্ষয়, নব জীবনের ঐশ্বর্যে তা পূর্ণ হয়ে উঠছে। তোমার গতির বেগে সব ভরে ভরে উঠছে, প্রাণের বেগে মৃত্যুও জীবন্ত হয়ে উঠছে।

অনাসক্ত তোমার সদাগতিকে নিষ্ঠুর বলে গাল দিতে পারি বটে, কিন্তু সেই গতি থামলে এই বিশ্বজগতে কি দুর্গতি উপস্থিত হত সে-কথা কি ভেবে দেখেছি ? তুমি একটু থেমে দাঁড়ালেই সচল বিশ্ব অচল হয়ে ভয়ঙ্কর এক বস্তুর কঠিন বাধা রুদ্ধপ্রাচীর হয়ে খাড়া হয়ে উঠবে, বেগে চলন্ত ট্রেনের গতি হঠাৎ কোনো সংঘর্ষে বা বাধায় আঘাত পেলে যেমন হয়। যদি বিশ্বপ্রবাহ বন্ধ হয় তবে শূন্য একেবারে উচ্ছ্রিত বস্তুপুঞ্জে ভরে ঠেসে উঠবে।

আমরা পৃথিবীর মহত্বই জানি, পৃথিবী আমাদের আশ্রয়। কিন্তু পৃথিবীর উপরে এই যে শূন্য অন্তরীক্ষ তার মহত্ব ভাল করে জানি কি ? এই শূন্য না থাকলে আমাদের দেখা-শোনা, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে প্রাণবায়ু নেওয়া-দেওয়া সব বন্ধ হয়ে যেত। আমাদের এই প্রাণময়ী পৃথিবী নিরেট মাটি চাপা পড়ে একটা মৃত্যুর গোরস্থান হয়ে উঠত। অচল মৃত্যুই সকলকে একেবারে ঠেসে চেপে মারত।

এখন যে মৃত্যু তা তো ভয়ঙ্কর নয়, কারণ তা সচল। সে তো কাউকে বাধা দেয় না, কাউকে আপন ভারে ঠেসে চেপে মারে না। সে থামলেই একটা ভীষণ পঙ্গু বস্তুভারে স্থূল বাধা প্রলয়ংকরী হয়ে উঠত। সে তবে সব জগৎ সংসারকে ঠেকিয়ে আপন স্থূলতার বিষম জড়ভারে ঠেসে চেপে মারত।

চলেছে বলেই নিখিল প্রবাহ ভারহীন সহজ সুন্দর। কিন্তু থামলেই সঞ্চয়ের ভারে তার সহজ স্বাস্থ্যটুকু নষ্ট হয়ে অচলতার বিকৃতিতে সব পচে উঠত। আমাদের শরীরের মধ্যে রস রক্ত খাদ্য পানীয় প্রভৃতির যে সহজ ধারা চলেছে হঠাৎ যদি তা রুদ্ধ হয়, তবেই দারুণ বিকারে শরীর দুঃসহ শূল-বেদনায়

বিপর্যস্ত ও বিপন্ন হয়ে ওঠে। গতিরুদ্ধ হয়ে গেলে বিশ্বজগৎও ভীষণ শূলের দুঃসহ বেদনায় বিদ্ধ হয়ে মরত। অণু পরমাণুও থামলে ভয়ঙ্কর। তীক্ষ্ণ বলেই সূচীর আঘাত মর্মমূলে গিয়ে বিদ্ধ হয়ে বিষিয়ে তোলে। বিশ্বও থেমে গেলে একদিকে তার বিপুল মৃত ভারে ঠেসে মারত আর একদিকে তীক্ষ্ণ সূচীবেধের বেদনায় ব্যাকুল করে দিত। তাকে বিশ্বজগতের শূল-বেদনাই বলা চলে।

(এতক্ষণ 'না'-এর দিকটাই (negative) বলা হল, এখন 'হাঁ'-এর দিকটা (positive) বলি। পূর্বেই বলেছি তুমি বৈরাগিণী ভৈরবী। চলার পথে কত যে সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু, কিছুতেই তোমার আসক্তি বা বেদনা নেই। নিষ্ঠুর তোমার এই চলা। আবার এই চলাতেই তোমার সৌন্দর্য। জলের (অপ্) মত নেচে গেয়ে যারা চলে তারাই তো অপ্সরা। তোমারও গতির ছন্দে ও রাগে অপ্সরার অপূর্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্য। শিল্পী ও গুণীদের কাছে তাই তোমার এত মহত্ত্ব। অপূর্ব ছন্দোময়ী গতিতে নিরন্তর চলেছ বলেই তুমি সুন্দরী চঞ্চলা অপ্সরী। তোমায় না দেখলেও তুমি অলক্ষ্য সুন্দরী। তোমার নৃত্যধারার মন্দাকিনী-প্রবাহে নিরন্তর বিশ্বজগৎকে তুমি শুচি ও সুন্দর করে চলেছ। তোমার গতিবেগেই এই অসীম আকাশ নির্মল নীল পবিত্র।

হে কবি, তোমার মনেও আজ বিশ্বজগতের গতির বেগ লেগেছে। যে অদৃশ্য নটী এই বিশ্ব-চরাচরে নৃত্য করে চলেছে, তাকে দেখতে না পেলেও তার কটিতে যে এই দৃশ্যমান ভুবনগুলি মেখলা-শিঞ্জনিকার মত শিঞ্জিত ও বিচ্ছুরিত হচ্চে তার ধ্বনিতে ও ছটায় তোমার মনও উতলা হয়ে মেতে উঠছে। হে কবি, আজ যে সপ্তসাগরের নদ-নদী-নির্ঝরিণীর বায়ুর অরণ্যের সর্ববিশ্বের নৃত্য-তরঙ্গ তোমার নাড়িতে নাড়িতে রক্তের ব্যাকুল ছন্দে বাজচে কেমন করে, কেউ কি তা জানতে পারে?

স্তব্ধ হয়ে বসে যেন কোন্ অনাদি কালের কথা আজ মনে পড়চে। আজ তো আমি বসে আছি কিন্তু মনে মনে ভাব্‌ছি 'এলাম কোথা হতে?' নির্ঝরের মতো প্রপাত হতে প্রপাতে স্খলিত হতে-হতে, রূপ হতে রূপে প্রাণ হতে প্রাণে নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়তে-পড়তে যে ধেয়ে চলেছি, ভাবচি আমার আদি মূল কোথায়? এর অবসান যে কোথায় সে-খবরও কি কিছু জানি?

শুধু জানি এক যুগের শিখর হতে অন্য যুগের শিখরে ঝরতে ঝরতে কত যুগযুগান্তর পার হয়ে আজ এইখানে (point) এসেছি। পথে কত গান কত প্রাণ যে বিলিয়ে দিতে দিতে এসেছি! সেসব তো সঞ্চিত করে বয়ে চলবার

জো নেই। রাত্রে দিনে যা পেয়েছি সবই নানা দানে নানা গানে লুটিয়ে দিতে দিতে হাল্‌কা হয়ে সহজ হয়ে চলেচি, কিছুই সঞ্চয় করে রাখি নি।

সেই বিশ্বগতির ছন্দই যেন আজ সুরে বেজে উঠেছে। 'ভৈরবের সুরে বৈরাগী বলচে, 'চলো চলো'। আজ যেন আমার জীবনতরণী অজানার পানে ভেসে যেতে ভয় পাচ্চে।* কিন্তু কিসের ভয়, কেন ভয়? 'হে আমার জীবন, মনে কি আছে তোর জীবনে কতবার কত কিছু ফেলে ফেলে এসেছিস্‌। এবার কেন তোর এত সংশয় এত ভয়? কেন এখন বিদায়-কালে জীবনসাগরের তীরের উপরে সঞ্চিত ও স্তব্ধ বৈভবের দিকে ফিরে ফিরে দীনের মত তাকাস্‌?'

আলোচনা—সৃষ্টি অর্থই গতি। তাতেই ভগবানের অনুভূতি। এতেই তিনি আপনাকে প্রকাশিত করচেন, নইলে কোথায় তাঁর প্রকাশ? তাঁর প্রকাশের মাহাত্ম্যেই সব গতিকে মনে হচ্চে শান্ত। এই যে গ্রহচন্দ্রতারার এত প্রচণ্ড গতি, সবই মনে হয় শান্ত। গতির মধ্যেই এই শান্তির বোধ। উপনিষদের 'শান্তম্‌'-এর মর্ম এইখানে।

সর্বচরাচর নিরন্তর চলেছে সত্য, কিন্তু সেই গতির উপরে বিরাজমান এক অপরূপ সংগতি (harmony)। তা-ই তো পরমত্ব (perfection)। এই পরমতাই সব গতিকে অর্থ দিচ্চে ও তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করচে। এই গতির মধ্যেই শান্তি। তাতে কোনো বিরোধ নেই।

শংকরাচার্য ব্রহ্মকে স্থির ও গতিকে মায়া বলেছেন। কিন্তু উপনিষৎ তো এমন কোনো ভাগাভাগি করে বলেন নি। উপনিষদের কাছে কোনো বিরোধ নেই। তাঁরা বল্লেন—'তা-ই চলে, তা-ই চলে না'।

[তদেজতি তন্নৈজতি। (ঈশ, ৫)]

আপনাকে প্রকাশ করা ছাড়া সত্যের অর্থই হয় না। প্রকাশ না থাকলে আর সত্তা কি? এই কবিতা রচনার দিন আমার মন সূর্যচন্দ্রতারার সঙ্গে যাত্রা করেছিল। কী নিবিড় সত্য সেদিন আনন্দ হয়ে আমাকে ধন্য করেছিল। বিশ্বনৃত্যমন্দাকিনীর স্নানে সেদিন শুদ্ধ শুচি হয়েছিলাম।

তুলনীয়—

আমার চৌদ্দ পোয়া নৌকাখানি
ভাসলো কত সাগরজলে
এখন ডোবার জলে টানাটানি।

—বাউল গান

এই প্রত্যক্ষ সৃষ্টির আনন্দ পাবার জন্যই আমার মন-বলাকা সেই মানস-লোকে গিয়ে মানস-সরোবরে ধন্য হয়ে মন্দাকিনী-ধারায় পবিত্র হয়ে বার বার এই উপলব্ধিটি পেয়ে ধন্য হতে চায়। এ আনন্দ প্রকাশের আর কোনো ভাষা নেই।

আমার কাছে সেদিন আর রূপ-অরূপের কোনো বাধা ছিল না, যুগ-যুগান্তরের পরদা আমার দৃষ্টি হতে সরে গিয়েছিল। সেদিন আমি বলতে পেরেছি, 'তোমার কল্যাণতম যে রূপ, আজ তা আমার কাছে দীপ্যমান প্রত্যক্ষ। এই বিশ্ব-চরাচরে যে পুরুষ আমার মধ্যেও সেই পুরুষ, কোনো বাধা নেই কোনো ভেদ নেই।'

[যত্তে রূপং কল্যাণতমং
তৎ তে পশ্যামি।
যোসাবসৌ পুরুষঃ
সোঽহমস্মি ॥ (ঈশ, ১৬)]

৯ নং

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ।...

৭ নম্বর ও ৯ নম্বর কবিতার মাঝখানে আট নম্বর কবিতা এসে পড়েছে। সাত নম্বরের ভাবের সঙ্গেই নয় নম্বরের ভাবের যোগ, কিন্তু তাদের মাঝখানে বিশ্বগতির এমন একটা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এল যে তাকে উপেক্ষা করে আর এগিয়ে যাওয়া চলল না। তাই মাঝে আট নম্বর কবিতাকে স্থান দিতেই হল।

আট নম্বরের কবিতার সম্রাট্ একটি ভাবকে (idea) জীবন্ত করে রেখে দিতে চান। সম্রাট্ চলে গেছেন কিন্তু তাঁর idea রেখে গেছেন। তাঁর জীবনের মাল্য হতে ভ্রষ্ট একটি বীজ পথের ধূলায় পড়ে অমর অংকুরে আকাশের পানে উঠেছে। সেই অমর অংকুর, সেই ideaকে এই কবিতায় আরও একটু বিশদ করা হয়েছে। সেই idea কেন অমর হল? আজ সেই সম্রাট্ও নেই, বাণীও নেই, স্মৃতিও নেই, তবে অমরত্ব আজ রয়েছে কাকে আশ্রয় করে?

ব্যাখ্যা—হে পাষাণ, তোমাকে অমরত্ব দিল কে? কে তোমাকে নিত্যকাল

অমৃতরস যোগাচ্ছে ? তোমাতে অমৃতরস রয়েছে বলেই ধরণীতে আনন্দ-মঞ্জরী ফুটেছে। তার মধ্যে যে অমৃত তা দেবলোকেরই পেয়। তাই দেবলোকের দিকেই অমৃত-পাত্রের মত তাকে তুলে ধরেছে। তার মৃত্যু নেই। তাকে ঘিরে পৃথিবীর যত ক্ষণস্থায়ী আসা ও যাওয়ার বিদায়-বেদনা। বসন্ত গেছে কিন্তু তার বিদায়-বেদনার দীর্ঘ নিশ্বাস এখনো থামল না। দীপ ম্লান হয়ে আসে, চক্ষু ক্লান্ত হয়, কিন্তু তুমি অম্লান অক্লান্ত। হে পাষাণ, তোমাতে কেন কিছুরই অবসান নেই ?

শুক্তিকে বিদীর্ণ করে যেমন মুক্তাকে মানুষ বের করে আনে, তেমনি বিরহী সম্রাট্ শোক-বিদীর্ণ হৃদয় হতে মুক্তার-আকারে-পরিণত বিরহের অশ্রুবিন্দুখানি বের করে বিশ্বজনের হাতে দিলেন। অন্তরের বিরহকে মুক্তার মত ফুটিয়ে তুলে সবার সাক্ষাতে রাখলেন। এখন তা বিশ্বের সম্পদ্। আর তাকে রক্ষা করবার দায় সম্রাটের নয়।

রাজপ্রহরীরা সম্রাটের রাজকোষকে রক্ষা করচে। কিন্তু বিরহ-রত্নকে তারা রক্ষা করবে কেন ? এখন যে তা বিশ্বজনের ধন। অবারিত প্রকৃতির মাঝে সম্রাটের এই বিরহ-রত্নটি নিরাপদেই সুরক্ষিত। বিশ্ব-প্রকৃতির দশদিক্ তাকে স্নেহ-আলিঙ্গনে ঘিরে চিরদিন সযত্নে রক্ষা করবে। প্রভাত-অরুণালোকে দেখা যায় তারই রক্তরাগ। প্রকৃতি তার প্রথম মিলনের প্রেমবাণী তাকেই দিচ্চে। বিবাহ-রাত্রির-রক্তাংশুকে-মণ্ডিত প্রথম-অনুরাগ-লজ্জারুণা প্রকৃতি তার কানে কানে কি যেন বলচে। আবার জ্যোৎস্না-যামিনীর ম্লানরুচি পাণ্ডুরাগে মনে হয় শুভ্রবসনা বিধবা প্রকৃতি তার কানে কোন করুণ কাহিনী বলচে। কেন প্রকৃতি নানা সময়ে নব নব রাগে বিচিত্র রস তার অন্তরে সঞ্চার করচে ? কেন তার উপর প্রকৃতির এত দরদ ? সবার উপর তার এত দাবি কেন ? তাকে যে সম্রাট্ সকলের ধন করে রেখে গেছেন। এখন সে সবার অন্তরঙ্গ, বিশ্বজনের সে প্রেমের সঙ্গী।

হে সম্রাট্-মহিষী, তোমার প্রেমের স্মৃতি এমনিই তো মহনীয়। তার উপরে অপরূপ সৌন্দর্যের রসে সেই স্মৃতি আরও মহীয়সী হয়ে বিশ্বের ধন হয়েছে। যখন সে প্রেম-স্মৃতি শুধু তোমা-গত ছিল তখন তাতে শুধু তোমারই অধিকার ছিল। তখন তা তোমাতেই বদ্ধ ছিল। সৌন্দর্যের মহিমায় তা আজ তোমাকে ছাড়িয়ে বিশ্বলোকব্যাপিনী হয়েছে।

স্মৃতির তো নিজস্ব কোনো রূপ নেই। যখন সে স্মৃতি তোমাতেই বদ্ধ ছিল

তখন তা তোমার প্রীতির রূপেই ছিল রূপবতী। এখন সে তার সেই বদ্ধরূপ ছেড়ে বিশ্বের প্রীতির মধ্যে তার স্বরূপ পাচ্চে। সেই স্মৃতি যদি শুধু একজনে বদ্ধ থাকত তবে এই বিরহ বিশ্বজনের বিরহ-বেদনার করুণ ঐশ্বর্যে মহনীয় হ'ত না। সেই বিরহ তবে সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হত।

তোমার প্রেমের গৌরবমুকুট তুমি রাজ-অন্তঃপুরের বন্ধন থেকে মুক্ত করে বিশ্ব-লোকের প্রাঙ্গণে নিয়ে এলে, সকল প্রেমিকের শিরে তা পরালে। তখন এই প্রেম-মুকুট ধনী-দরিদ্র সকল বিরহীর স্মৃতিকে মহীয়সী করল। জগতে যে-কেউ ভালবেসেছে সবাই সেই প্রেমের গৌরবে ধন্য হল। যা একলা তোমারই ছিল তা বিশ্বের সব প্রেমিক বিরহীর সম্পদ্ হল।

সম্রাট্, রাজশক্তি রাজকীর্তি আজ কিছুই এজগতে নেই। আজ এই প্রেমস্মৃতিকে রক্ষা করে কে? সম্রাটের সৈন্য একে রক্ষা করে না। রক্ষা করলেই বা লাভ কি ছিল? রাজসৈন্য-রক্ষিত কোন্ ঐশ্বর্য আজ বজায় আছে? শক্তি-রক্ষিত কোনো ঐশ্বর্যই আজ নেই। তবে একেই বা আজ কে রাখবে?

ভয় কি? বিশ্বলোক একে রক্ষা করবে। আজ সবাই একে বলচে, থাকো থাকো। কারণ সকল বিশ্বকে সম্রাট্ এই স্মৃতি-সম্পদ্ দান করে গেছেন। বিশ্বজনীন এই প্রেমস্মৃতি সুন্দর হয়ে আরও মহনীয় হয়েছে। সর্ব-মানবের অনন্ত বেদনায় এই প্রেমস্মৃতি সবার অন্তরঙ্গ ধন হয়েচে। বিশ্বজীবন এরও মধ্যে নিত্যতা সঞ্চার করবে, বিশ্বপ্রেম একেও আনন্দরস যোগাবে।

১০ নং

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে...*

[এই কবিতাটি ব্যাখ্যার সময়ে ছন্দের কথা ওঠে। তাহাতে কবিগুরু কয়দিন ছন্দ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা ভূমিকায় লিখিত। ছন্দ সম্বন্ধে এখানে তাঁহার বলা যাহা কিছু কথা তাহা ঐ প্রসঙ্গেই। আর কতকটা কিছুকাল পরে বলা। ভিন্ন সময়ে বলা হইলেও তাহা ঐ সঙ্গেই রাখা হইয়াছে।]

ব্যাখ্যা—হে প্রিয়, ইচ্ছা হয় আজ এই প্রাতে নিজ হাতে তোমাকে কিছু দিই। কিন্তু দিই কেমন করে? প্রথম প্রেমের নব রাগদীপ্তি, প্রথম প্রভাতের

* গ্রন্থ-ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

নব বিকাসের প্রথম গান, যদি বল, তাই দিতে পারি। কিন্তু তাও তো ক্ষণিক মাত্র। ক্ষণকালেই তা ক্লান্ত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

সন্ধ্যায় এসে আমার দুয়ারে কি প্রার্থনা নিয়ে তুমি দাঁড়ালে? তোমায় দেবার মত আমার কী-ই বা আছে? আমার এই সন্ধ্যাদীপটুকু শুধু শুষ্ক গৃহকোণেরই উপযুক্ত। ঘরের ভিতরের এই জিনিষ নিয়ে তোমার কী কাজ হবে? তোমাকে দিবার মত দানযোগ্য বস্তু তো এ নয়। তোমার চলার পথে সাথী হবার শক্তি এর কই? আমার কী এমন শক্তি আছে যে তোমায় দিতে পারি? ফুলমালা যা-ই দেব সবই ক্ষণিক। দুদিনেই তা শুকিয়ে যাবে। যতক্ষণ তা নবীন তাজা (fresh), ততক্ষণ তা বেশ। কিন্তু যেই তা পুরাতন, অবসন্ন ও মলিন হবে তখনই তা তোমার পক্ষে ভার হয়ে উঠবে। তখন মনে মনে তুমি ভাববে, 'এই দান এখন আমি রাখি কোথায়?' এমন দান যদি আমি দিই, তবে প্রথমে হয়তো না বুঝে ক্ষণকালের জন্য তুমি তা আদর করে নেবে। তার পর দিনে দিনে তা তোমার পক্ষেও ভার হয়ে উঠবে। তখন তোমার মন হবে উদাসীন। তোমার শিথিল আঙুলের মাঝ দিয়ে তোমার উপেক্ষিত এই দান কখন ধূলায় পড়ে লুটোবে! এই রকম দান দিয়ে কোনো লাভ নেই।

যে দান দিনে দিনে বোঝা হয়ে ওঠে সে দান তোমাকে দিলে চলবে না। তার চেয়ে তুমি এখানে এসো। হয়তো তখন আমার পুষ্পবনে চলতে চলতে অজানা কোনো গোপন গন্ধ (unknown mystery) পেলেও পেতে পার। অন্যমনেও সেই 'অজানা'র রহস্যময় গোপন আনন্দ-সুরভি পেয়ে পুলকিত হয়ে হয়তো ক্ষণকাল তুমি থমকে দাঁড়াবে। আমার যে অজানা গোপন আনন্দ আজ পথহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে সে তখন তোমাকে পেয়ে ধন্য হবে।

সে যদি সযতনে চেষ্টা করে (deliberately) তোমাকে খোঁজে, তবে হয়তো তোমায় পাবে না। আমার পুষ্পবনবীথিতে চলতে চলতে যদি তোমার চোখে আনন্দের ঘোর লাগে তবে আমার পুষ্পবনেরই সে সৌভাগ্য। হয়তো তখন কোন্ শুভক্ষণে আসন্ন-সন্ধ্যায় পত্রান্তরাল-হতে-খসে-পড়া কম্পিত একটি রঙীন আলোকচ্ছটা স্পর্শমণির মত তোমার অন্যমনা ভাবনাকে সচেতন করে দেবে, তোমার স্বপনকে মধুময় করে দেবে। সেই আমার 'অজানা' (unknown), সেই আমার কুসুম-হৃদয়ের আন্তর রহস্যই (mystery) তো তোমার যোগ্য উপহার। তার ক্লান্তি নেই; সে ম্লান হবার নয়।

আমার জীবনের যা শ্রেষ্ঠ ধন তা কেমন করে তোমাকে দিই? তাকে তো আমার জীবন হতে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া চলে না। খুঁজতে গেলে তো সে ধরা দেয় না। আকাশের আলোকরশ্মিরেখার মত শিশিরবিন্দুতে অশ্রুজলে বীচিমালাতে একটু চমক লাগিয়ে লুকিয়ে সে পালায়। তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না। বীণার অনুরণনের মত নৃত্যরত চরণের নূপুর-ঝংকারে মনকে একটু নাড়া দিয়েই সে পালায়। আপন পরিচয় তো সে দেয় না।

মণি-রত্ন হতে বহুমূল্য হলেও আমার এই রহস্য-সম্পদকে তো কোনো কঠিন মঞ্জুষার মধ্যে বদ্ধ করা যায় না। এ যে কোনো বাঁধনই মানে না। আমার এই শ্রেষ্ঠ মহনীয় সম্পদ্ আমার সমস্ত জীবনে মিলিয়ে আছে; আলাদা করে একে দেখাবার জো নেই। এর উপায় কি?

তার নামটিও সে বলতে অক্ষম। সে কি কোনো চিন্তা? কোনো ভাব? কোনো তত্ত্ব? সে-সব কিছুই বলতে পারি না। তবে বলতে পারি সে আমার জীবন, আমার আনন্দ, আমার গোপন রহস্য (mystery), আমার জীবনের সার-সর্বস্ব। জিজ্ঞাসা করলে উপনিষদের যুগের জবালাপুত্র সত্য-কামের মত করুণ নয়ন মেলে সে শুধু বলে—

ভগবন্, গোত্র মম নাহি জানি।

সে সকল ধরা-ছোঁয়ার অতীত।

হে প্রিয়তম, যদি তুমি স্বয়ং তাকে পাও তবেই তোমার যোগ্য উপহার হবে। আমি যা-ই দিতে যাই—তা ফুল হোক গান হোক বা যা-কিছু হোক—তা আমার জীবন হতে বিচ্ছিন্ন হবে। সে দান তোমার যোগ্য হবে কেমন করে? আমি যদি তোমাকে কিছু দিতে চাই তবে তাকে আমার জীবন হতে ছিন্ন করে বাহির করে আনতে হবে। বৃন্তচ্যুত ক্ষণিক ফুলটির মত সে পরক্ষণেই শুকিয়ে গিয়ে তোমার ভার হবে। তার চেয়ে যদি তুমি আমার মর্মের গোপন গহন পুষ্পবনে নিজেই গিয়ে আমার অজানা আনন্দের জীবন্ত প্রেমাঞ্জলিটি নিজেই নিতে পার তবেই আমার দেওয়া সার্থক হবে, আমি ধন্য হব।

আলোচনা—পুণ্যার্থী হয়ে জপতপ অনুষ্ঠান প্রভৃতি নানা বাহ্য উপায়ে ভগবানকে আমরা পাই না। শাস্ত্র ও সম্প্রদায়-সম্মত কোনো অনুষ্ঠানে কে তাঁকে বাঁধতে পারে?

আমাদের পূজাও যেন বাহ্য উপায় মাত্র না হয়। যে পূজাকে আমরা ধরতে ছুঁতে পারি, যা আমাদের প্রত্যক্ষ, সে পূজার মূল্য কি? যে পূজা

আমার অন্তরের মধ্যে অজানা হয়ে আমার জীবনে মিলিয়ে আছে তাই তো যথার্থ পূজা। সে পূজা তো হাতে ধরে দেওয়া চলে না, আপন প্রেমে প্রেমময় যদি তা নিতে পারেন তবেই আমি ধন্য।

আমাদের দর্শনও (philosophy) জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই জীবনকে নিয়ে গড়ে ওঠা উচিত। জীবন হতে যদি তার দর্শন বিযুক্ত হয় তবে সেই দর্শন কিছুই নয়।

ঘোর ভূতবাদী (materialist) দর্শনও যদি জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত ও যুক্ত থাকে তবে সেই দর্শনের মূল্য আছে। জীবনের সঙ্গে গভীর যোগেই এমন materialist দর্শনও শুচি ও পবিত্র হয়ে ওঠে। সাধকেরা তো বলেন, যতক্ষণ আমার সঙ্গে সে যুক্ত ততক্ষণ তা জীবনের অংশ—দেহ হতে ভ্রষ্ট হলেই তা মলিন, তা বিষিয়ে ওঠে এবং সব কিছুকে বিষিয়ে তোলে। অন্যের শুচি ও পবিত্র তত্ত্বজ্ঞানকে যদি বাইরে থেকে নকল করি, তা যদি আমার জীবনের সঙ্গে যুক্ত গভীর চিৎসম্পদ্ না হয়, তবে সেটা একটা উঞ্ছবৃত্তি মাত্র। তার মতো দৈন্য ও দুর্গতি আর কিছুতে নেই।

এখন আমরা পশ্চিম দেশ হতে অনেক মতবাদ নকল করে আমদানী করতে চাই, আমাদের জীবনের সঙ্গে তার কোনই যোগ নেই বলে তা পদে পদে আমাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। রস রক্ত যতক্ষণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকে ততক্ষণই তা জীবন্ত ও পবিত্র। দেহ হতে নিষ্ঠ্যূত হলেই এইসব জিনিষ অমেধ্য ও মারাত্মক হয়ে ওঠে।

ধর্ম আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত বলেই তার মহত্ত্ব। যখন তা জীবনের সঙ্গে যোগহীন মতবাদ মাত্র, তখন সে যত বড় Philosophyই হোক না কেন তার আর কোনো মহত্ত্ব থাকে না। এইখানেই জীবন্ত ধর্ম ও প্রাণহীন দর্শনের তফাৎ।

১১ নং

হে মোর সুন্দর,......*

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসবের পর ১২ই পৌষে লেখা। এই কবিতার অনুবাদ যখন Robert Bridgesএর কাছে পৌঁছয় তখন তিনি বলেন, 'এর

* গ্রন্থভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কি অর্থ? প্রেম কে? রুদ্র কে? কিছুই বোঝা গেল না।' ইত্যাদি। কাজেই দেশে-বিদেশে এই বিষয়ে আমার হাতযশ আছে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বে সুন্দর বিরাজমান, আমার অন্তরেও সুন্দর আছেন। আমাদের কামনা মত্ত হয়ে তাঁকে আবৃত আচ্ছন্ন করে। এই কামনার পর্দাটুকু সরালে সুন্দর আপনি দেখা দেন। তাঁকে বাইরে থেকে আনতে হয় না। কঠ উপনিষৎ বলেন,—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামাঃ।*

তখনই আমরা সেই পূর্ণকে উপলব্ধি করি। সেই ঈশই আপনার অপরূপ সৌন্দর্যে সকলকে চালাচ্ছেন। সেই সৌন্দর্যে সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আমাদের কামনা বাধা হওয়ায় আমরা তা দেখতে অক্ষম। উপনিষৎ বলেন—

মা গৃধঃ, মা প্রমদঃ।

লোভ ছাড় কামনা ছাড়, প্রমত্ত হোয়ো না। এই কামনাতেই আমরা প্রমত্ত হয়ে নিজের অসুন্দরকে দিয়ে বিশ্বের ও অন্তরের সুন্দরকে আঘাত করি, অপমান করি। এই আঘাত করে কারা? যারা পথের প্রমোদে মত্ত হয়ে নিজের সুকুমার চেতনাকে হারিয়েছে, তারা অচেতন (heedless) অন্ধ। পথের দুধারে সুন্দর সুকুমার যেসব ফুল ফুটে থাকে এই অচেতনেরা তা পথের ধূলায় চরণে বিদলিত করে চলে। জীবনে বিরাজিত সুন্দরকে ও সংসারের সব সুন্দরকে এইসব কুৎসিতের দল উপেক্ষা অপমান ও আঘাত করে।

তখন বেদনায় হৃদয় বলে, এর বিচার চাই। দেখি সুন্দর—আমার শান্ত সুন্দরই রয়েছেন; তাঁর প্রেম তো লুপ্ত হয় নি। তবে কি এই অপরাধের বিচার হবে না? ভুলে যাই তিনি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে ক্রমাগতই জয় করে চলেছেন।

আমরা বুঝতে পারি না যে সেই সুন্দরের বিচারশালা বন্ধ হয় নি। সুন্দরের বিচার-পদ্ধতিই অন্যরূপ। চেয়ে দেখি সৌন্দর্য-লোক তো তার স্থান হতে বা আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হয় নি। সৌন্দর্যের অজস্র ধারায় বর্ষণ তখনো চলেছে। অপরাধী দুর্জনদের কলুষ-কুৎসিত দৃষ্টির উপরে প্রভাত-আলো নিঃশব্দে পড়ে তার কদর্যতা ফুটিয়ে তুলচে—এই তো বিচার। লালসায় উদ্দীপ্ত নিশ্বাসকে

* কঠ, ৬।১৪।

পবিত্র বনমল্লিকার বাস স্নেহস্পর্শের দ্বারা পবিত্র করছে—এই তো বিচার। তপস্বিনী সন্ধ্যা তার তারকাময় আরতি-দীপাবলি হাতে করে তাদের মত্ততার পানে সারা রাত্রি শান্তদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—এই তো বিচার।

যে মত্ত, সে থাকুক্ মত্ততা নিয়ে। যে কলুষিত, সে থাকুক্ তার কলুষ নিয়ে। তোমার বসন্ত-পুষ্পবন, নদীর পুণ্য-সমীরণ, বিহঙ্গ-গীত প্রভৃতি হতে সৌন্দর্যের ধারা বর্ষিত হোক। এই যে প্রতিবাদ (contrast), এই তো সৌন্দর্যের বিচার। হে সুন্দর, এই ভাবেই কি তুমি কুৎসিত অসুন্দরদের বিচার কর ?

তুমি তো শুধু সুন্দর নও, তুমি যে প্রেমিক। হে প্রেমিক, কামুক লোভী নির্দয়ের দল তোমাকে আঘাত করে। প্রেমের কণ্ঠে যে সুন্দর মালা, তাকে হরণ করে তাই দিয়ে তাদের দুর্বার লালসাকে তারা সাজায়। তখন সইতে না পেরে চাই বিচার। তারপর দেখি তোমার বিচারশালা তো খোলাই রয়েছে। তাদের নিষ্ঠুরতার উপর জননীর অশ্রু ঝরে ; এই অশ্রুই তো বিচার। প্রণয়ের প্রতি যে বিদ্রোহ, সেই শেলকে প্রণয়ী তার প্রেমের অসীম বিশ্বাসে বুকে করে নেয়—এই তো বিচার। সতী যে পবিত্র লজ্জার নিঃশব্দ বেদনায় প্রেমের ব্যথা সইল—এই তো তোমার বিচার। যে বন্ধু প্রেমকে প্রবঞ্চনা (betray) করে প্রণয়ের অপমান করেছে, প্রেমের প্রতীক্ষায় তার পথ চেয়েই তোমার বিচার। হে প্রেমিক, ক্ষমার ধৈর্যের মধ্যে তোমার বিচার, প্রেম দিয়েই তোমার বিচার।

তুমি উদার, সর্বস্ব দিতেই তুমি উদ্যত। লুব্ধতা তোমাকে অপমান করে। অন্যায়ের সিঁধ কেটে তোমার ঘরে সে চুরি করতে চায়। তাতে বিশ্বের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, ধর্ম আহত হয়। তখন বিশ্ববিধাতা এই সামঞ্জস্যের অভাব পূর্ণ করতে আসেন। আকাশে তাপের ও চাপের বৈষম্য যেমন দারুণ ঝড়ে সমতা লাভ করে তেমনি বিশ্বের অসমতা দূর করতে তোমার রুদ্ররূপ জাগে। প্রকৃতিরই এই ধর্ম।

তখন চোরের দলকে চোরা ধনের দুর্বহ ভার বইতে হয়। তখন আর সে ভার নামাবার জো থাকে না। এই তো মহা দণ্ড। এই বোঝা তাদের বইতেই হবে। পরশুরামের মাতৃহত্যার কুঠার হাত থেকে আর তো খসে না। এ কি সামান্য দণ্ড! এই যে লুব্ধদের সব রণতরী অস্ত্রশস্ত্র, এ কী ভীষণ প্রাণান্তকর বোঝা! কিন্তু এই বোঝা নাবিয়ে ফেলবার জো নেই। মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে,

তবু মুক্তি নেই। বলতে পারে না যে ফেলে দিই। এই তো বিচার, এই তো দারুণ শাস্তি।

রুদ্রেরও মার্জনা আছে। সে কেমন? সুন্দরের ও প্রেমিকের বিচার যেমন অদ্ভুত, রুদ্রের বিচারও তেমনি অদ্ভুত।

যখন মানুষ দুঃখ দেয় তখন বলি—হে রুদ্র, বিচার কর, দণ্ড দাও। তারপর যখন মানুষ দুঃখ পায় তখন আবার বলি—তুমি বিচার কর, মার্জনা কর। আপন পাপে শক্তিদম্ভমত্ত নিষ্ঠুর সব জাতি ভেঙে চুরে যেতে বসেছে। তাদের মহতী বিনষ্টির খবর তারা জানেও না। তাদের উপরে ভীষণ ঝড়ের মত রুদ্রের বিচার নামচে। রুদ্র হয়েই রুদ্র বিচার করেন। রুদ্রের বিক্ষোভ-ঝঞ্ঝায় চোরের বহুযুগ-সঞ্চিত সব চোরাই মাল ধুলো হয়ে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়। তখন তার দুর্গতি দেখে বলি—ক্ষমা কর প্রভু, ক্ষমা কর।

বিশ্বের সর্বত্রই ছন্দ বিরাজিত। যেখানে ছন্দ ভাঙে (discord) সেখানে, কিছুকাল প্রতীক্ষার পর, সে-বৈষম্য অসহ্য হলে রুদ্রের আবির্ভাব ঘটে। বহুদিন পর্যন্ত ছন্দই সুন্দর ও প্রেমিক হয়ে অ-ছন্দকে বিচার করে। তখনও ফুল ফোটে, স্নেহপ্রীতির ধারা চলে। তবুও যদি তাতে বিশ্বচ্ছন্দের বৈষম্য দূর না হয় তখনই আসে রুদ্রের ভীষণ আবির্ভাব। সেও ছন্দেরই বিচার। ছন্দই রুদ্ররূপ হয়ে বিশ্বের ছন্দ ও সুর মিলিয়ে শান্ত ও নিবৃত্ত হয়।

আলোচনা—এমন অনেক পাপ আছে যা বড়ই কষ্টকর, কাজেই তা নিজেই নিজের বিচার ও দণ্ড। এমনিও তাকে আর বাইরে থেকে দণ্ড দেবার প্রয়োজন আছে বলে সমাজ মনে করে নি। সমাজে লুটতরাজের দণ্ড অন্যায়ের দণ্ড লাম্পট্যের দণ্ড-বিধান আছে, কারণ তাতে ক্ষণিক সুখ ও কামনা-চরিতার্থতা আছে। কিন্তু নীচতা ও পরশ্রীকাতরতার তো কোনো দণ্ডবিধান সমাজে নেই। কারণ এই পাপের মধ্যেই মনে মনে পুড়ে মরার দণ্ড রয়েছে। বাইরের থেকে দণ্ডের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সুন্দরের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কথা। সুন্দর জানে যে সে সম্পূর্ণ, সে অপরাজেয় শাশ্বত সত্য; তাই সে ভরসা করে প্রতীক্ষা করতে পারে। ভগবান্ সুন্দর বলেই প্রতীক্ষা করেন। যাঁরা ভগবান্‌কে অসহিষ্ণু বলেন তাঁরা তাঁর সুন্দর ধর্মকে অস্বীকার করেন।

১২ নং

তুমি দেবে,
তুমি মোরে দেবে,……

ভূমিকা—বাইরের থেকে অনেকে বলেন—'তোমাদের ভারতীয় ধর্মে প্রার্থনা নেই। কেন নেই? আমাদের ধর্মে প্রার্থনাই তো সব চেয়ে বড় কথা।'

তাঁদের কি বলব? আমাদের দেশে সাধারণতঃ তিন পথে ভগবান্‌কে সবাই খুঁজেছেন। কর্ম, জ্ঞান, ও প্রেম এই তিন পথ। কর্মের পথ হল সাধারণ সংসারীদের। কর্মপন্থীরা বলেন, আমরা চাইবার আগেই যা পেয়েছি আগে তারই ঋণ শোধ করি, তবে তো আবার চাইতে পারি। শুধু ঋণের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি?

জন্মাবার সময়ই আমরা ঋণ নিয়ে জন্মাই, তারপর জন্ম ভরে সেই ঋণ শোধ করি।* জ্ঞানপন্থীরা এদেশে ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেদের অভেদ দেখেছেন। তাঁরা চাইবেন কেমন করে? অন্যের কাছে চাওয়া যায়, কিন্তু নিজের কাছে নিজের চাওয়ার তো কোনো অর্থ নেই। প্রেমের পথে চাইতে গেলেই প্রেমের অপমান। বরং আমরা তাঁকে কিছু দিতে পারলে ধন্য হই। শারদোৎসব নাটকখানাতে প্রেমের এই ঋণশোধের কথা কিছু বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা—তুমি আরও দেবে এই কথা কেন বৃথা ভাবি? তুমি ইতিপূর্বেই যা দিয়েছ সে কথা কেন ভেবে দেখি নে? কত দান পেয়েছি, চেয়ে চেয়ে আর কেন বোঝা বাড়াই? না চাইতেই তুমি এত দিয়েছ যে সে দানের গৌরবই ভাল করে এতদিনেও বুঝতে পারি নি। তোমার দানের মহত্ত্ব বুঝি নে। তার অজস্রতাতেই সে আমাদের কাছে উপেক্ষিত ও অপমানিত হয়েছে। পেয়ে পেয়ে দিনে দিনে লোভ আমাদের বেড়েই চলেছে। সেই পাওয়ার বোঝাই এখন আমাদের চেপে মারচে। সেই অনেক পাওয়ার জালেই নিজেরা বদ্ধ হয়ে পড়েছি।

তোমার দান এত অজস্র যে আমাদের জীবনের পাত্রে আর ধরে না। তাই আর কিছু চাইতে সাহস পাই নে। কারণ সেই দান যদি জীবনপাত্র উপচে বহে যায় তবে তাতে তোমার দানেরই অপমান। তোমার দানকে

* ঋণং হ বৈ জায়তে যো বৈ জায়তে।

ব্যর্থ করে তোমাকে অপমান করতে চাই নে। ভিক্ষুকের মত এই লুব্ধ কাঙালপনা আর সহ্য হয় না। প্রেম তাতে অপমানিত হয়। পেয়ে পেয়ে লোভ আমাদের বেড়েই চলেছে। এই ভিক্ষার ভার আর বইতে পারি না। এই দায় আর সয় না।

যদি আমার জীবনে প্রেম জাগত তবে কি এমন করে চাইতে পারতাম? চাইতে গেলেই যে প্রেমের অপমান। ভক্ত জ্ঞানদাস বলেছেন, ধর্মপত্নী চান স্বামীর দুঃখকর্তব্য-ভারের অংশ নিতে, সুখের বেতন তিনি চান না। উপপত্নী চায় শুধু সুখ ও ঐশ্বর্য, দুঃখ-দারিদ্র্যের ভাগ সে তো চায় না। এই তো তাদের মধ্যে তফাৎ। কিছু চাইতে গেলেই ধর্মপত্নীকে উপপত্নীর আসনে নাবতে হয়।

প্রেম কিছু চায় না। বরং তার মন বলে, 'সমানে-সমান হয়ে যেন তাঁকেই কিছু দিতে পারি।' প্রেমের বরমাল্য পেলে মাল্য ফিরিয়ে দিতে হয়। তাঁর প্রেম যখন দিচ্চে, তখন আমার প্রেমও যেন তার যোগ্য প্রতিদান করতে পারে। ভিক্ষুকের মত কাঙালপনা করে আমার প্রেম যেন নিজেকে অপমানিত না করে।

কাজেই প্রেম বলে, 'আমি নিতে চাই নে, দিতেই চাই। আমার এই দেবার প্রার্থনা কখন পূর্ণ হবে, হে প্রিয়তম? আমার পিপাসার শূন্য পেয়ালা ভিক্ষুকের মত শুধু চাইতেই জানে। এই পেয়ালা ফেলে দেব। দীপ তেল নেয় ও আলো দেয়। কিন্তু যে দীপ ভিক্ষুকের মত শুধু চাইবার জন্যই প্রতীক্ষা করে, আলোহীন সে দীপ নিবিয়ে ফেলব। শুধু আমার গলায় যে বরমাল্য আপন ঐশ্বর্যে সুন্দর হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেচে, তাই তোমার গলায় পরিয়ে দেব।

অসীম আকাশ একটি অনন্ত আধার। সে এত পায় তবু সে কিছু সঞ্চয় করে রাখে না বলেই সে রিক্ত সন্ন্যাসীর মত চির-পবিত্র। তার এই বৈরাগ্যই তাকে এমন পবিত্র ও সুন্দর করে রেখেছে। প্রেমের মূলে সেই বৈরাগ্য না থাকলে প্রেমও মলিন হয়ে ওঠে। আকাশকে বিধাতা যে অগণিত গ্রহচন্দ্রতারার রাশীকৃত উপহার দিয়েছেন সে সেইসব গ্রহচন্দ্রতারার দীপ্যমান মালা গেঁথে তাঁরই গলায় ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই সেই দান অনন্তের বুকে চির-উজ্জ্বল চির-পবিত্র। তোমার প্রেমের দানকে আমার প্রেমের দীপ্ত মালা করে তোমার কণ্ঠে কবে পরাতে পারব? কবে আমার প্রেম সর্বদৈন্য জয় করে ধন্য হবে?

১৩ নং

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে......*

যৌবনই সত্য। জরা, তার উপরে মিথ্যা আবরণ মাত্র। তাই জীবনে যখন পাতা ঝরচে, তখনও যৌবনের বাণী এসে দোলা দেয়। এই বাণীকে বাইরের বলে ফিরিয়ে দিলে চলবে না। আমারই জীবনের পরিপূর্ণতার ডাক আমার কাছে এই যৌবনবসন্ত-বাণীরূপে ফিরে এসেছে। এতেই বুঝি জীবন ও যৌবনই সত্য, মৃত্যু ও জরা মিথ্যা।

যখন এই কবিতা লিখি, তখন পৌষ মাস। পাতা অজস্র ঝরচে; তার মধ্যে বসন্তের প্রাণ-সমীরণ এসে হাজির। জরার আবরণকে সরে যেতে হল। এই যৌবন তো দিনক্ষণ দেখে পঞ্জিকা মেনে চলে না। জরার পুঞ্জীভূত বাধার প্রাচীরকে আপন প্রাণ-বেগে উড়িয়ে দিয়ে জীবনের জয়ধ্বজা ওড়ানোই এর কাজ।

ব্যাখ্যা—পৌষের জরা-মন্থর আকাশকে যৌবন-বসন্তের মত্ততা এসে মাতিয়ে দিল। এই বসন্ত নির্লজ্জ নির্ভীক। বুড়ো বলে জরাকে সে সমীহ করে না। তাকে হেসেই উড়িয়ে দেয়।

বসন্ত বুঝি যৌবনের বার্তাবহ? তার হাতে সংগীতের ইঙ্গিতে আমারই যৌবন বুঝি আজ তার বার্তা পাঠিয়েছে? এই ইঙ্গিত কি সকলে বুঝবে?

সে জানাল, 'আমি তোমার বিরহী চির-যৌবন, তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি। বসন্তের দক্ষিণ বায়ু আমারই বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস। মরণের সিংহদ্বার পার হয়ে এস। পুষ্পহার ক্লান্ত হয়, পত্রভার জীর্ণ হয়, স্বপ্ন ভেঙে যায়, আশা ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ে, শুধু আমি তোমার চিরদিনের। জীবনের এপারে ওপারে বারবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। তোমার সঙ্গে আমার যে প্রেমযোগ, তার তো জরা নেই, মৃত্যু নেই।'

* গ্রন্থভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১৪ নং

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে……*

যুগ-যুগান্তর ধরে এই আনন্দচ্ছবি অপ্রকাশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে এতকাল সে ঢাকা ছিল। আজ তা কালের মধ্য দিয়ে রূপ ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

বাইরে যে এই মাধবী ফুটেছে এও যেমন সত্য, আমার অন্তরে যে এইজন্য আনন্দ ও ভাবের বিকাস, সেও তেমনি সত্য। একটি ভিতরের ও আর একটি বাহিরের বলে তাদের মধ্যে কেউ কম নয়, কাকেও উপেক্ষা করা চলে না।

আমার কবিতায় যে আনন্দধারা ফুটে উঠল, একান্তভাবে তা আমারই নয়। আমারই কল্পনা তার একমাত্র জন্মভূমি নয়। কবি তাঁর কাব্যে যে-আনন্দকে ফুটিয়ে তোলেন, শিল্পী তাঁর চিত্রে যে-সৌন্দর্যকে রূপদান করেন, সে-রসমাধুর্য কত যুগ কত মানুষের অন্তরে অন্তরে প্রেমের ও আনন্দের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করছিল। বহু দুঃখে বেদনায় তার বিকাস চলেছে। সেই অব্যক্তই কবি বা শিল্পীর রচনায় এতদিনে ব্যক্ত হল। পর্বতের বিন্দু-বিন্দু জল যেমন বহু গিরিদরী পার হয়ে কোনো এক জায়গায় উৎসরূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তেমনি আজ সেই অব্যক্তই বিশেষ মানুষের হাতে আপনাকে প্রকাশ করল।

রচনার মধ্যে ব্যক্ত হয়ে ওঠবার জন্য এই ব্যাকুল তপস্যা সবারই অন্তরে রয়েছে। সকল মানুষের মনই সেই ভাবকে রূপ দিতে চাইচে। সবাকার সেই ইচ্ছা সেই ব্যাকুল তপস্যা কোনো এক বিশেষ কবির বা শিল্পীর হাতে ব্যক্ত হয়ে ধন্য হয়েছে ও সকল মানবকে ধন্য করেছে। বিশ্বজনের এই অন্তর্গূঢ় আনন্দই সকল কবি বা শিল্পীর রস-সৃষ্টির মূলশক্তি। কোনো-না-কোনো সময়ে কবির লেখনীতে, শিল্পীর তুলিতে, ভাস্করের লৌহ-টঙ্কে তারই প্রকাশ দেখা দেয়।

অনেক সময় বসন্তের একটু হাসি আমাদের মনকে দোলা দিয়ে আনন্দ জাগিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু এই আনন্দ কি ব্যর্থ হবে? কিছুতেই কি এই আনন্দ তার আপন প্রকাশ পাবে না?

লোহিত সাগরে একবার অপূর্ব এক সূর্যাস্ত দেখেছিলাম। কী অপূর্ব তার

* গ্রন্থভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বর্ণচ্ছটার ঐশ্বর্য! কিন্তু হায় তাকে ধরে রাখতে পারলাম না। ভাবলাম, এর বর্ণ এর ছায়া সবই তো বৃথা মনের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। কিন্তু এই অমৃত-সৌন্দর্য-সাগরের অমৃত-রসের মধ্যে যে আজ ডুবে গেলাম তা তো বৃথা যাবার নয়। অন্তরলোকে সে আপন স্থান করে রয়েই গেল।

এ অন্তরলোক তো একলা আমারই অন্তরলোক নয়। এখানে বিশ্বমানবের অন্তরলোক ভিতরে ভিতরে যোগযুক্ত। সব নদীই যেমন সাগরে এসে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তেমনি মানব ভাবের সাগরে গিয়ে সে সর্বমানবের যোগ লাভ করে। সেইখানেই সবার সব অনুভূতির প্রকাশ ও লয়, আকাশেই যেমন নানা বর্ণে শোভায় মেঘের উদয় ও লয়-লীলা। এই লীলার দোলা অন্তর হতে বাহিরে ও বাহির হতে অন্তরে ক্রমাগতই চলেছে।

আমার চিত্তের আনন্দ যদিও চিত্তের মধ্যেই আছে তবু তার উদ্যম চলেচে বাইরে আসতে। তাই ক্রমাগত রুদ্ধদ্বারে তার আঘাত আসছে। সকল মানুষের মনেই এই ধাক্কা কাজ করচে। এই বেরিয়ে আসবার ইচ্ছাই সর্বমানবের সকল সৃষ্টির মূলে। ক্ষুধা তৃষ্ণার আবশ্যকতার চেয়ে এই প্রেরণা কম নয়। কাজেই আমার অজ্ঞাতসারেও লোহিত সাগরের আনন্দ ও বর্ণচ্ছটা বারবার আমার রচনার মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করেছে।

আজ এই মাধবী-মঞ্জরী যে আমার মনে আনন্দদোলা দিল তা-ও ব্যর্থ যাবে না। আমার নানা সৃষ্টি-চেষ্টার মূলশক্তিরূপে আমার অন্তরে তা রয়েই গেল। আমার গানে আমার সুরে কেমন করে চিরদিন তার দোলা লাগচে তা-কি আমি জানতে পারব? সেই আনন্দ যে কখনও মরবে না এই ভরসাটুকু আমার মনের গভীর গোপন থেকে কিছুতেই যাবে না।

১৫ নং

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,

গীতায় বলেছেন—ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি।* অর্থ—ছন্দ (বেদের গান)-গুলি যেন গাছের পাতা। নববসন্তের সাড়া পেয়ে এইসব গানের নব পল্লবদল আসচে, ঝরে পড়ে উড়ে যাচ্চে। কে তাদের বেঁধে রাখবে?

* ১৫, ১।

দক্ষিণ সমীরণে এইসব গানের পাতা পুঞ্জে পুঞ্জে পল্লবিত, তার পরে কোথায় তারা মিলিয়ে যায় কে জানে ?

আমার গানগুলিও যেন স্রোতের শেওলার মত কোনো এক আনন্দরসের স্রোতে ভেসে এসেছে। এদের অনড় অচল কোনো স্থির প্রতিষ্ঠা নেই। এদের কোনো স্থায়ী মূল নেই। এরা অজানা অতিথি, কবে আসবে কবে যাবে তা এদেরও জানা নেই, আমারও তা অজানা। কিন্তু অতিথি বলেই যখন এরা আসে তখন কী সে আনন্দ-উৎসব ! প্রাণপণে এদের তখন সৎকার করতেই হয়।

গানের মত কবিতাও আমাদের অজানা অতিথি। অন্তত ভাবগীতিকাগুলি (Lyrical কবিতা) যে অজানা অতিথি, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। তাদের কোনো মূল প্রতিষ্ঠা নেই। তবে মহাকাব্য (Epic) সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। তাদের পৌরাণিক (tradition) এবং স্থানগত ও কালগত (local conditions) মূল আছে।

আমার গানগুলি মূলহীন শেওলা বলে অতিথির মত তারা আসে যায়। এক জায়গায় জড় হয়ে বসে অন্যের আসবার পথ এরা রোধ করে না। জীবনে যখন সুখ-দুঃখের ঘোর বন্যা নামে তখন এরা প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়ে দিকে-দিকে ছড়িয়ে যায় ও জগতে সর্বত্র সুখ-দুঃখের আনন্দ বা ব্যথা ছড়িয়ে দেয়।

১৬ নং

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি……

যখন কাল* লিখেছিলাম—

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী……।†

তখন চিন্তাটি বড় হাল্‌কা ছিল। আজ** সেই চিন্তাটিই ভাবে ও তত্ত্বে গভীর হয়ে উঠেছে (thoughtful)।

* ২৬ পৌষ, ১৩২১

† 'বলাকা'র ১৪ নং কবিতা

** ২৭ পৌষ, ১৩২১

[আলোচনা—Levy সাহেব জানতে চাইলেন এই কবিতাটির মূল কথা কি ? কবি বল্লেন—]

অনন্ত যেন কৃষ্ণের মত তাঁর বাঁশিতে আমাদের ডাকছেন। সারা প্রকৃতি রাধার মত সেই ডাকে যেন প্রেমাভিসারে যাত্রা করচে। সৃষ্টির জীবনপ্রবাহে, মানব-ইতিহাসে ও আমার রক্তধারায় সেই রাগই বাজচে। জন্মমৃত্যু যেন তার সুর ও তাল।

এলাহাবাদে ১৩২১ সালের এমন পৌষমাসে তারা-খচিত অনির্বচনীয় রাত্রির তিমিরতলে বসে এই ভাবটা আমাকে পেয়ে বসেছিল। এই কবিতায় তাকে খানিকটা রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। অরূপের অন্তঃপুরে যারা ছিল তারা কোন্-সে বাঁশরীর প্রেমের ডাকে দলে দলে নৃত্যের ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করে বেরিয়েছে প্রেমাভিসারে ? বৈজ্ঞানিক বলবেন, অরূপ তার রূপ পায় তার ছন্দোময় আবর্ত্তনে। কিন্তু এই ছন্দোময় আবর্তন কেন ? কোনো প্রেমের ডাক ছাড়া বিশ্বব্যাপী এমন আনন্দনৃত্য কেমন করে সম্ভব হল ?

বিশ্বের বস্তুরাশি যেন কোনো প্রেমে ব্যাকুল হয়ে গতি ও মূর্তি পেয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে। আনন্দের অট্টহাস্যে ও সংগীত-ছন্দে তারা আজ নেচে উঠেছে। বস্তুলীলার আনন্দ-কোলাহল আজ শোনা যাচ্চে। আমার হৃদয়-কামনাকে তারা বলচে—'কেন কামনা-মাত্র হয়ে অন্তরের অলক্ষ্যে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে থাকবে ? তোমরাও রূপ পরিগ্রহ করে বাইরে এস। আমাদের এই আনন্দের খেলায় যোগ দাও।' সেই আহ্বানে মানবহৃদয়ও রূপে ও রূপ-রসে মত্ত হয়ে তাদের খেলায় যোগ দেবার জন্য জেগেছে।

অব্যক্ত স্বপ্নও মনে মনে তাই ভাবছিল 'কেউ ডাকলে বাঁচি !' রূপ এসে যেই তাকে ডাক দিল অমনি সে চাইল অব্যক্তের সাগর পার হয়ে ব্যক্তের কূলে চলে যেতে। ভাবনা এখন আর অস্পষ্ট প্রবাহের মধ্যে ডুবে-ডুবে বহে যেতে নারাজ। তারা রূপ ও প্রকাশকে আঁকড়ে ধরে কূলে উঠতে চায়।

মজ্জমান প্রাণী যেমন অতল থেকে ধরণীকে আঁকড়ে ধরে ডাঙায় উঠতে চায় তেমনি তারাও যে-কোনো বস্তুকে ধরেই উঠতে চায়। তারা বলে, 'আমরা মনোময় ভাবনা মাত্র (subjective) হয়ে থাকব না; আর ভেসে বেড়াব না; পৃথিবীকে শক্ত করে ধরব।' কেন এই ব্যাকুলতা ?—বস্তুর যে আহ্বান এসেছে, খেলায় ও নৃত্যে যোগ দিতে ডাক এসেছে !

চিত্তের যে-সব ভাবনা বা চেষ্টা বহুকাল অরূপ (fluid) থাকে তারাই

বস্তু হয়ে কঠিন হয়ে রূপ নেয়। এই যে গৃহ-মন্দির গ্রাম-নগরী এসবই মানুষের ভাবনার ও কামনার ব্যক্ত মূর্তি। তাকে শুধু ইট কাঠ মনে করলে ভুল করা হবে। মানুষের যে অব্যক্ত রূপকল্পনা (plan), তাই লোহালক্কড়ের ভিতর দিয়ে পুরী-নগরী-রূপে ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হয়ে ওঠে। দিল্লীতে কতো সম্রাট্ এসেছে, কতো সম্রাট্ চলে গেছে, কালে কালে তাদের অন্তরের ভাব ও ইচ্ছা-শক্তি স্তরে স্তরে জমে ইটে, কাঠে, পাষাণে আপনাকে প্রকাশ করেছে। গ্রামেও চেয়ে দেখি আমাদের পিতামহদের সব স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাই দীঘি-ঘাট-দেউল-সেতু প্রভৃতি হয়ে ধরা দিয়েছে। এসবই তাঁদের স্বপ্নের প্রত্যক্ষ-রূপ।

কিন্তু মানবের বহু স্বপ্ন আজও রূপ বা প্রকাশ পায় নি। সেইসব অব্যক্ত কামনা এখনো আকাশে বেঁচে আছে ও ভেসে বেড়াচ্চে। তারা আমাদের কানে কানে ক্রমাগতই বলচে, 'আমাদের প্রকাশ দাও, আমাদের বাণী দাও, আমাদের আধার দাও। তোমাদের বাণী পেয়ে আমরাও নিজেদের দেখাতে ও শোনাতে চাই, আমরাও প্রকাশ চাই।'

লোকালয়ের তীরে তীরে এমন কত অব্যক্ত অশ্রুত বাণী আজও আকাশে ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। তাদের হাতে আলো নেই। অতীতের সেইসব আলোকহীন ভাব ও ইচ্ছা আজ আমাদের হাতের আলোক নিয়ে আলোকময় তীর্থে প্রকাশের ঘাটে উত্তীর্ণ হতে চায়, তাদের অসিদ্ধ তপস্যা আমাদের মধ্যে সিদ্ধি চায়। এইসব আলোকহীন যাত্রীর দল আলোকের ঘাটে প্রকাশ-লোকে উঠতে পারলে বাঁচে। তাই তারা নীরব কোলাহলে আমাদের ভাব-সৃষ্টিকে ডেকে ডেকে অশ্রান্ত চঞ্চল চরণে লোকালয়ের তীরে তীরে নিরন্তর ছুটে বেড়াচ্চে।

আমার মনের সুপ্ত শান্ত ব্যাকুল ভাবনা (urging)-গুলি পিতামহদের অশ্রুত বাণীর ধাক্কাতেই জাগ্রত ও চঞ্চল হয়ে রূপ ও প্রকাশ খুঁজচে। আমার এই ব্যাকুলতার (urging) চারিদিকে কত নীরব-কোলাহলময় আহ্বান আছে। সকলেরই এই কথা, সর্বদেশের ও সর্বকালের এই একই সত্য। তাই, আমার সব ভাবনাও চিত্তগুহা ছেড়ে অপ্রকাশের অন্ধমরু পার হয়ে 'রূপ কই, রূপ কই' বলে রূপ-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে ছুটেচে। অন্তরের অব্যক্ত ভাবগুলি মরুযাত্রীর মত অসহ্য তৃষ্ণায় আকারের উৎসের দিকে ছুটে চলেচে।

আমার অন্তরের সব আকাঙ্ক্ষাকে আজই তো রূপ দেওয়া গেল না। প্রকাশহীন সেইসব আকাঙ্ক্ষাকে এখন আর ডাক দিয়ে ফিরিয়ে এনে চিত্ত-

মন্দিরে সুপ্ত শান্ত করে রাখাও সম্ভব নয়। তারা সেই যে একবার ঘর ছেড়ে বের হয়েছে আর তারা ঘরে ফিরবে না। যতদিন না কোথাও তারা রূপ পায় ততদিন এইরকম বেদনা বহন করেই তারা লোকে লোকান্তরে যুগে যুগান্তরে উড়ে উড়ে চলবে।

অরূপ-সাগর পাড়ি দিয়ে কোন্ ঘাটে গিয়ে কবে তারা উঠবে কে জানে? কোন্ পারে গিয়ে তারা রূপ পাবে, কোন্ তপস্যায় তাদের নিরন্তর গতির অবসান হবে,—সে খবর কে-ই বা জানে? তবে একথা নিশ্চিত যে একদিন-না-একদিন রূপ এদের পেতেই হবে। নতুন আলোয় প্রকাশিত হওয়া ছাড়া তাদের আর সোয়াস্তি নেই।

এক যুগের আদর্শ ও তপস্যা হয়তো প্রকাশ ও সিদ্ধি পায় আর এক যুগে। মানুষের প্রেম-ব্যাকুলতা ও শান্তির তৃষ্ণা যুগ-যুগান্তরের নানা সংঘাত পার হয়ে তবেই সার্থক হয়। কোন্ যুগের মানুষের কত চিরবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা কত যুগ-যুগান্তরের সাগর পার হয়ে আজ এই যুগের তীর্থে এসে উত্তীর্ণ হচ্চে। পুরাকালের মানবের কত চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা কত যুগের নীরব অরূপ সাগর পার হয়ে আমাদের আজকার ঘাটে এসে রূপলাভ করচে। কাজেই যাকে আমরা নবযুগ বলি তার মধ্যে নতুন আর কতটুকু? বহু যুগ-যুগান্তরের ইচ্ছাগত ভাব ও চিন্তার প্রকাশেই তা ভরপূর। আজকের সৃষ্টি তো শুধু আজকেরই নয়।

আজকের দিনের মানব-মনের যেসব গভীর আকাঙ্ক্ষা এখনো তপস্যা করচে, তাদের সিদ্ধি হবে আবার কোন্ ভবিষ্যৎ যুগে? যেসব অপূর্ণ মানব-কামনা আজই পাড়ি ধরল, তারা ভাবীকালের কোন্ অপূর্ব প্রকাশতীর্থে কবে গিয়ে উঠবে? তখন কেমন হবে তাদের রূপ, কিরূপ হবে তাদের বাণী,—তা এখন কে জানে? তখন কেউ তো জানতেও পারবে না কোন্ পুরাতন অতীতের সুদূর ইতিহাসে তাদের জন্ম হয়েছিল।

আজ যে-সব বাসা-ছাড়া ভাবনা-পাখী আমার মানস-লোকের নীড় থেকে উড়ে চল্ল, তারা যেদিন প্রকাশ-যুগের ঘাটে গিয়ে পৌছবে তখন কি এই আদি নীড়ের কথা কিছু তাদের মনে থাকবে? তখন কি কেউ জানবে কোন্ যুগে কোন্ চিত্ত-কুলায়ে তাদের জন্ম, তাদের যাত্রারম্ভ? আজও যে-সব ভাবনা-পাখী আমাদের এই যুগের কূলে এসে প্রকাশ পেল তাদেরও আদি আরম্ভ-নীড়ের খবর কি আমরা রাখি?

সেই ভাবী যুগে অকস্মাৎ কোন্ কবির কাছে আমার সেই চঞ্চল (fugitive)

মানস-পাখী ধরা দেবে? কবি কোন্ গানে বা কবিতায় তাকে তখন প্রকাশ করবেন? শিল্পীর কাছে যদি সে ধরা দেয়, তবে তিনি কোন্ চিত্রে তাকে ধন্য করবেন? ভাবী কালের সেই রাজপুরে যে ঐশ্বর্যময় হর্ম্যচূড়ে বা তপস্যায় মহনীয় যে যজ্ঞ-মন্দিরে তার স্থান হবে, তা তো এখনও রচিত হয় নি।

যদিও একদিন সিদ্ধির ও সার্থকতার মহনীয় আসন সে পাবেই, কিন্তু আজও সে অবিজ্ঞাত অবজ্ঞাত। তাকে আজ কেউ চেনে না কেউ বিশ্বাস করে না। একদিন তো সে মানব-ভক্তির যজ্ঞশালায় গৃহীত ও সংকৃত হবেই, কিন্তু এখনো সে ভাবী কালের উদ্দেশ্যে দীন হীন তীর্থযাত্রীর মতই ধূলিময় পথে ক্রমাগতই চলেছে। এই পথের মধ্যে বহু দুঃখ-দৈন্যের প্রান্তর তাকে পার হতে হবে। হয়তো পথে বহু বাধা বিঘ্ন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বিগ্রহও তাকে পার হতে হবে। এখন হয়তো তার পথে পথে অভ্যর্থনা হবে ভীষণ যুদ্ধের সংঘর্ষে, রণভেরীতে ও কামানের ধূমে।

ফরাসী বিপ্লবের দারুণ বিক্ষোভ কত যুগসঞ্চিত মানবীয় ইচ্ছা ও ব্যাকুল বেদনাকে অভ্যর্থনা করেছে। সেইসব যুগ-যুগান্তরের মানব-চিন্তা তখন ভীষণ যুদ্ধের ডাক শুনে বহু রক্তাক্ত প্রান্তর পার হয়ে সংগ্রাম-স্থলে এসে পৌঁছেছিল। আজও যে-সব ইচ্ছা সার্থকতা লাভ করতে পেল না তাদের ডাক রইল ভাবী রণক্ষেত্রে। সেই সুদূরের রণশৃঙ্গে তাদের জন্য প্রলয়ঙ্কর আবাহন-গীত বাজবে। মৃত্যুর শোণিতময় কত সাগর পার হয়ে তাদের যেতে হবে কে জানে?

আলোচনা—বিশ্বের সংগীতই হল চলা। জগৎ সংসারের নিরন্তর গতিতে বিশ্ব-সংগীত চলেছে। 'ছবি'তে এই গতি থেমে গেল বলেই ছবি মিথ্যা। গতির সঙ্গে, বিশ্বের Harmonyর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হল বলেই সে মিথ্যা। যখন সে গতি হারাল তখন আর এই জগতে থাকবার অধিকার তার নেই। তাকে তখন সরে যেতেই হবে। নৃত্য-উৎসবে কোনো দলের নাচ সারা হয়ে গেলে সে আর তখন আসর জুড়ে বসে থাকতে পারে না, তখন নূতন দলকে তার আসর ছেড়ে দিতেই হয়। যখন সে নিশ্চল, তখন সে মৃত। জীবনের ও গতির স্থান জুড়ে থাকার তার তখন আর কোন্ অধিকার?

যখনই কোনো দল বা সম্প্রদায় (institution) লীলানৃত্যে চলবার পথকে রুদ্ধ করে দাঁড়ায় তখন সে আকাশ-চুম্বিত অত্যুচ্চ প্রাচীর হলেও মহাকালের শাসনে তাকে চূর্ণ হতেই হবে। যে-সব শাস্ত্র ও শাসকের দল

বিশ্বগতির পথ রোধ করেছেন বিশ্ব কখনও তাঁদের ক্ষমা করবে না। তাঁদের দাঁড়াবার জো নেই, চূর্ণ তাঁদের হতেই হবে।

পাশ্চাত্য দম্ভ চায় লোভ ও প্রতাপকে 'নেশন' নামে একটি রূপ দিয়ে নিরাপদ (secure) ও চিরস্থায়ী করতে। তার পর দেখা গেল 'নেশনে'ও কুলোলো না। আচ্ছা, তবে হোক 'লীগ অব নেশনস'। কিন্তু যেই সে লোভ ও প্রতাপকে নিরাপদ (secure) করতে গেল, অমনি সেই লীগও অচল হল। অমনি আবার মহাপ্রলয়ের সূচনা হল। সচল বিশ্বের প্রবহমান (fluid) গতির মধ্যে তার স্থান নেই। গঙ্গার ধারায় ঐরাবতের মতো তা একদিন-না-একদিন ভেসে যাবেই, গুঁড়ো হয়ে যাবেই।

গতিরই স্থান আছে। বিশ্বধারাকে বাঁধ বেঁধে আর কত কাল বদ্ধ রাখবে? বন্যা একদিন-না-একদিন দুর্নিবার হয়ে সব ভাসিয়ে প্রলয় করে দেবে। জিব্রাল্টার মাল্টা এই সব ঘাটে ঘাটে শক্তি-দম্ভের বাঁধ। এমন করে রাজ্য ধরে রাখবার চেষ্টাকে ধৃতরাষ্ট্র বলা চলে। সে অন্ধ। সে কদিন কাকে ধরে রাখতে পারে? দাম্ভিক দুষ্ট শক্তির সহায়তায় কদিন আর চলবে?

'রইল বলে রাখলে কারে
হুকুম তোমার ফলবে কবে।
(তোমার) টানাটানি টিকবে না ভাই
র'বার যেটা সেটাই র'বে।'

—বৈরাগী ধনঞ্জয়ের এই গানটিতে সেই সত্যই ব্যক্ত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠান (institution) মাত্রই যখন তৈরি হয়ে (construction) গতি শেষ করে খাড়া হয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ায় তখন বিশ্ব-গতির দুর্বার শক্তিতে সে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

এই কথা যদি সত্য হয়, তবে শিল্পকলা দাঁড়াবে কেমন করে? কলা যদি সৃষ্টিধর্মী (creative) হয় তবেই তো তা চলে ও বাঁচে। তার ছন্দে (rhythm) জীবনের নিরন্তর হৃৎস্পন্দন (heart-throb) থাকলে আর ভয় কিসের? বিশ্বচ্ছন্দের প্রাণস্পন্দনেই তো তার জীবন।

'ওথেলো'র হত্যাকাণ্ডকে যদি পুলিস আদালতের খবর (paragraph) মাত্র করি তবে তা একটি দিনের ঘটনা (fact) মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সর্বমানবের জীবন-স্পন্দন দিয়ে 'ওথেলো'র মহাকবি প্রণয়-ঈর্ষাকে শাশ্বত

করে রাখলেন। সর্বমানবের প্রাণশক্তি পেয়ে এই কলাসৃষ্টি নিত্য হয়ে রইল। হয়তো মহাকবির এই রচনা ফৌজদারী আদালতের পক্ষে অর্থহীন দুর্বোধ্য বস্তু। ঘটনার (fact) জগতেও হয়তো তার স্থান নেই। কিন্তু স্পন্দিতচিত্ত মানব-জগতে ও প্রাণময় প্রকৃতিরাজ্যে সে চিরকালের মতো রয়ে গেল। ঘটনামাত্র (fact) হলে যা পরদিনই পুরাতন ও অর্থহীন হয়ে যেত, বিশ্বপ্রাণের যোগে তা নিত্যজীবন ও প্রাণশক্তি পেল। নিত্যকাল সে হাজার রকমে বলবে 'আমি আছি আমি আছি'। ধ্বনিত বাণীর এই প্রবাহ থামলেই আসে জরা ও মৃত্যু। 'আমি'র সঙ্গে 'আছি'র সংগতিই হল 'আমি আছি'।

বের্গসঁর মতে যে সত্তা (reality) নিত্য-প্রকাশমান তাই সত্য। যদি গতি হারিয়ে সে রুদ্ধ (static) হয়ে যায় তবে তার আর কোনো মূল্য নেই। তখন সে তুচ্ছতা হতেও অধম, সে সত্য-ভ্রষ্ট। এই কথা আমাদের অতি পুরাতন সত্য—

'প্রাণ এজতি', ও 'চরৈবেতি'।

সব কিছু ক্রমাগত চলে বলেই তো 'জগৎ', সরে বলেই 'সংসার'। জগৎ-সংসার ছাড়া তো কিছুই নেই।

'বলাকা' গতিরই কাব্য। এই সময়ে আমার 'ফাল্গুনী' নাটকেও আমি বিশ্বগতিকে আমার প্রণতি জানিয়েছি। প্রকৃতিতে ও মানবে যে চিরপ্রবহমান জীবন-লীলা, আমি আমার নানা রচনায় তারই বার্তা দিয়েছি।

'ডাকঘরে'ও আমার সেই কথা। 'ডাকঘরে' গৃহসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ ব্যথিত মানব-আত্মার কান্না। অমল চিরতরুণ আত্মা। সে চায় মুক্তি। প্রবীণ (prudent) মাধব তাকে চায় প্রাচীর বেঁধে আপনার করে ধরে রাখতে। বৈদ্য তার দরজা বন্ধ করে দেয়। মোড়ল এসে তাকে শাসায়। কিন্তু তার নীড়রুদ্ধ গগন-ব্যাকুল মানস-বিহঙ্গ কেবল পাখা ছটফটিয়ে মরে। অবশেষে বিশ্ববিধান এসে তার দরজা খুলে দেয়। মৃত্যু এসে তাকে মুক্তি দেয়। মৃত্যুর মতো মুক্তিদাতা আর কেউ তো নেই।

যত বড় বাঁধনওয়ালাই হোক এই মুক্তিদাতাকে তো কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। যে মৃত্যু-ভয় দেখিয়ে সকলকে সে বাঁধতে চায় সেই মৃত্যুই তো এসে দেয় সকলকে মুক্তি। বদ্ধ আত্মার সকল বন্ধনের অবসান তো মৃত্যুতে। বদ্ধ ও অবরুদ্ধদের পক্ষে এত বড় মুক্তিদাতা তো আর নেই। এই মুক্তির অধিকার থেকে কে কাকে বঞ্চিত করতে পারে?

বার্লিনে 'ডাকঘরে'র অভিনয় নিখুঁত হয়েছিল। কিন্তু অটো (Otto) দেখে বল্লেন, জার্মানেরা তোমার আত্মানুসন্ধান (soul-quest) বোঝে নি। তারা এই নাটককে রোমান্স মনে করেই তৃপ্ত।

১৭ নং

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো·····

আমি যতক্ষণ বিশ্বকে ভালোবাসি নি ততক্ষণ তার দান সম্পূর্ণরূপে নিতে পারি নি। তখন তার আলোর সব সম্পদ্ আমার জীবনে সার্থক হয় নি। তার আলো তো নিত্যই আসে ও তার মন্ত্র আমার কানে গান করে যায়। কিন্তু আমার কাছে তা বার্তামাত্র (information) হয়ে থাকে। এ তো তার সম্পূর্ণ দান নয়। কিন্তু যখন তার মধ্যে আমার আনন্দকে দেখলাম, যখন তার আলোকে দীপ্ত ভুবনের দিকে চেয়ে আমার মনের সঙ্গে ভুবনের আনন্দ ও প্রেমের যোগ হল তখনই আমার কাছে তা পূর্ণ হল। তার দানের মধ্যেও যেমনি আমার সার্থকতা, আমার আনন্দের মধ্যেও তেমনি তার সার্থকতা।

সেই পূর্ণতাটি দেখবার জন্যই নিখিল গগন তার অনন্ত সূর্যতারার দীপ জ্বালিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। বিশ্বভুবনের আলো আছে বলেই এই প্রকৃতি এই গাছপালা সব কিছুর যথার্থ তাৎপর্য (significance), আর আমি আছি বলেই আলোকদীপ্ত এই বিশ্বভুবনের সার্থকতা। উভয়ের যোগে আমার যে পরিপূর্ণ আনন্দ সেইটি দেখবার জন্যই নিখিল গগন তার অগণিত সূর্যতারার কল্যাণ-দীপ জ্বালিয়ে আমার দিকে এতকাল চেয়ে ছিল, আমার আনন্দে তার সার্থকতা খুঁজছিল।

হে ভুবন, যেদিন আমার প্রেম এল গান গেয়ে, যেদিন তোমার সঙ্গে হল আমার মিলন, সেদিনই আমার প্রেম তোমার গলায় তার মালাখানি দিল পরিয়ে। প্রেমের বরণ-মালায় মিলন হল উভয়ের। আমার প্রেম তোমার গলায় আপন মালাখানি পরিয়ে দিয়ে তোমার পাশে এসে হেসে দাঁড়াল। মুগ্ধ চক্ষে তোমাকে দেখে সে একটু হেসে তোমাকে যেন একটা কী দিল।

তুমিও আপন হৃদয়ের রহস্যপুরে আমার প্রেমের সেই আনন্দময় দানকে যত্নে সুগোপনে রেখে দিলে।

সে তোমাকে তখন যে সম্পদ্ দিল সেই সম্পদ্ তো তোমার পূর্বে ছিল না। এখন সেই সম্পদ্ তোমার নিত্যধন হয়ে তোমার হৃদয়ে বিরাজ করবে। আমার প্রেমের সেই আনন্দসম্পদ্ তারার আলোয় তোমার বক্ষে চিরদিনের মতো গাঁথা হয়ে রইল। আমার এই আনন্দময় প্রেম-সম্পদ্ উপহার পাবে বলেই কি তুমি যুগযুগ পথ-পানে চেয়ে প্রতীক্ষা করছিলে? আমার প্রেমের সঙ্গে তোমার শুভদৃষ্টি হবে বলেই কি তুমি নক্ষত্রদীপের অর্ঘ্যপাত্র সাজিয়ে এত যুগ পথ চেয়ে বসেছিলে? প্রেমের এই শুভদৃষ্টি হবে, সে এসে তোমার গলায় তার মিলন-মালা পরিয়ে দেবে, সেই প্রতীক্ষাই কি এই আকাশভরা নক্ষত্রালোকের মধ্যে এতকাল ছিল?

যে-দিন আমার প্রেম এল, সে-দিন সে এমন কিছু রহস্যময় দান তোমার অন্তরের মধ্যে দিয়ে গেল যা ধ্রুবতারার চেয়েও ধ্রুব হয়ে তোমার হৃদয়ে চিরদিন বিরাজ করবে, যা তোমার সব অভাবকে পরিপূর্ণ করে ধন্য করে সার্থক করে দেবে।

আলোচনা—যখন বিশ্বভুবনের সঙ্গে আমার প্রেম যুক্ত হল তখনই আমি তাকে পরিপূর্ণভাবে পেলাম। তখন বিশ্বভুবনের যে-সৌন্দর্য যে-পরিপূর্ণতা দেখলাম তা কখনও পূর্বে দেখা সম্ভব হয় নি। এই প্রেমের যোগে তোমাকে অপূর্বভাবে পেয়ে শুধু আমিই সার্থক হই নি, তুমিও এর প্রতীক্ষা যুগযুগ ধরে করে এসেছ। তার সঙ্গে যখন তোমার যোগ ঘটল তখন তুমিও তার কাছে এমন কিছু পেলে যা তোমার নিত্য-সম্পদ্ হয়ে রইল। তাতে তুমিও ধন্য হলে।

১৮ নং

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি……

ব্যাখ্যা—যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি ততক্ষণ জীবনে যতসব বস্তুর ভারই সঞ্চয় করতে থাকি। তখন আমার চলাও বন্ধ, আমার সঞ্চয়গুলিও তখন অচল, তারাই দিবানিশি তখন আমাকে ঘিরে থাকে। সেই সঞ্চয়ের পাহারায় আমার নয়নে আর নিদ্রা থাকে না। মনের মধ্যেও সেই বোঝা ক্রমেই ভারী ও ক্রমেই

দুর্বহ হয়। ঘুণের কীট বইয়ের পোকা যেমন তাদের আশ্রয়কেই খায় আর সেখানেই তাদের উচ্ছিষ্ট জমায় তেমনি আমিও বসে বসে কেবল খাচ্ছি আর উচ্ছিষ্ট জমাচ্চি। দুঃখের বোঝা বাড়তেই থাকে, নতুন নতুন দুঃখ এসে সেই বোঝাকে আরো দুর্বহ দুঃসহ করে তোলে। জীবনের আনন্দ যখন বিদায় নেয়, তখন তার স্থানে এসে বসে অতিবৃদ্ধ প্রবীণ সতর্ক বুদ্ধি। প্রবীণতার সতর্ক সন্দেহের ভারে জীবন তার তারুণ্য হারিয়ে জরাজীর্ণ হয়ে ওঠে। (১ম)

যখন সেই অচলতার অভিশাপ দূর হল তখন চলার আনন্দে, গতির বেগে, বিশ্বের আঘাতে আমার আবরণ ছিন্ন হয়ে গেল। এই আবরণ দিয়েই বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়ের পোঁটলাটি বেঁধেছিলাম। পোঁটলা ছিঁড়তেই এতকালের সযত্ন-সঞ্চিত বেদনাগুলি আপনিই পড়ে যেতে থাকল।

অচল বাঁধা সব মতগুলিই (fixed opinion) মলিন অপবিত্র। প্রাণধারা রুদ্ধ হলে যেমন দেহ ও স্বাস্থ্য বিষিয়ে ওঠে তেমনি মনের গতি বদ্ধ অচল হলেই তা হয় বিষাক্ত ও অশুচি। এই মলিনতার নামই জরা। চলার পুণ্য গঙ্গায় স্নান করে চরণামৃত (চলনামৃত) পান করে আবার আমার তারুণ্য যেন ফিরে এল। আমার নবীন যৌবন নব-নব সৌন্দর্যে ও সম্পদে প্রতিক্ষণে বিকসিত হতে লাগল। জরার মলিনতা জীবনকে জড়িয়ে আছে। চলার দ্বারা সেই স্থবিরতা দূর করা চাই। চলার বেগে প্রাণশক্তি (vigour) পেলে পুরাতন বোঝা ঝেড়ে ফেলতে পারি। পথ-চলাই জীবন। নিত্য-নবীন চলার আনন্দেই জীবন-যৌবনের পরিপূর্ণতা। (২য়)

তাই আমি সঞ্চয়ী নই, বিষয়ী নই, আমি চিরদিনই যাত্রী। চিরদিন সম্মুখের পানে চেয়েই আমি এগিয়ে চলব। কেন পিছন হতে আমাকে বৃথা ডাকা ? যাত্রীকে তো কেউ পিছন থেকে ডাকে না।

সঞ্চয় ও স্থবিরতাই মৃত্যু। সেই মৃত্যুর সঙ্গে তো আমার এমন কোনো গোপন প্রেম নেই যে অচল সংকীর্ণ ঘরেই বদ্ধ হয়ে চিরদিন পড়ে থাকব। পথের পথিক হয়ে আমি চিরযৌবনের গলায় আমার বরমাল্য পরিয়ে দেব। আমার কাব্য-সংগীত-রচনা-আনন্দ সব দিয়ে যে বরণমালা সাজিয়েছি সে তো তারই সঙ্গে মিলনের জন্য। আজ বার্ধক্যের স্তূপাকার আবর্জনার ভার ঘুচিয়ে দেব। সেই আবর্জনার ভারে সৃষ্টি ও আনন্দ মৃতপ্রায়, শুধু সতর্ক বুদ্ধি ও সঞ্চয়েরই চলেছে আজ জয়জয়কার। (৩য়)

ওরে মন, যাত্রার আনন্দ-গানে আজ আকাশ ভরপূর। চেয়ে দেখ, অনন্ত

আকাশে চন্দ্র-তারা-রবি যাত্রার সংগীত গেয়ে তোর সাথে সাথে চলেছে। তোর যাত্রার রথে বিশ্বকবি সমাসীন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আজ চলার আনন্দে-পূর্ণ। এমন দিনে যদি তুই তোর যাত্রা স্থরু করিস তবেই তুই ধন্য, তোর জীবনও ধন্য। (৪র্থ)

[শ্রীনিকেতনে সেদিন পৌষ-প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে অপূর্ব এক আনন্দে ধন্য হয়েছিলাম। দেখলাম গ্রহ-নক্ষত্র সব চলেছে, অরুণ চলেছে, আলোক চলেছে, বিশ্বপ্রাণলীলা চলেছে। আমার প্রাণ-মনও সঙ্গে সঙ্গে চলতে চাইল]

১৯ নং

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;…*

ব্যাখ্যা—সত্যিই আমি জগৎকে ভালবেসেছি। জগৎকে এই ভালবাসাতেই আমার আনন্দ। প্রেমের আলিঙ্গনে আমি জগৎকে আমার জীবন দিয়ে জড়িয়ে ধরেছি। প্রভাত-সন্ধ্যায় বিশ্বের আলো-অন্ধকারকে আমার চেতনায় উচ্ছ্বসিত করে দিয়েছি। তারাও আমার চৈতন্যকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। অবশেষে আমার জীবন ও আমার ভুবন এক হয়ে গেছে। জীবনকে ও জগৎকে আজ আর আমি আলাদা করে দেখি নে বা বিচ্ছিন্ন করে ভালবাসি নে। আমার ভালবাসার মধ্যেও একটি যোগের মহত্ত্ব আছে। জগৎকে ভালবাসি, তাই জীবনকেও ভালবাসি। চন্দ্রসূর্যতারাময় আমার ভুবন যদি হারাই তবে আমার জীবন কিসে ভাল লাগবে? আমার জীবন ও ভুবন তো বিচ্ছিন্ন নয়। আমার চৈতন্য ছাড়া জগতেরও কোনো অর্থ নেই। তখন তা একটা শূন্য (abstraction) মাত্র। উভয়কেই উভয়ে পূর্ণ করচে, সার্থক করচে। (১ম)

জগৎকে যে আমি ভালবাসি তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। তবু একথাও সত্য যে একদিন এই জগৎকেই ছেড়ে চলে যেতে হবে, মরতে হবে। জগতের প্রাণ-সমীরণে আমার বাণী যে আজ ফুলের মত ফুটচে একদিন তা আর ফুটবে না, আমার বাণী নীরব হয়ে যাবে। আমার নয়নে নিখিল আলোকের

---

* গ্রন্থভূমিকা দ্রষ্টব্য।

যে মিলন-উৎসব তা শেষ হয়ে যাবে। অরুণের আহ্বানে হৃদয় আমার যে আজ ছুটচে সে আর সেদিন সে আহ্বানে সাড়া দেবে না।

অন্ধকার হলেও রাত্রি একটা শূন্য-কাল মাত্র নয়। প্রেমিকের প্রেম-মিলনের সেই তো যোগ্য অবসর। 'এখন যে রাত্রি আমার কানে প্রিয়জনের মতো আজ প্রেম-রহস্যের কত কথাই বলচে, সেই রাত্রিও তখন আমার কাছে মূক হয়ে যাবে। তখন আমার শেষদৃষ্টি শেষকথা চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। মৃত্যুর মহা-বিচ্ছেদকে অস্বীকার করি নে। জগৎকে খুব ভালবাসি, তবু সেই বিচ্ছেদ যে নিশ্চিত ঘটবে তাও জানি। (২য়)

জগৎকে এমন একান্ত করে চাওয়াও যেমন সত্য তেমনি জগৎকে একেবারেই ছেড়ে যাওয়াও তেমনি সত্য। চাওয়া ও যাওয়া এই দুই সত্য যদি এমন পরস্পর-বিরুদ্ধই হয় (যদি এই contradictionও তেমনি সত্যই হয়), তবে এর সামঞ্জস্য কোথায়? এই দুয়ের মধ্যে কোথাও একটা নিগূঢ় যোগ নিশ্চয়ই আছে, নইলে এত বড় একটা ফাঁকির ভার বিশ্বজগৎ কখনও এতকাল বইতে পারত না। আমি জগৎকে ভালবাসলাম আর সে আমায় ফাঁকি দিল—এ কি সামান্য প্রবঞ্চনা? জগতের সঙ্গে এত প্রেম, এত তার আনন্দ, তার মূলে যদি সবই শূন্য হয় তবে কি দারুণ কথা!

এত বড় নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা যদি সত্য হত তো বিশ্বজগতে তার পরিচয় পাওয়াই যেত, তবে তার সৌন্দর্য মলিন হয়েই যেত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্রূরতার একটি বলি-রেখাও কি তার অম্লান তারুণ্যের লাবণ্যকে কখনো জীর্ণ মলিন করেছে? বিশ্বের আদর যদি প্রবঞ্চনা মাত্র হত, যদি মৃত্যুটা একান্ত মৃত্যুই হত, তবে তার মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে যেত।

মিথ্যা প্রবঞ্চনার ভার তো কম নয়। সেই দুঃসহ ভার বহন করে সে আর মুখের হাসিটি বজায় রাখতে পারত না। ফুলের মধ্যে পোকা লাগলে তার সৌন্দর্য নিঃশব্দে নিঃশেষে শুকিয়ে মলিন হয়ে যায়। বিশ্বের প্রেমে পুষ্পের কীটের এত বড় একটা প্রবঞ্চনা থাকলে তার সব আলো একেবারে কালো হয়েই যেত। কিন্তু সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের মতো বিশ্বের সৌন্দর্য এই কথাই বলচে যে জগতের আনন্দ কখনো শূন্য নয়, মৃত্যু কখনো চরম সত্য নয়, মৃত্যু জীবনেরই পরম পরিপূর্ণতা। সৌন্দর্যের উপর জগতের এই পক্ষপাতেই (emphasis) বোঝা যাচ্ছে মৃত্যু একটা রসাতলগত শূন্যতামাত্র (abyss) নয়, মৃত্যু কখনো চরম সত্য নয়।

আলোচনা—[গ্রন্থভূমিকা দ্রষ্টব্য]—শ্রাদ্ধকালের 'মধুবাতা' মন্ত্র এক অপূর্ব মন্ত্র। মৃত্যুর সঙ্গে আনন্দময় অনন্ত জীবনের কোথাও অসঙ্গতি নেই, জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের যোগেই পূর্ণ—ভারতীয় এই শাশ্বত মহাসত্য নানাভাবে আমাদের রচনায় ধরা দেবেই।

জীবন-মৃত্যুর বিরোধের (contradictionএর) মধ্য দিয়েই যে গভীর যোগ, সে কথা আমি 'ফাল্গুনী' নাটকে বিশেষ করে বলেছি। দিন যেমন রাত্রির মধ্য দিয়ে প্রতি প্রভাতে নূতন হয়ে আসে, তেমনি নাম ও রূপ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই নব নব জীবন পায়। মৃত্যুর মধ্যে ডুব দিয়েই সীমা পায় অসীমত্বের অমৃত আশীর্বাদ। মৃত্যুর ভয়ে রূপ যদি তার গতি ছেড়ে দিয়ে অচল স্থবির হয়, যদি সে তার জীবন-প্রবাহ-তারল্য (fluidity) হারায়, তবেই তার সর্বনাশ। সেখানেই তার অচল সমাধি। মৃত্যুই জরাজীর্ণ জীবনকে বার বার মুক্তি দিয়ে নতুন করে দেয়। মানব-ইতিহাসে দেখা যায় গতি যখনই প্রথায় বদ্ধ হয় তখনই প্রলয় এসে সেই বন্ধন ঘুচিয়ে দেয়। এরই নাম নবযুগ।

সীমা ছাড়া অসীমের প্রকাশ অসম্ভব। অথচ একটি বিশেষ সীমার মধ্যেই অসীম-প্রকাশের চরম সার্থকতা নেই। রূপের মধ্যে যখন সে বদ্ধ হয় তখন মৃত্যুই সেই বাধা ভেঙে দিয়ে অসীমের গতিকে নবরূপে সঞ্চালিত করে। সীমার বেড়াভাঙা হল উল্টো (negative) দিক্। বেড়া ভেঙে নবজীবনের নবীন আনন্দে প্রবাহিত হওয়াই হল তার সোজা (positive) দিক্। এই দুইয়ে বিরোধ কোথায় ?

জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবহমান মানবীয় জীবনধারার একটি ঐক্য আছে। কিন্তু তা জন্মান্তরের বিস্মৃতিতে খণ্ডিত। তা নৈলে আমাদের একটা দুঃসহ অনাদি স্মৃতির বোঝা বইতে হত। এক একটি মৃত্যুর বিস্মৃতির সিংহদ্বার দিয়ে সেই ধারা সর্বমালিন্যমুক্ত লঘু হয়ে নবীন হয়ে সুন্দর হয়ে বেরিয়ে আসচে। বিস্মৃতির বিচ্ছেদ সত্ত্বেও অবিচ্ছিন্ন এই প্রবাহ।

আমার এই জীবনও আমার অখণ্ড সত্তার একটি খণ্ড রূপ। সে একদিকে বদ্ধ, অন্যদিকে মুক্ত। এই বেড়ারও অবসান আছে, এই জীবনালোকেরও মেয়াদ (term) আছে। তবু আমার চেতনা বিশ্বব্যাপ্ত। বিশ্বের সঙ্গে তার যোগও বজায় আছে। কথাটা অদ্ভুত হলেও অসংগত নয়। গর্ভের মধ্যে যখন ভ্রূণ রয়েছে তখন বিশ্বের সঙ্গে তার যোগটা কোথায় ? সেখানে তো তার ইন্দ্রিয়গুলো থাকার কোনো অর্থই নেই। তার শ্রবণের সেখানে শব্দ

কই ? নয়নের সেখানে আলোক কই ? এই সবই সূচিত করছে যে এই ভ্রূণ-জগৎ এই সঙ্কীর্ণ অবস্থা হতে মুক্তি পেয়ে ভ্রূণকে বৃহত্তর জগতে যেতে হবে। সেখানেই তার এইসব ইন্দ্রিয়গুলি সার্থকতা লাভ করবে। তাই বহু দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে ভ্রূণকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে একদিন বেরিয়ে আসতে হয়। ডিমের মধ্যকার পক্ষি-ভ্রূণ আপন চঞ্চুর আঘাতে আপন খোলা ভাঙে। নবতর জীবনের জন্য এই আঘাতের নামই মৃত্যু।

এইসব কথাকে কাব্য (poetry) বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। আনন্দ দিয়ে দেখাই হল কাব্য। আনন্দই তো সত্যের সোজা (positive) দিক্। আনন্দের এই সহজ ঘোষণা তো দার্শনিক মতবাদমাত্র (speculation) নয়। তবু তাকে আমি অগ্রাহ্য করতে পারি নে। উল্টো (negative) দিক্ দিয়ে দেখলে দেখতুম কেবলি জরা কেবলি মৃত্যু।

কিন্তু আনন্দ ক্রমাগতই বলছে, 'শুধু হায় মৃত্যুকেই দেখলে! মৃত্যুর সিংহদ্বার পার হয়ে জীবন যে তার জয়যাত্রায় আনন্দে নিত্যকাল চলেছে সেইটে দেখলে না ?' কাজেই এখানেও সোজা (positive) এবং উল্টোর (negative) মধ্যে বিরোধ নেই। সীমা ছাড়া অসীমের প্রকাশ নেই, অসীম ছাড়া সীমারও সত্তা নেই। উভয়ই উভয়কে পূর্ণ করচে। মৃত্যুর পর মৃত্যুর কারাগার ভেঙে ফেলে আমাদের জীবন শাশ্বত স্বরূপকেই প্রকাশ করচে।

ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে বিলেতে আমার এই বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। তাঁরও এই মত। আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটা আবর্ত্তন (cycle) আছে। সেটাকে সম্পূর্ণ করলেই স্মৃতির ধারা পূর্ণ হয়। এখন আমার গতি সামনের দিকে, পিছনের কথা মনে নেই। আবর্ত্তনটা পূর্ণ হলেই সামনের ও পিছনের যোগটি সুসংগত হবে। চক্রের পরিধিতে যেখানেই আরম্ভ সেখানেই অবসান। আরম্ভ ও অবসানে তো সেখানে কোনো বিরোধ নেই।

তত্ত্ববাদের মধ্য দিয়ে এইসব কথা আমি জানি নি। আমার জানা আমার আনন্দের নিগূঢ় অনুভবে। আমার কবিতায় বারংবার তার পরিচয় পাওয়া গেছে। জনমে জনমে আমি তাঁকে বলেছি—

এখানেও তুমি জীবন-দেবতা ?*

তাঁকে বলেছি—

* চিত্রা, সিন্ধুপারে।

জনমে জনমে রহ তবে রহ……*

তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছি—

নূতন করিয়া লহ আর বার
চির পুরাতন মোরে।‡

তাঁর সঙ্গে কত লোকে কত ভাবে কত দেখাই হয়েছে।

[কত যুগে, কত লোকে,
কত চোখে, কত জনতায়,
কত একা! (বলাকা, ৪০নং)]

এই জীবনের সন্ধ্যাতেও এই জনমের খেলা শেষ করে নবরূপ পরিগ্রহ করতে হবে।

[এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ ;
সন্ধ্যা হ'ল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ। (বলাকা, ৪৩নং)]

এইসব কথা আমি কেমন করে বলেছি তা বলা শক্ত। হাতড়াতে হাতড়াতে (grope) অজ্ঞাতসারে অন্তরের-আনন্দে-পাওয়া আমার এই অভিজ্ঞতার প্রকাশ 'জীবন-দেবতা' জাতীয় (group) কবিতাগুলোতে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অন্তর্গূঢ় আনন্দে অন্তরে-অন্তরে আমার সম্পূর্ণ আবর্তনটি পূর্ণ হল, আরম্ভ ও অবসান-বিন্দু এক হয়ে গেল, আনন্দের মধ্যে আমার মন দীপ্ত হয়ে উঠল, বুঝতে পারলাম।

আমাদের এই জীবনের মধ্যেও এক একটা আবর্তন আছে। তা পূর্ণ হলে তবে তার মর্মগত সত্যটি (significance) বুঝতে পারা যায়। উপাখ্যান শেষ হলে তার সব ঘটনার সমষ্টিগত তাৎপর্যটির পরিচয় পাওয়া যায়। আবর্তনের পাকে ক্রমাগতই সামনে এগিয়ে চলেছি। চক্র পূর্ণ হল, আরম্ভ ও অবসান যুক্ত হল, স্মৃতির ঐক্যধারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল। সব খণ্ডিত অনুভূতি ঐক্য লাভ করে পরিপূর্ণ সত্যটি বোঝা গেল।

খণ্ড খণ্ড করে দেখলে পূর্ণ সত্যকে দেখা যায় না। তর্ক হল বিশ্লেষণ (analyse) করে খণ্ড খণ্ড করে দেখা। কাজেই তর্কে যে-সব সত্যের প্রমাণ

* অন্তর্যামী, চিত্রা।

‡ জীবনদেবতা, চিত্রা।

নেই সে-সব সত্যও ধরা পড়ে আমাদের হৃদয়-নিহিত চেতনার (instinct) মধ্যে। ডিমের মধ্যে যে পাখীর ছানা সে কি জানে ডিমের বাহিরের বিশ্বের খবর? তার প্রমাণ কই? বরং তার ডিমের খোলাটাতে তার উল্টো প্রমাণই তার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে। তবু তার নিহিত চেতনার প্রেরণায় সে ক্রমাগত ডিমে আঘাত করচে। ডিমের খোলার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলতেই এই খোলাতেই তো শেষ। তার চেতনার তাগিদ তার নিশ্বাস বলছে 'কক্‌খনো না। তবু এইটুকুর মধ্যে স্থিতি মিথ্যা, মুক্ত জগতের মধ্যে গতিই সত্য। বাধা বন্ধন সব ভেঙে ফেল।'

যে ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের নানাভাবে সেবা করছে তাদের অবিশ্বাস করি কেমন করে? তাই ইন্দ্রিয়পরায়ণেরা বলেছেন—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

বিষয়ী লোকেরাও বলছেন 'যা আমাদের প্রত্যক্ষ সুখ-সম্পদ্ তাকেই জমিয়ে তুলে জীবনকে ধন্য কর।' কিন্তু আমাদের মন সকল ইন্দ্রিয়ের সর্ববিধ সেবা পেয়েও অকৃতজ্ঞের মতো বলছে 'যা প্রত্যক্ষ তা-ই চরম সত্য নয়।' পাখীর মতো আমাদের নিগূঢ় চেতনায় এই প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে চিরদিন একটা বিদ্রোহ রয়েছে। প্রত্যক্ষগম্য এইসব ইন্দ্রিয়ের কথা বিশ্বাস না করে আমাদের ধর্মও একটা বৃহত্তর জীবনের কথাই স্বীকার করেছে, নইলে সে ঐহিক সুখসম্পদ্ অগ্রাহ্য করতে পারত না। সব তর্কের উপরে এই বিশ্বাসই ধর্মের প্রাণ। তাই বলে বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। এই জগতের গোটাকয়েক ইন্দ্রিয়ের প্রমাণই চরম কথা নয়। সব দিকের সব প্রমাণ সংগত করেই পরম সত্যের ও চরম সত্যের পরিচয়।

প্রত্যক্ষগম্য সত্যের ও তর্কের সাক্ষ্যকে অতিক্রম করেও এই যে একটা বৃহত্তর সত্যের উপরে বিশ্বাস, তার নামই ধর্ম। যুগে যুগে বিশ্বমানবের ইতিহাসে এই প্রেরণারই (urging) জয়জয়কার দেখা গিয়েছে। বর্বরদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে ঠিক বিদ্রোহ না থাকলেও তাদের ধর্মেও ইহলোকের পরেও উত্তর-লোকের কিছু একটার সূচনা পাওয়া যায়। তাদের জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে (culture) এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে সত্যকে তারা আরও ভাল করে দেখতে পেত। তবু তাদের ধর্ম প্রত্যক্ষকেই চরম বলে মানতে বাধা দিয়েছে। নইলে তাকে আর ধর্ম বলা চলত না।

জ্ঞানবুদ্ধি যখন ইন্দ্রিয়ের গণ্ডি পার করে এগিয়ে জ্ঞানের জগতে আমাদের নিয়ে যায়, তখনই বৃহত্তর সত্যের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। আবার জ্ঞানজগৎও একটা গণ্ডি। তারও পরে অধ্যাত্মজগৎ। সেখানকার সত্যকে জানবার জন্যও আমাদের মধ্যে প্রেরণা রয়েছে—'ভূমৈব সুখম্'। সেখানকার সত্য আরও বিরাট্। যাঁরা একটার পর একটা গণ্ডি পার হয়ে ক্রমাগতই এগিয়ে চলতে পারেন তাঁরাই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন—

অমৃতাস্তে ভবন্তি।

নাম-রূপের (form) মধ্যে দুটি জিনিষ রয়েছে। রূপ রয়েছে বলেই তার খানিকটা প্রকাশ পাচ্ছে, আর তার সেই রূপ দিয়েই খানিকটা আড়াল করেও রাখা হয়েছে। যা আমরা দেখছি তাতেই তো তার অতীতকে তারই দেহ দিয়ে আড়াল করে রাখচে। রূপ হল হিরণ্ময় পাত্র। তাতেও তো সত্যকে আড়াল করে।

['সত্যস্যাপিহিতং মুখম্' (ঈশ, ১৫)]

একমাত্র পরম সত্য অরূপ বলে তিনি কিছু আড়াল করেন না। তিনি—

সর্বা দিশঃ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে।*

কাজেই পরম সত্যের পথে সব নাম ও রূপকে ভেঙে অতিক্রম করতে হয়। মৃত্যু এই গণ্ডি ভেঙে মুক্তি দেয়। মৃত্যুতে বিনাশ নয়। মৃত্যুতেই পরমাগতি, মৃত্যুতেই নব নব প্রকাশ।

২০ নং

আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি'......

বোলপুরে পৌষ উৎসব শেষ করে ২৯শে পৌষ কলিকাতা চলেছি, পথে ট্রেনে বসে এই কবিতাটি লেখা। এটাতে সুর দিয়ে গান করে দিনুকে শেখাই।

গান ও কবিতা এক নয়। গানে সুরের জন্য কথার মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে। তবে এটাতে কবিতার ভাবও কিছু থাকায় কবিতারূপে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে।

দুঃখ ও বেদনার মহত্ত্বের একটা স্পষ্ট ধারণা আমাদের মনে নেই। দুঃখ-বেদনা নিজেই নিজেকে তীব্রভাবে জানায়। মুখেও আমরা বারবার দুঃখ-

* শ্বেতা, ৫, ৫, ৪।

বেদনার কথা বলি বটে। কিন্তু সত্যই কি আমরা তার যথার্থ মহত্ত্বের কথা বুঝি? বেদনাই আমাদের কাছে একটা বৃহত্তর সত্যকে জানায়। সংস্কৃতে 'জানানো' অর্থ হতেই 'বেদনা' শব্দের উৎপত্তি। দুঃখ-ব্যথা-বেদনা যে মুক্তির আনন্দকে সূচিত করে এই সত্য আমি মনে মনে বিশ্বাস করি আর জীবনেও তা উপলব্ধি করেছি। বেদনা কেমন করে মুক্তির আনন্দ জানায়? আরামের মধ্যে থেকেও যখন আমরা সত্যকে পাই তখন সব সময় সত্যকে ঠিকমতো পাই না। যখন আনন্দ ও সত্য আমাদের বেদনার পাত্রকে ছাপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তখনই আনন্দের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ঘটে। এক হিসাবে বেদনাকে আনন্দ-রসের পাত্র বলা চলে।

বেদনা-জয়ের আনন্দেই মানব-জন্মের সার্থকতা। ক্ষতির উপরে জয়লাভ করেই সম্পদের যথার্থ মাহাত্ম্য। ক্ষয়-ক্ষতির উপরে সম্পদের এই জয়ে বুঝতে পারি যে, এরা আমাকে বাঁধতে পারে নি। আমি সর্ববাধাজয়ী। মানবাত্মা অপরাজেয়। ঘোর দুঃখকে পরাজিত ও প্লাবিত করেই যে আনন্দের বন্যা আসে সেই কথাই জীবনে উপলব্ধ সত্য। আনন্দই নিন্দা অপমানকে জয় করতে পারে, ক্ষয় ক্ষতিকে জয় করতে পারে। বৈরাগ্য এই অভিজ্ঞতারই প্রকারভেদ মাত্র। দুঃখ-বেদনার এই মহত্ত্ব কথার কথা নয়। কবিত্ব বলে একে উড়িয়ে দিলে চলবে না।

ব্যাখ্যা—বারবার বলা হলেও পুনরায় বলতে হবে, দুঃখ-বেদনার গভীর মূল্য আমাদেরই জীবনে। ব্যথার বাঁশিতে যে আনন্দের সুর বাজে তা বিশুদ্ধ। ভোগের আনন্দ শুদ্ধ নয়। দুঃখেই জীবনের পরিপূর্ণতা। সুখ ও দুঃখ পরস্পরবিরোধী। আনন্দ ও সুখ এক কথা নয়। আনন্দ সুখের উপরে। আনন্দের মধ্যে সুখ-দুঃখের বিরোধ শান্ত। উভয়েরই সার্থকতা আনন্দে। আনন্দ সুখদুঃখ উভয়কে আশ্রয় দিয়ে যুক্ত করে মহৎ করে তোলে। দুঃখের সমিধ্ জ্বেলে সেই দীপ্তিতে আনন্দের মুখ উজ্জ্বল। সুখকে আনন্দ মনে করলে আনন্দেরই নিদারুণ অপমান। আজ আমার ব্যথার বাঁশিতে আনন্দ-গান শুদ্ধ সুরে বেজে উঠুক। আজ আমার জীবন-তরণী অশ্রুজলের সাগর পার হবার জন্য পাড়ি ধরুক। (১ম)

বসে থাকার জন্য বহু আয়োজন বহু সঞ্চয় চাই। যেতে হলে সেইসব চুকিয়ে দিয়ে ভার ফেলে যেতে হয়—এই আয়োজনের স্তূপ যে তখন ব্যর্থ ভার হয়ে ওঠে। চলবার সময় চাই লঘুতা রিক্ততা। সেই এগিয়ে যাওয়ার হাওয়া

উঠেছে। এখন তীরের বাঁধন খোল, পোঁটলার ভার ফেল। পোঁটলা-বাঁধবার সেই বস্ত্রখানিই মুক্ত করে তরণীতে পাল টাঙিয়ে দাও। এই হাওয়ার প্রতীক্ষায়ই সারা রাত্রি বিনিদ্র ছিলাম। (২য়)

অজানা অকূল সাগরে ঢেউ উঠেছে। কালো জলের উপর শুভ্র ফেনরাশি অট্টহাসির মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে হয়ে উঠছে। আমার হৃদয়েও সেই দোলা লেগেছে। দুঃখের কালো ঢেউয়ের উপরে শুভ্র হাস্যের ফেনা কেন? সাগরে তরণীকে তরঙ্গ-ফেনা পার হতে হয়। আমার হৃদয়-তরণীও অজানা সাগরে দুঃখের উপরে শুভ্র দীপ্তিতে উচ্ছ্বসিত অট্টহাসি পার হয়ে চলুক। বেদনার ভিতরে যদি আনন্দ-তান ওঠে তবেই তো সুর সার্থক। আমার বাঁশিতে আজ আনন্দ-তান বাজিয়ে তোল। (৩য়)

যা জানা, তা ধনজনের বেড়ায় মানের বেড়ায় সীমাবদ্ধ। যখন ব্যথা-বেদনা-ক্ষতির মধ্য দিয়ে অজানা বন্ধু আসেন তখন তিনি এইসব ধনজনমানের বাঁধন ঘুচিয়ে দেন। অজানার সুর তো আরামের সঙ্কীর্ণ বেড়ার মধ্যে বাজে না। ব্যথার মুক্ত আকাশেই তা বাজে। অজানার অপূর্ব সুর আজ আমার ব্যথার বাঁশিতে বাজুক। প্রকৃতির ধর্মেই জল নিম্নগামী। নিচের দিকেই জল চলে। প্রাকৃত মনও সুখার্থী, সুখের দিকেই মন ক্রমাগত নেবে যেতে চায়। আমাদের প্রাকৃত প্রবৃত্তিগুলিও জীবধর্মের সহজ তাড়নায় নিচের দিকে গড়িয়ে গিয়ে তৃপ্ত হতে চায়। যাঁরা আদর্শবাদী তপস্বী তাঁরা এই নিম্নগামী পশু-ধারাকে উল্টে উজানে বহাতে চান। কায়া-যোগের এই তো গূঢ় কথা। তাঁরা ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা চান না, সেই ধারাকে ঊর্ধ্বদিকে চালিত করে দুঃখে বেদনায় তাকে বিশুদ্ধ করতে চান (sublimate)। আজ সাগরে যে হাওয়া এসেছে তা উজানের হাওয়া। এই হাওয়ায় তরী ভাসালে প্রবৃত্তির স্রোতের প্রতিকূলে দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে তরীকে অগ্রসর হতে হবে। উজানের হাওয়া আনন্দে সেই দুঃখসাগর-যাত্রায় ডাক দিয়েছে। (৪র্থ)

সেই অদেখা বন্ধুর ডাক এসেছে। যাঁকে কখনো চক্ষে দেখি নি তাঁর বিরহেই ব্যাকুল হয়েছি। ঘরে আর মন টিঁকছে না। অন্তরে বিরহ রয়েছে বলে দুঃখই স্বীকার করব। আজ আর অনুকূলের দিকে যাওয়া নয়, প্রতিকূলের দিকেই যাব। সুখ ও অভ্যস্ত আরাম হতে বিদায় নিয়ে তাঁর সঙ্গেই আজ মিলন চাই যাঁকে কখনো চোখে দেখি নি।

যাঁকে জানি তাঁকে হারিয়ে আমার এই বিরহ নয়। যাঁকে পাই নি তাঁর

বিচ্ছেদেই এই অসহ্য বিরহ। এই বিরহ-অবসানের যে ডাক এসেছে তার পথ দেখছি পরম দুঃখের মধ্য দিয়ে। দারুণ দুঃখেই তাঁর পরম স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। দৈনিক তুচ্ছতায় তাঁর স্বরূপ আচ্ছন্ন হয়, তাঁর কথা চাপা পড়ে। দুঃখেই সেইসব বাধা সরে যায়, স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। (৫ম)

তিনি যে ক্ষ্যাপা পাগল। তিনি প্রাত্যহিকের (routine) অর্থহীন পুনরাবৃত্তির বাঁধন ছিন্ন করেন, অভ্যাসের (normal ও average) বেড়ায় আগুন লাগান। তাঁর প্রলয়ের সুর আমার ব্যথার বাঁশিতে বেজেছে। আমার বাসার আশা ঘুচেছে। অকূল নিরুদ্দেশের পানে তরী ভাসিয়েছি, শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছি। (৬ষ্ঠ)

২১ নং

ওরে তোদের ত্বর সহেনা আর……

১৮নং কবিতাটি সুরুলে ২৯শে পৌষ ভোর বেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে মনের মধ্যে এল। ১৯ নম্বরটি মনের মধ্যে এল সূর্যোদয়ের পর। কলিকাতায় যাব। দুটো কবিতাই যাত্রা করার পূর্বে মনের মধ্যে পেয়ে ঘরে বসে লিখে ফেললাম। ২০নং কবিতা বা গানটি ট্রেনে চলতে চলতে মনের মধ্যে পাওয়া গেল। তখনই লেখা ও সুর দেওয়া হল। তারপরও ট্রেনে চলেছি।

পৌষের দারুণ শীতের মাঝে কখনও কখনও দক্ষিণা হাওয়া চলে। দুই একদিন থেকে তেমনি দক্ষিণ হাওয়ারই পরশ পাচ্ছি। রেলের দুইধারে নানা রকমের ফুল সেই অকালবসন্তসমীরণের ডাকের চোটে একেবারে তাড়াহুড়ো করে (hurriedly) ভিড় করে (rush) দৌড়ে বেরিয়ে পড়েচে। ফুলের দল অকাল-বসন্তের ডাক শুনে রঙ-বেরঙের বসনে যে যার বেরিয়ে পড়েচে। দলে-দলে ছন্দে-ছন্দে পা ফেলে (march করে) তারা চলেছে কোথায়? এমনটি বহুদিন দেখি নি। যে দোলা আজ আমার মনে লাগল তা চাইল গানের রূপে ধরা দিতে। কিন্তু সুর বড় লাজুক, বড়ই কুনো (exclusive)। হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে সেই যে সে গা ঢাকা দিল, তার আর দেখাই পেলাম না। একটা করুণ সুরে সে কতকটা এগিয়ে ছিল, তার মধ্যে এই একটুখানি মনে আছে—

সাঁঝ না হতে জাল্‌লি আকাশ-দিয়া।

জোড়াসাঁকো এসে আট নয়-দিন পর্যন্ত অনেক সাধ্য-সাধনা করা গেল। কিন্তু আমার ভীরু অন্তঃপুরবাসিনী সেই যে অভিমানে ভিতরে গেলেন আর তিনি কিছুতেই দেখা দিলেন না। তার উপরে মাঘোৎসবের গান শেখানো হচ্ছে, নানা আয়োজন চলেছে। তাই আর কিছুতেই তাঁকে বাইরে আনা গেল না। তখন বাধ্য হয়ে **'আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি'** গানটাকে সুর শুদ্ধ দিনুকে দিয়ে হাল্‌কা হওয়া গেল। আর মাঘোৎসবে আরও গোলমাল আসচে জেনে ২১ নম্বর কবিতাটাও যতটা সম্ভব মনের ভিতর হতে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে উৎসবের আগেই লিখে ফেলা গেল। সুর হারিয়ে ফেললেও সুরের অনুকরণে এই কবিতাটি লেখা।

ব্যাখ্যা—বর আসচে এই খবর পেলে পুর-তরুণীদের আর তর সয় না। উৎসবের যে-বেশেই যে যেখানে থাকে, সবাই মাঙ্গল্য ও দীপ নিয়ে গান গেয়ে বেরিয়ে পড়ে। লগ্ন তো এখনো আসে নি। কোন্ দুর্লভ পথিকের পদশব্দ হঠাৎ শোনা যাওয়ায় বর্ণ-গন্ধের ডালি হাতে এইসব কুসুমের দল দৌড়ে বের হয়ে এল। বরকে হিন্দীতে 'দুলহা' বা দুর্লভ বলে। অর্থাৎ সর্বদা তাঁকে পাওয়া যায় না বলে তাঁর পদশব্দের সঙ্গে ঠিক পরিচয় নেই। অচেনা কোন্ পদশব্দে সবাই গান গেয়ে বেরিয়ে এল!

যেসব ফুল সেদিন দেখা গেল তাদের তো নাম জানি নে। তাই চাঁপা-বকুল বলেই তাদের পরিচয় দিতে হল। আমাদের দেশে কত পাখী কত গাছ কত ফুল আছে যাদের যত্ন করে কেউ চেনেও নি কোনো নামও দেয় নি। অন্য দেশে লোকেরা প্রকৃতির আদর করে স্নেহে যত্নে কত ফুলের কত নামই দিয়েছে। আমরা সব উদাসীনের দল। আমাদের প্রাঙ্গণে বার বার এইসব ফুল-শিশুদের দেখি। নাম পাবার মতো বয়সও তাদের হয়েছে। তবু আমরা এত নির্মম যে তাদের সঙ্গে ভালবেসে একটু পরিচয়ও করি নে বা তাদের একটা নামও দিতে চাই নে। সংস্কৃত সাহিত্যেও যে দুই একটা ফুলের নাম পাই তার পরিচয়ও অভিধানে 'পুষ্প-বিং' বলেই শেষ। কাজেই আমি সেদিনকার ফুলদের তাদের নিজনামে ডাকতে পারি নি। 'পুষ্প-বিং' তো আর কবিতায় লেখা চলে না। তাই চাঁপা বকুল প্রভৃতি পরিচিত নামেরই শরণ নিতে হল। শীতকালেও বকুল ফুটতে দেখেছি, তাই বকুল বলায় এখানে দোষ হয় নি। এইসব ফুলবালার দল কার পদশব্দ শুনে ছুটে এল? (১ম)

সময় না হতেই সবার আগে হুড়মুড় করে এরা যে ছুটে এল! এরা যে তাঁর দেখা পাবার আগেই বিদেয় নিতে বাধ্য হবে তা কি জানে?

যুদ্ধের কথা হয়তো তখন মনে হয়েছিল। যারা আটঘাট না বেঁধে যুদ্ধে প্রথমেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তারাই নিশ্চিত মরে। যারা হিসাব-কিতাব করে পরে যোগ দেয় তারা বাঁচে ও ফল লাভ করে।

যে-সব ফুল পরে আসবে তারাই বসন্তের সংগীতময় উৎসব পাবে। 'ওরে হতভাগা বেহিসাবীর দল, তোরা যে অকালেই বেরিয়ে এলি তাতে তো তোরা শুধু প্রাণই দিবি! শাখায় শাখায় নানা রঙে নানা গন্ধে কি হল্লাটাই না করছিস্! বাঁশি বাজিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে নিজেদের সব বলি দিতে (sacrifice) চলেছিস্! সকলকে ঠেলে ঠুলে তোরা যে সব চললি মরতে!' (২য়)

যখন দখিন হাওয়ায় নতুন প্রাণের জোয়ার দখিন হতে আসে তখন সেই ফাগুনের জোয়ার-জলে তরী বেয়ে বসন্ত আসবে। হায় হায়, তার আসবার দিনের হিসাব না করেই আগে থাকতেই তোরা আগমনীর বাঁশি বাজিয়ে দিলি! রাত না হলে তো বরের দেখা পাবি নে! ইতিমধ্যে সব সম্বলই যে খতম করে দিবি!—

সাঁঝ না হতে জাল্‌লি
আকাশ-দিয়া…

তোরা এত আগে রওনা হলি যে তোদের সম্বল না ফুরাতে দিন-থাকতে-থাকতে তো বর এসে পৌঁছবে না! তার দেখা পেয়ে জয়ধ্বনি করে যে জীবন ধন্য করবি তারও তো কোনো পথ রাখলি নে! (৩য়)

ওরে বেহিসাবী, কিছুই ভেবে চিন্তে দেখতে জানিস নে? তাঁর আসতে কত সময় লাগতে পারে, কখন্ বের হলে ভালো হয় কিছুই হিসেব (calculate) করলি নে! না জানি কোন্ পদশব্দ শুনেই ক্ষেপে উঠলি ও ঝাঁপ দিয়ে ছুটে এলি। তাঁর দেখা তো পাবি নে। তবে এইটুকু সান্ত্বনা তোদের মনে রইল যে তোদের মরণ দিয়ে তাঁর আসবার পথের ধূলা ঢেকে কোমল করে দিলি। চোখের দেখার অপেক্ষা আর করলি নে, না দেখেই জীবনের সব বাঁধন ঘুচিয়ে দিলি! তবে তার এইটুকু পুরস্কার পাবি যে তোদের মরণের উপর পা রেখে-রেখেই এর পরে তিনি আসবেন। (৪র্থ)

আলোচনা—এই ক্ষ্যাপা বেহিসাবীর দল মরল বটে কিন্তু তার পুরস্কারও

পেল। তাঁকে দেখবার আগেই এরা মুক্তি পেল। দেখা-পাবার-পরের মুক্তি-প্রতীক্ষায় আর তাদের থাকতে হল না।

যুদ্ধে কারা মুক্তি পায়? জয়ীর দল? না। যারা প্রাণ না দিয়েই হাতে হাতে জয় ও লাভ পায়, তারা মুক্তি পাবে কেন? যারা আগেই নিজেদের উৎসর্গ করে দিল, তারা ত্যাগ ও উৎসর্গের মহিমায় আপন সিদ্ধিকে চোখের দেখায় না দেখেও মুক্তি পেল। দেখা-মুক্তির চেয়ে এই না-দেখা-মুক্তি আরও মহত্তর। যারা আপন সুখভোগের আশা না করে পরের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করে দেয় তারাই তো যথার্থ দেয়। কেবল দেবার আনন্দেই যে দেওয়া তার কি কোনো তুলনা আছে?

শুধু জাতীয় জীবনেই এই কথা সত্য নয়। ব্যক্তিগত জীবনেও এটা সত্য। সে-ই ধন্য যে এ-কথা বলতে পারে যে, 'তাঁর দেখা পাবার আগেই তাঁর ডাক শুনেই বাহির হয়েছি।' এই দেওয়াটারই তো অসীম মহত্ত্ব। যা পাওয়া যায় তার মধ্যে তো অসীমতা নেই। জগতে তো কেউ পূর্ণ সার্থকতা (achievement) পায় না। প্রত্যক্ষ ফলরূপে যা মেলে তা ক্ষুদ্র, সাংসারিক হিসাবে তাতে যত লাভই দেখা যাক না কেন! আর ত্যাগে যা পাই তার আর শেষ নেই। এইজন্যই গীতায় বলেছেন—

মা ফলেষু কদাচন।

অনাসক্ত হয়ে যে ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়তে পারে সে-ই আপনার অসীম স্বরূপকে পায়। যারা শুধু ফল পেয়ে বিষয় পেয়েই খুসি তারা তো বণিক্। ত্যাগীর কাছে এই খুসির কোনো মূল্য নেই। দেবার মুক্তির জন্যই সে ব্যাকুল। পেতে হলেই থামতে হয়। পাওয়া সম্পদ্ নানা ভাবে নানা দিকে জড়িয়ে ধরে। কাজেই বন্ধনের মধ্যে ধীরে ধীরে পচে মরতে হয়। আর দেওয়া মানেই চলা। চলার আনন্দেই তার সার্থকতা। এইজন্যই 'বলাকা'তে এইসব কবিতা স্থান দাবী করতে পারে। চলাটাই হল 'বলাকা'র প্রাণ।

২২নং

যখন আমায় হাতে ধরে…

সুখ-ঐশ্বর্য যেমন বাধা, সম্মান-সমাদরও তার চেয়ে কম বাধা নয়। ভক্তমালের লেখা থেকে যখন কবীরের অপমানের কথা পড়ি তখন আমার

মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। 'অপমান বর' আমার একটা গভীর অন্তরঙ্গ ভাবের প্রকাশ। ভগবান যাকে চান তাকে সর্ব সুখ সম্পদ্ ও মান হতে বঞ্চিত করে ধূলোর আসনে নাবিয়ে আনেন। সেই চরণ-ধূলা-তলেই ঠাঁই প্রার্থনা করে প্রশ্ন করেছিলাম—

কেন আমায় মান দিয়ে
আর দূরে রাখ।

প্রার্থনা ছিল—

অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।

গীতাঞ্জলির প্রথম প্রার্থনাই হল—

মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।

যখন নিজেকে গৌরব দিতে গিয়ে নিজেকে কেবলি অপমান করি, তখন প্রার্থনা—

সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।*

মাঘোৎসবের পর এই ভাবটা আমার মনে এসে কেমন লেগে রইল। শিলাইদহতে তখন লিখলাম।

ব্যাখ্যা—আমায় যখন হাতে ধরে আদর করে তুমি পাশে ডেকে বসালে, তখন দিবারাত্রি আমার ত্রাস—পাছে অসাবধান হই, পাছে তোমার আদর হতে কিছু হারাই। অন্য সম্পদ্ যেমন আমাদের বাঁধে, তোমার হাতের আদর-সম্মানও দেখচি তেমনি বাঁধে। এও কম বোঝা নয়। সম্পদের ভারে ও বন্ধনে যেমন গতি নষ্ট হয়, তোমার সম্মানের ভারে ও বন্ধনেও তেমনি চাপা পড়ি ও জড়িয়ে থাকি। অন্যান্য ঐশ্বর্যের মত তোমার আদরও মস্ত একটা বাধা। এতে মুক্তি নেই। কোনো দিকে নিজের ইচ্ছায় পা বাড়াতে গেলেই তখন ভয়ে ভয়ে মরি, পাছে তোমার আদর হতে একটুখানি কম পড়ে যায়। যদি তুমি আমায় উপেক্ষা কর, এই তো দিবারাত্রি আশঙ্কা। এর নাম কি মুক্তি? একে তো সহজ অবস্থা বলা চলে না। (১ম)

* 'গীতাঞ্জলি'র ১নং কবিতা।

আমায় অনাদর করলে, অপমান করলে। প্রথমে মন আমার দমে গেল। কিন্তু তারপর এ কী দেখি? আমার সব বোঝা যে নেবে গেছে, সব বাঁধন খসে গেছে। দেশে দেশে আমার অপমানের খবর ছেয়ে গেল, কিন্তু আমার সব বোঝাও সঙ্গে সঙ্গেই নেবে গেল, এতদিনে ছুটি পেলাম, সহজ হলাম।

চারিদিকে এখন আমার মুক্তি শুধু মুক্তি। যে মানের খোঁটায় এতকাল বদ্ধ ছিলাম তা ভাঙতেই ছুটি পেলাম। পায়ের বেড়ি এতদিনে খসল। এবার সকলের সঙ্গে সব লেন-দেনের বাধা দূর হল। ডাইনে বাঁয়ে সব পথ এখন মুক্ত হল। এতদিন সম্মানের বন্ধনে আড়ষ্ট ছিলাম, এখন সব পথ খোলসা হল। বাউলদের একটি গানের পংক্তি কি জানি কেন ক্রমাগত মনে আসছিল—

মুক্তি যদি চাসরে খাঁটি
ভাঙরে মানের ধোঁকার টাটি।

যখন অজ্ঞাত অখ্যাত ছিলাম তখনই জীবন ছিল সহজ। তখন মুক্ত ভাবে সর্বত্র আনাগোনা করেছি। কে কী বলবে তা তখন ভাবতে হয় নি। এখন ক্রমাগত ভয় পাছে সম্মানের এই সম্পদটুকু খোয়াতে হয়! আজ আমার সেই বাঁধন ঘুচেছে। যে লাঞ্ছিত সে তো সর্বভার-মুক্ত—তার আর ভাবনা কিসের? (২য়)

এখন আমি সহজ। চরাচরের পথের ধূলোর সঙ্গে আমি এখন সমান। তাই সবাই নিঃসংকোচে আমায় ডাক দিয়েছে। লাঞ্ছিতের আর ভয় কি? আমাকে আজ বাধা দেবার কেউ নেই। ঘর-ছাড়ানো হাওয়া আজ আমাকে মুক্ত বিশ্বের দিকে ডাক দিল। সেই ডাকের নেশায় মত্ত হয়ে মুক্ত হয়ে তার সঙ্গে যাত্রা করলাম। আকাশে যেসব নক্ষত্র সম্মানের আসনে বসে আছে, তাদের পদমর্যাদা বজায় রাখতে অনেক ভাবতে হয়। আজ যখন খসা তারার মত খসে পড়তে হল তখন আমারও সব ভাবনা চিন্তা ঘুচল। 'কুছ পরোয়া নেই' বলে শূন্যে ঝাঁপ দিলাম। বদ্ধ ছিলাম, গতি পেলাম। না হয় মরণ-টানে অতল-পানে চলেছি, তবু তো মুক্তি পেয়েছি। আজ ভয় নেই, সব বাঁধন ছিঁড়েছে। (৩য়)

সন্ধ্যার মেঘের উপরে অস্তরবির স্বর্ণচ্ছটা এসে পড়েছে। স্থির হয়ে সেই স্বর্ণ-মুকুট মাথায় নিয়ে সন্ধ্যার মেঘ পশ্চিম আকাশে অচল হয়ে রয়েছে। এমন সময় কালবৈশাখীর ঝড়ের হাওয়া এসে তাকে তাড়া দিল। ঝোড়ো

হাওয়ার তাড়া খেয়ে বাঁধন-ছেঁড়া কালবৈশাখীর মেঘ তার সোনার মুকুট অস্তাচলের পায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আপন গলায় বজ্র-বিদ্যুতের অগ্নিময় রত্নহার দুলিয়ে মুক্ত হয়ে একলা আপন তেজে খোড়ো মেঘ ছুটল। আজ তার কাছে অনাদরের মুক্তিপথ মুক্ত। তোমার চরণ-ধূলায় গড়িয়ে সেই রঙে রঙিয়ে চরণতলের সমাদরে সে আজ ধন্য হবে।

আমি সেই মেঘ। আজ আমার বাইরের সম্মানের স্বর্ণমুকুট খসে গেছে। আমার আপন বক্ষের বজ্রমাণিকে আজ আমি গৌরবান্বিত। সম্মানের দিনে আমার মন ছিল পরপ্রত্যাশী। আজ আমি আপন অন্তরের মহিমায় আপন মুক্ত পথে স্বাধীন ভাবে যাত্রা করেছি।

বাইরের সম্মানের আলোক ঘুচল বটে, কিন্তু অসম্মানের মধ্যে মুক্তি পেলাম। খ্যাতির বাহ্য ঘটা ঘুচল। তোমার চরণ-ধূলার পরশে অন্তর ধন্য হল। ঐ ধূলার রঙে যদি নিজেকে রঙাতে পারি তবে জীবনে চরম সমাদর পেয়ে গেলাম। সেই মুক্তিতেই সর্ব-বাঁধন ঘুচল। (৪র্থ)

কাছে থেকে তোমাকে পাই নি, দূরে গিয়েই তোমাকে পেলাম। গর্ভের মধ্যে থেকে তো ছেলে মাকে দেখে না, বাইরে এসেই সে মাকে পায়। তোমার আদর তোমার আরাম যখন আমাকে চারিদিকে বেষ্টন করে ছিল তখন তোমাকে দেখাই সম্ভব হয় নি। যেদিন আঘাত দিয়ে তোমার আদরের আচ্ছাদন থেকে টেনে দূরে ফেলে দিলে সেদিন সেই আঘাতেই আমার চেতনা হল, তোমার মুখখানি সেদিন দেখতে পেলাম।

পক্ষি-মাতা ঠোকর মেরে যখন ডিমটি ভেঙে বাচ্চাকে মুক্তি দেয়, তখন সেই আঘাত কি নিষ্ঠুরতা? যে-জননী এতকাল তাঁর গর্ভে রেখে তাঁর নিশ্বাসেই সন্তানের নিশ্বাস জোগালেন, একদিন তিনিই সন্তানকে বার করে দিলেন। সন্তান কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কেঁদে কেটে আপন নিশ্বাস পেল। এতদিন সেই শ্বাসযন্ত্র তার রুদ্ধ ছিল। যেই মা তাকে বাইরে ফেলে দিলেন অমনি সন্তান তার আপন কান্নার আঘাতেই আপন শ্বাসযন্ত্রকে মুক্ত করে পেল।

সন্তানকে এই ফেলে দেওয়াকে কি নিষ্ঠুরতা বলব? যে বিচ্ছেদের আঘাত দিয়ে মা সন্তানের জীবন ও চেতনা জাগান তা কি নিষ্ঠুরতা? এই মহা-কল্যাণের জন্যই জননী তাঁর প্রসব-বেদনা ভোগ করেন, সন্তানকে নব-জন্মের ব্যথা দেন। এই আনন্দই সন্তানকে মুক্তজগতে চলতে শেখায়। মুক্তির এই দীক্ষাকে ভয় করলে চলবে কেন? আদরে বদ্ধ হয়ে এতকাল এই মুক্তিপথ হতে দূরে ছিলাম।

অনাদরে এই পথ মুক্ত হল। আজ সহজ হয়ে আমি সবার দিকে যাত্রা করব। (৫ম)

২৩নং

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী…

কল্যাণ ও মনোরম দুইই জগতে আছে, তাই এই সংসারে শ্রেয় প্রেয় দুইই মানুষের কাছে আসে। উপনিষৎ* বললেন,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ*

নারী এই প্রকৃতির প্রতিরূপ। তার মধ্যেও এই দুটি স্বরূপই আছে। একদিকে সে কল্যাণী মাতৃরূপা, অন্যদিকে সে মনোরমা প্রণয়িনী। যেখানে তার কল্যাণীরূপ সেখানে সে সকল সম্বন্ধ স্বীকার করে। যেখানে সে শুধু মনোরমা, সেখানে সে সকল সম্বন্ধ অস্বীকার করে। তার দৃষ্টান্ত 'উর্বশী'।

'কড়ি ও কোমলে'—'মা-লক্ষ্মী' সেই কল্যাণময়ীর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। তার কাছেই আমার 'পত্র' তিনখানির আবেদন। গল্পে উপন্যাসে কবিতায় সর্বত্র আমি এই দুইয়েরই চিত্র দিয়েছি। চিরকুমার-সভায় নৃপবালা নীরবালা নারীর এই দুই রূপ। 'গোড়ায় গলদে'ও এই বৈচিত্র্য—কমল ও ইন্দু। দেবযানী যেমন করে কচকে বাঁধতে চায় তেমন করে 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় গৃহিণী বাঁধেন না, যদিও তাঁর বিচ্ছেদ-বেদনা একটুও কম নয়। নারীর মহিমা তাঁর কল্যাণ-কর্মে—

সেই ত মহিমা তব সেই ত গরিমা
সকল মাধুর্য চেয়ে তারি মধুরিমা।†

তাই নারীকে জগতের কল্যাণের জন্য আবাহন করা হয়েছে—

এস কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থ-বারি।‡

* কঠ ২, ২।

† উৎসর্গ, ৩৩নং।

‡ উৎসর্গ, ৪৬নং

এই দুই স্বরূপই যে নারীর একই আধারের মধ্যে যুক্ত হয়ে রয়েছে, 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায় তা দেখতে পাই। একই নারীর মধ্যে সময়-বিশেষে প্রয়োজনের বৈচিত্র্যে এই দুই রূপই দেখা যায়—

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে… *

প্রকৃতির রাজ্যেও এই একই কথা। পৃথিবীর এক মূর্তি কল্যাণী, অন্য মূর্তি মনোরমা। তাই আমি আমার চিরপ্রিয় ইছামতী নদীকে একই সঙ্গে বলেছি—

হে প্রেয়সী হে শ্রেয়সী—†

এই ইছামতী বড় ইছামতী নয়। এই নদী পাবনার পাশের ইছামতী। পদ্মা হতে বড়ল পর্যন্ত এই তন্বী সুন্দরী ইছামতী। হরিদ্‌বসনা ছোট্ট অতি-সুন্দর এই নদীটি আঁকা বাঁকা অপূর্ব শ্যামল। শাদ্বল-তটিনী এই নদীটির কল্যাণী মূর্তি আমার অন্তরে চিরদিন জাগ্রত থাকবে।

নারীর এই দুই রূপ সৃষ্টির আদি হতে চলে আসছে। সৃজনের আদিক্ষণেই দুই ভাবের দুই নারী অতল অব্যক্তের সাগর হতে ব্যক্ত হয়েছিল। সমুদ্র-মন্থনে যে সুধা উঠেছিল তার এক রস হল মধুর কল্যাণ অমৃতরস; আর এক রস ফেনিল হয়ে মনকে মাতায়—তার নাম সুরা। নারীর এক রূপ হল সুন্দরী উর্বশী, কামনা-রাজ্যের সে অধীশ্বরী। অন্য রূপ বিশ্বের জননী, লক্ষ্মী—তিনি স্বর্গের ঈশ্বরী। এক জন অপ্‌সরী হয়ে মনকে হরণ করেন, অন্য জন কল্যাণী মাতৃরূপা ঈশ্বরী হয়ে সব ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ করেন। (১ম)

যিনি অপ্‌সরী, তিনি প্রমোদের উচ্চহাস্যের ঝড়ে তপোভঙ্গ করেন। সব ধৈর্য সব ধ্যান তাঁর প্রমোদের প্রচণ্ড আলোড়নে ভেঙে যায়। তাঁর উপহাসের অগ্নিশিখা সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অন্তরের শান্তিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাঁর অসংযত সুরাপাত্র বসন্তের পুষ্প-উচ্ছ্বাসে উচ্ছৃঙ্খল প্রলাপে আকাশে বাতাসে মাদকতা ছড়ায়। বসন্তের উচ্ছৃঙ্খল কুসুম-সমাবেশে সেই অসংযত প্রলাপ

* চিত্রা।

† চৈতালি, প্রেয়সী।

ধরা পড়ে। টক্‌টকে কিংশুকে গোলাপে সেই মত্ততা, বিনিদ্র যৌবনের ব্যাকুল গানে সেই অপ্সরীর তীব্র মদিরা। অন্তরের মত্ততাকে এই অপ্সরী সর্বপ্রকৃতিতে সর্বমানবে ছড়িয়ে দেন। তাই বসন্তের অসংযত কুসুম-শোভা, যৌবনের অশান্ত গান। অন্তরের মত্ততা যেন তার বাইরে চারিদিকে ফেটে পড়তে চায়। (২য়)

এই উর্বশীর মূর্তি দেখি বসন্তের সৌন্দর্যে, আর লক্ষ্মীরূপিণীর স্নিগ্ধ মাধুর্য দেখি হেমন্তের ফল-শস্য-পূর্ণ কল্যাণ-শ্রীতে। এই লক্ষ্মী উচ্ছৃঙ্খল বাহিরকে স্নেহময় গৃহের শান্ত কল্যাণে ফিরিয়ে আনেন। বসন্তের ফুল পর-ভুলানী বহির্বিশ্ব-বিলাসিনী। হেমন্তের ফল-শস্য অন্তরে-অন্তরে পরিপূর্ণ। এই লক্ষ্মীরূপিণী বাহিরের চাঞ্চল্যকে সংযত করে অন্তরের সফলতায় পূর্ণ করেন। এই কল্যাণী হেমন্তের অশ্রু-শিশিরের পবিত্র স্নানে বসন্তের তপ্ত-চঞ্চল উগ্র বাসনাকে স্নিগ্ধ করেন। বসন্তের উদ্বেল অসংযম তাঁর পরশে অন্তরের পরিণতিতে সফল হয়ে ওঠে।

পক্ক ধানের বর্ণ সোনার মত। হেমন্ত-লক্ষ্মীর সেই বর্ণ। সব রাগ-রক্ত-বাসনাকে এই লক্ষ্মী সফল পরিণতির হেম-বর্ণের শান্তিতে পূর্ণ করেন। ফল যখন ফলে তখন দক্ষিণ পবনের সকল চঞ্চলতা দূর করে এই লক্ষ্মী বিশ্বপ্রকৃতিকে কল্যাণ-আশীর্বাদে ধন্য করেন। তিনি চঞ্চল ফুলকে সফল করে শান্ত লাবণ্যের মঙ্গল-সুধার মাধুর্যে জীবন-মৃত্যুর পবিত্র সঙ্গমতীর্থে অনন্তের দেবালয়ে আমাদের অসংযত জীবনকে উপস্থিত করে তাকে চরিতার্থ করেন। সৌন্দর্য জীবনকে বিক্ষিপ্ত উচ্ছৃঙ্খল করে তপোভঙ্গ করে। কল্যাণ তাকে নিয়ে যায় জীবন-মৃত্যুর পবিত্র সঙ্গমতীর্থে। সেখানে নিখিলের আশীর্বাদ এই জীবনের উপরে অবতীর্ণ হয়। পুষ্পে কেবলই জীবনের বাহ্য বিলাস। এই বাহ্য বিলাসের অবসানে আসে ফল। কাজেই ফলে হল জীবন-মৃত্যুর মঙ্গল যোগ। এখানেই অনন্ত। এই মৃত্যু জীবনের বিরুদ্ধ নয়, এই তো জীবনের পরম পরিণতি।

হেমন্তে ফসল ফলল, চঞ্চলতা শান্ত হল, দক্ষিণ সমীরণের মত্ততা থামল। হেমন্ত তার শান্ত সফলতাকে নিখিল আশীর্বাদ পাবার জন্য ঊর্ধ্বে তুলে ধরল।

ফুলের মধ্যে দেখা যায় প্রকাশ পাবার অধীর আবেগ। ফলে হয় সেই চঞ্চলতার অবসান। এই অবসান তো মৃত্যু নয়। জীবনকে এই অবসানই কল্যাণ-লোকের অমৃতে উত্তীর্ণ করে দিচ্ছে। (৩য়)

আলোচনা—[গ্রন্থভূমিকা দ্রষ্টব্য]—সাহিত্য ও কলাশিল্পে অনির্বচনীয়েরই ব্যঞ্জনা দেখতে পাই। তাতে কি সবটা বলা যায়? রচনার সংযমে একটু ইশারা মাত্র জানানো হল—সবটা খুলে বলা গেল না। এর নাম অসম্পূর্ণতা নয়, সম্পূর্ণতারই তা ব্যঞ্জনা। জীবনেও আমরা শাশ্বতকে প্রকাশ করতে পারি নে। মৃত্যু জানিয়ে দেয় যে, তার পরেও আছে। কাজেই মৃত্যু জীবনের পূর্ণতাই দেখিয়ে দেয়। মৃত্যু জীবনের বিরোধী নয়। জীবনের অবসানে কল্যাণের মধ্যে জীবন-মৃত্যুর সংগতি ও অসীমতা বুঝতে পারি। মৃত্যুতেই জীবনের চরম সার্থকতা।

সাগরেই গঙ্গার চরম সার্থকতা। এই সঙ্গম তার অবসান নয়। মরুভূমিতে রুদ্ধ হওয়াই তার মৃত্যু। অসীম সাগর-সঙ্গমের পূজা-মন্দিরে যাবার জন্যই তার আজীবন গতি। উদ্ধত উদ্বেল বাসনাকে এই ধারাতে প্রবাহিত করাই কল্যাণ।

উর্বশী চাচ্ছেন সৌন্দর্যের শক্তিকে প্রকাশ করতে। লক্ষ্মী চাচ্ছেন সব শক্তিকে শান্ত সফল পরিণতিতে পূর্ণ করতে। শক্তির উদ্দাম প্রবলতা জীবনের ঝড়ে ভূকম্পে বারবার টের পাই। তাকে উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু তা চরম নয়। লক্ষ্মী যখন তাকে পরশ করেন তখনই তা ছন্দোময় হয়ে শান্ত সফল হয়। প্রলয়ংকরীর উদ্দাম বিক্ষোভকে এই কল্যাণী সংগীতের সুরে ও নৃত্য-তালে পরিণত করেন। কল্যাণীর এই পরশ না থাকলে বিশ্বের প্রলয় ও সর্বনাশ। এই কল্যাণেই সব সৌন্দর্য সংগীত ও সৃষ্টি।

'কুমার-সম্ভবে' দেখি রুদ্রের অগ্নি জ্বলল কামের আঘাতে। এই আগুন নিভল গৌরীর কল্যাণ-তপস্যায়। তিনিই শিবকে পেলেন। নব-জীবনের জন্ম হল। হারানো স্বর্গরাজ্য ফিরে পাওয়া গেল। 'কুমার-সম্ভব' কালিদাসের মহনীয় রচনা।

তাঁর আর এক অপূর্ব সৃষ্টি 'শকুন্তলা'। শকুন্তলা সরলা আশ্রম-কন্যা। দুষ্যন্ত রাজচক্রবর্তী। এঁরা পরস্পরকে চান। কাম এসে এঁদের মেলাতে চাইলেন। কামের সেই মিলন অভিশপ্ত হল। উভয়ে মিললেন বটে, কিন্তু যথার্থ পরিচয় হল না। অপমানিতা প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে যথার্থ আত্মপরিচয়টি দেবার জন্য আবার যেতে হল স্বর্গের পবিত্র আশ্রমে কঠোর তপস্যায়। মাতৃত্বের কল্যাণ-ধর্ম লাভ করে শকুন্তলা পূর্ণ হলেন। পতি-পত্নী পরস্পর তখন পরস্পরকে যথার্থ ভাবে চিনলেন। এখানেও ভরতের জন্মে হল কুমার-সম্ভব। অর্থাৎ কালিদাসের মতে মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা।

গ্যেটে শকুন্তলায় মুগ্ধ হয়ে যে চারটি পংক্তিতে তাঁর প্রণতি জানিয়েছেন তারও তুলনা নেই—এখানে ফুল ও ফল, স্বর্গ ও মর্ত্য, আরম্ভ ও অবসান সম্মিলিত ও সার্থক হয়েছে। কাঁচা কোনো লেখক 'শকুন্তলা'র দ্বিতীয় অংশ লিখতে সাহসই পেতেন না। এত বড় একটা বিরাট আবর্তনকে পূর্ণ করে দেখাবার মত শক্তি কয়জনের আছে? ভারতীয় এই সত্যকে স্বীকার করতে যে গ্যেটে সাহস পেয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

আধুনিক সমালোচকের দল শকুন্তলাকে নীতিমূলক মাত্র বলে গাল দিলে আমরা নাচার। তাঁরা সৌন্দর্যটুকু মাত্র নিয়ে কল্যাণকে বাদ দিতে চান। কল্যাণকে সত্য বলবার মত সাহস তাঁদের নেই। সত্যকে এইরূপে খণ্ডিত করার মধ্যে কী বাহাদুরী? সত্যের কল্যাণরূপকে নীতিবিদ্যালয়ের মাষ্টারী শিক্ষা বলে গাল দিলেই হল? সেইসব মাষ্টারেরা তো কল্যাণ, সত্য ও সুন্দরকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতেই উপদেশ দেন—তাদের যোগ ও পূর্ণতা দেখাতে তাঁরা পারেন না। মহাকবি তাদের এই বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে দিয়ে প্রেমযোগে পরিপূর্ণ শাশ্বত সত্যের মহিমাকে ঘোষণা করেন। প্রকৃতিতে ঋতুর মধ্যে শরতে বসন্তে কালগত ব্যবধান থাকলেও ভিতরে ভিতরে যোগ আছে।

মানব-লোকে নারীর মধ্যে সুন্দরী প্রণয়িনী ও কল্যাণী জননীরূপে এই যোগটি অপূর্ব। শুধু কাব্যে সাহিত্যেই কি মনোরমা ও কল্যাণীর যোগটি সাধিত হবে না? হবে, তবে এই যোগ-সাধন স্কুলমাষ্টারের দ্বারা হবে না, শক্তিহীন ধ্বংসপটু ক্ষুদে কালাপাহাড় কবিদের দিয়েও হবে না, এই কাজের উপযুক্ত মহাকবি মানব-গৌরব বিশ্ববরেণ্য কালিদাস। এইজন্যই তাঁকে বারবার প্রণাম করি। ফুল-ফল সৌন্দর্য-কল্যাণ' তিনিই যুক্ত করতে পারেন। আর প্রণাম করি গ্যেটেকে, যিনি এই সত্যকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি।

২৪ নং

স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা
ভাই?……*

ইংরাজিতে Utopia বলে একটা বই আছে, তাতে একটা নিখুঁত আদর্শ-দেশের কথা বলা হয়েছে। সেই রকম দেশ কোথাও নেই বলে এখন Utopia

* গ্রন্থভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অর্থে এমন একটা স্থান বোঝায় যা কোথাও নেই। স্বর্গকেও আমরা Utopia করে, তাকে পৃথিবী হতে বাইরে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিয়ে, বর্তমান ধরা-ছোঁয়ায় পৃথিবীকে করেছি কুৎসিত ও দৈন্যদুঃখময়, আর স্বর্গকে করেছি এক কল্পনার রাজ্য, Utopia।

ব্যাখ্যা—সৃষ্টিছাড়া যে-স্বর্গকে মানুষ পৃথিবীর বাইরে খোঁজে, যার জন্য সে সব ত্যাগ করে, সংসার ভাসিয়ে দেয়—সে-স্বর্গের ঠিকানা কোথায়? তার নেই আদি, নেই অন্ত, তার নেই স্থান, নেই কাল। সত্য হতে বিচ্ছিন্ন সে একটা অব্যক্ত সৃষ্টিছাড়া কল্পনা মাত্র। হাতের কাছে যে সম্পদ্ তাকে তুচ্ছ করে, না-পাওয়াকে মিথ্যা কল্পনায় বড় করে, তার পিছনেই আমরা ছুটেছি। (১ম)

বিশ্বের আদিতে একটা অরূপ অব্যক্ত বাষ্পময় লোক ছিল। তখনও সৃষ্টি ব্যক্ত হয় নি। তখন তো আমিও তার মধ্যে ছিলাম। সৃষ্টিছাড়া অব্যক্ত হলেই যদি 'স্বর্গ' হয় তবে তো তখনই আমি স্বর্গে ছিলাম। তখনই তো ফাঁকির ফাঁকা মানুষ হয়েই সেই শূন্যে বিহার করেছি। তারপর যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে কি সৌভাগ্যে বাস্তব জগতে বাস্তব সত্তা পেলাম! বহু-ব্যাপ্ত অব্যক্ত নীহারিকা যদি ক্ষুদ্রতমও কোনো ব্যক্ত-সত্তা পায় তবে সে ধন্য হয়। তেমনি সত্তার সার্থকতায় তখন আমিও ধন্য হলাম।

এতদিনে ধূলা মাটির জগতে এসে ব্যক্ত নাম ও রূপ পাওয়া গেল। এখন আমিও ধন্য। এই ধূলাময় পৃথিবীর স্বর্গও আমাকে পেয়ে আজ কৃতার্থ। আমার প্রেমের বিচ্ছেদ-মিলনে আমার লজ্জা-সজ্জায় সুখে-দুঃখে বা জন্ম-মৃত্যুর দোলায় এই ধূলার স্বর্গ আজ নিত্য নবীন রঙে দোলের খেলা করচে। আমার জীবনলীলায় সেও লীলায়িত। সে আজ আমাকে পেয়ে ধন্য। এই তো সত্যিকার স্বর্গ। মিথ্যা স্বর্গ দিয়ে কী হবে? (২য়)

বিশ্বের আনন্দ আজ আমাতে আশ্রয় পেয়েছে। আমার গানেই এই বিশ্ব-স্বর্গের আনন্দ ধ্বনিত। আমার প্রাণেই সে তার প্রাণের খবর পেয়েছে। আমিই আজ বিশ্বের লক্ষ্য, তাই সেও আমাকে চায়। শিশু জন্মালে পুরাঙ্গনারা যেমন শঙ্খ-ধ্বনি করেন তেমনি আমাকে লক্ষ্য করেই দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ আনন্দ-শঙ্খ বেজেছে। সপ্ত সাগরে জয় জয় ধ্বনি উৎসব-ডঙ্কায় ঘোষিত হয়েছে, ফুল ফুটেছে, বনের পাতায় ফুলে আনন্দের ঝরণা বয়ে যাচ্ছে, দিগঙ্গনারা বর্ণ-গন্ধের উলুধ্বনি করতে করতে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছেন। কারণ আমার মধ্যে অব্যক্ত স্বর্গ হল ব্যক্ত, অসীম পেল তার নাম ও রূপের ব্যক্ত সীমা। এই

আনন্দধ্বনি হল বিশ্বে প্রবাহিত। অনন্ত অব্যক্ত স্বর্গ এতদিনে মৃন্ময়ী পৃথিবীর কোলে আমার মধ্যে জন্মলাভ করল। যে-স্বর্গ এতদিন কল্পনামাত্র ছিল, আজ তা এই ধূলাময় জীবন্ত পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ হল। একে পেয়ে আমরা কৃতার্থ হলাম, আমাকে পেয়ে সেও সার্থক হল। (গ্রন্থভূমিকা দ্রষ্টব্য)

এইসব কবিতার ব্যাখ্যা করা চলে না। শুধু তত্ত্বকথা হলে তার ব্যাখ্যা চলত, কিন্তু রসের ব্যাখ্যা কেমন করে হবে? অন্তরের একটা ছবি ও আনন্দ এই কাব্যে হয়তো ধরা দিয়েছে। যদি তাতে আনন্দ পাওয়া যায় তবেই তা সার্থক। নইলে ব্যাখ্যা করেই বা ফল কি?

এখানে 'স্বর্গ' বলার বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। আসল কথা, যা অস্পষ্ট অব্যক্ত সুদূর তাকেই লোকে বলে স্বর্গ। সেই অব্যক্ত স্বর্গ আজ ধূলার জগতে আমার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। চমক লাগিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য 'অব্যক্ত'কে স্বর্গ বলা হয়েছে, বাউলরা যেমন গানের হেঁয়ালীতে বলেন—

নূতন এক চীন সহরে।

২৫নং

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল......

এখানে আদি-কুটীরের উত্তরে কূয়ার পাশে অশোক মনে করে একটি গাবের চারা লাগিয়েছিলাম। যাঁদের কাছে চারাটি কিনেছিলাম তাঁরা অশোক বলেই আমাকে সেটা দিয়েছিলেন। চারা ক্রমে গাছ হল। একসময় ঘোর লাল টকটকে হয়ে তার কতগুলি পাতা বের হল। বোঝা গেল যে গাছটি গাব, অশোক নয়। বসন্তাগমে তার রক্তপত্রে আর অন্য সব গাছের রঙীন ফুলে-পল্লবে সেখানকার আকাশকে যেন বিহ্বল করে দিল। এটাকে যেন যৌবনের উন্মত্ত বসন্ত মনে করতে পারি। আর একটা বসন্ত আছে, তা পরিণত বয়সের বসন্ত। সেই স্তব্ধ শান্ত বসন্তে চোখধাঁধানো কোনো উন্মত্ত বর্ণসমারোহ নেই। যে-উন্মত্ত বর্ণচ্ছটাকে মনে হয় যেন অসংযত কোলাহল, সেরূপ কিছু সেই সংযত শান্ত বসন্তে নেই। সেই শান্ত বসন্ত শুধু নিভৃত গৃহের প্রান্তে বসে শুধু দিগন্তে চেয়ে থাকে। দূরের দিগন্তনীলিমাবদ্ধ তার স্তব্ধ শান্ত দৃষ্টি যেন মনকে উদাসী ঘর-ছাড়া করে দেয়। তার মধ্যে কোনো অসংযত মত্ততা নেই।

ব্যাখ্যা—একদিন তরুণ বসন্ত আমার প্রাঙ্গণতলে এসে দাড়িম্ব-পলাশ-কাঞ্চন-পারুলের ফুলের ও নবীন পল্লবের বর্ণচ্ছটায় বনে বনে কোলাহল করে ধেয়ে বেড়িয়েছিল। ছুটোছুটি করতে করতে নীল আকাশকে তার আবেগপূর্ণ অশান্ত রাগরক্ত চুম্বনে সে বিহ্বল করে তুলেছিল।

সেই বসন্তই এখন পরিণত হয়ে শান্ত সমাহিত হয়েছে। এখনো সে আমার প্রাঙ্গণে আসে। কিন্তু এখন আর তার সেই কোলাহল নেই, সেই উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা নেই। এখন সে এসে আমার ঘরের প্রান্তদেশে নির্জনে শান্ত হয়ে বসে অনিমেষে সুদূর দিগন্ত পানে চেয়ে থাকে। সেই দিগন্তলোকে আকাশ ও পৃথিবী যেন ধ্যানযোগে যুক্ত। সেখানে যেন ধরার শ্যামশোভা অসীম আকাশের নীলিমায় আপনাকে বিলীন করে দিচ্ছে! সেই দিগন্তে যেন এখানকার বন্ধনসীমার অবসান। সেখানে যেন মুক্ত আকাশের ঘাটে আমার জীবনতরীকে কোন্ অকূলের পানে ভাসিয়ে দেওয়ার প্রতীক্ষা।

২৬নং

এবারে ফাল্গুনের দিনে
সিন্ধুতীরের কুঞ্জ-বীথিকায়……

এই কবিতাটিতে পূর্ববর্তী কবিতারই ভাবের অনুবৃত্তি চলেছে। তরুণ অশান্ত যৌবনই ধীরে ধীরে একটি শান্ত জীবনে পরিণত হবে, এখানকার সব উদ্দাম নিষ্ফল আবেগ ধীরে ধীরে সার্থক পরিণতি লাভ করবে,—এই আশা মনে জেগেছে।

এই জনমে যেন এক অজ্ঞাত সিন্ধুর তীরে এসে পৌচেছি। এখানকার দেনা-পাওনা সাধনা-সফলতা প্রভৃতির খোঁজ-খবর জানি না। এখানকার যৌবন-নিকুঞ্জ-বীথিকায় দেখছি শুধু নতুন পাতা দেখা দিল। এই নব-পত্র-বিকাসের বেশি আর কিছু তো হল না। তরুণ জীবনের এই অরুণ-কিশলয়-বিকাস যেন ব্যথার মত রাঙিয়ে উঠল। তারই উপরে চঞ্চল পবনের একটু দোলা লাগল। দোলাটুকুই মাত্র লাগল। আর তার উপর একটু মর্মর কল্লোল (whisper)। কানে কানে গানের একটু গুঞ্জনধ্বনিতেই দেখি বেলাটুকু বয়ে গেল। এবারের বসন্তে আর তো বেশি কিছু হল না। এই জীবনের বসন্তের পালার কি এইখানেই শেষ? (১ম)

আর এক জীবনে আর এক ফাল্গুনে দক্ষিণ-সমীরণে রঙীন পাল তুলে রূপের অগ্নিশিখায় দীপ্ত হয়ে আমার কাছে বসন্ত আবার আসবে। সে-বার শুধু ব্যথার অরুণপত্রের বিকাস মাত্রে যেন বসন্তের অবসান না হয়। সেবার যেন এই জীবন-সাগর-তীরে কুঞ্জবনে আমার জীবন-লতায় সোনার বরণ রবির আলোকে পুলকিত হয়ে আমার জীবনের ফুল ফোটে। এবাঁর শুধু গানের গুঞ্জনমাত্র হল, নাচ হয় নি। সেবারকার জীবন-সংগীত যেন গানে-নাচে সুরে-তালে পূর্ণ হয়। এবারে জীবনে যা শুধু বেদনা সেবার যেন তা সংগীত হয়ে ওঠে। এবার নবজনমের জন্য যে প্রসব-বেদনা সেবার যেন তা নবজীবনের সমাগমে ধন্য হয়। নবজাত জীবন-শিশুর আনন্দে কলহাস্যে—নৃত্যে গীতে সব যেন পরিপূর্ণ হয়।

২৭ নং

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।...

বোলপুর অঞ্চলে দেখেছি সাঁওতালরা বহু কষ্ট করে জমি চষে। কিন্তু যেই জমিদারকে ট্যাক্স দেবার তাগিদ আসে অমনি জমি ছেড়ে পালায়। মূর্খের দল, দায়িত্বটুকু এড়াতে গিয়ে সর্বস্ব খোয়ায়। আর পদ্মাতীরে এসে দেখছি এখানে প্রজারা সেয়ানা, জমি চাষ না করেও যদি সুযোগ পায় তবে জমিদারকে খাজনা দিয়ে তার অধিকারটি সাব্যস্ত করে রাখতে চায়।

আমরাও অনেক সময় মূর্খ সাঁওতালদেরই মত। জীবনের দায়িত্ব এড়াতে গিয়ে জীবনের সর্বস্বই হারাই।

যিনি জীবনের রাজা, তিনি কেন খাজনা চান? তাঁর কি লোভ রয়েছে? না, তিনি আমাকেই চান। তাই আমাকে ডাকেন। আমার সঙ্গে তাঁর যুক্ত সাধনা রয়েছে। ধর্মপত্নীকে ছেড়ে স্বামী তো কোনো ধর্মসাধনাই করতে পারেন না। এই গৌরব তিনি আমাকে দিয়েছেন। সেই গৌরব আমরা হারাতে রাজি, তবু তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধনার যে দায়িত্ব সেটুকু বইতে চাই নে। কেন তা এড়াতে চাই? প্রস্তুত নই বলে? তবু প্রস্তুতই হতে হবে, পালিয়ে পালিয়ে আর ফল কি? পালিয়ে যাবই বা কোথায়? সর্বত্র তাঁর রাজত্ব। সর্বত্র তাঁর তাগিদ। তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার মত ঠাঁই আছে কোথায়?

হয়তো এই সময়ে আমার মনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে 'রাজা' নাটকের

ভাবটি জেগে উঠেছিল। তাই মাঝে মাঝে একটু সেরকম আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যাখ্যা—আমার জীবনের রাজাকে তো চেনা হল না। যখন তাঁর ডাক শুনি—

খোলো খোলো দ্বার,
রাখিয়ো না আর,
বাহিরে আমারে দাঁড়ায়ে…

এই অনুনয় শুনি—তখন ভাবি—এ কী হল! তখন প্রশ্ন জাগে—

তব গভীর আহ্বান কারে?

কিন্তু, হায় হায়, আমি যে প্রস্তুত নই, মিলনমালা যে গাঁথা হয় নি, বাঁশি কিন্তু ডাকচে—বাউলদের এই ভাব মনে হচ্চে। পালাতে চাই। কোথায় পালাব? কাজে কর্মে আড়াল রচনা করে সেই ডাককে ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু গোপনে পালিয়ে থাকবার জো কী? দিনে কাজের আড়ালে, রাতে স্বপনে ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু ক্রমাগতই সেই ডাক শোনা যায়। কী মুশকিল!

আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে…

—সুরঙ্গমার এই গান মনে আসে। (১ম)

তবে সান্ত্বনা এই যে, বুঝেছি—আমি তোমায় না জানলেও তুমি আমায় জান। তোমার প্রেমের ঋণেই সর্বস্ব বিকিয়ে রয়েছি। সেই ঋণ শোধ করে আমার নাম-ধাম বাস-ঠিকানা কিছুই বাকি থাকবে না। তবে আর কেন বৃথা পালানোর চেষ্টা? আমার প্রেম দিয়ে তোমার প্রেম সার্থক করে প্রেমঋণ হতে মুক্ত হয়ে তোমার কাছেই ধরা দেব। তবেই তোমার রাজ্যে ঠাঁই মিলবে। সেই দেবার সর্তেই তোমার সঙ্গে মিলন পূর্ণ হবে—

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী সর্তে? (২য়)

২৮নং

পাখিরে দিয়েচ গান, গায় সেই গান,

[সেদিন সকাল বেলা একটি গরীব স্ত্রীলোক নদীতীর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সঙ্গে কয়টি ছেলেপিলে। বড় একটির মাথায় বেশ একটি বোঝা। তার চেয়ে

ছোটটি সামান্য কিছু হাতে করে নিয়েছে। দুইটি শিশু এমনি সাথে সাথে হেঁটে চলেছে। একটি অতি-ছোট্ট শিশু রয়েছে তার কোলে। নানা দুশ্চিন্তাভারে মনটা সেদিন বড় ভারাক্রান্ত ছিল। হঠাৎ মনে হল—এই যে দুঃখভার, এই তো আমার গৌরব। বড় সন্তানের মাথাতেই তিনি বোঝা চাপান। ছোটকে তিনি কোলে করে নেন। মানুষ তাঁর বড় সন্তান, তার কাছে তাঁর অনেক দাবী। ছোটর কাছে তাঁর কিছুই দাবী নেই।]

খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে একটি গল্প আছে। জনকয়েক সেবককে কিছু কিছু ধন দিয়ে তাদের প্রভু বিদেশে গেলেন। ফিরে এসে প্রভু দেখলেন যে কেউ-কেউ যত্ন করে সেই ধন বাড়িয়েছে। তাদের তিনি পুরস্কৃত করলেন। কেউবা তা খুইয়েছে, তাদের তিনি তিরস্কৃত করলেন।

বিধাতা আমাদের সকলকেই কিছু কিছু সম্পদ্ দিয়েছেন। আমাদের শক্তি অনুসারে তা আরও পূর্ণ করে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই আমাদের সার্থকতা। তাঁর তো কোনো প্রয়োজন নেই, তাঁর দানের সদ্ব্যবহারে আমাদেরই জীবন ধন্য হয়। পিতামাতাও শক্তিহীন সন্তানের কাছে দাবী করেন না। যার যত শক্তি তার কাছে তত দাবী। দাবী দেখে বুঝতে পারি কার কত শক্তি। প্রকৃতির আর সর্বত্র ভগবান বেশি কিছু চাননি। কিন্তু মানুষের কাছে তাঁর দাবীর অন্ত নেই। এই গৌরবেই মানব-জীবনের সার্থকতা।]

ব্যাখ্যা—মানুষ ছাড়া আর সব জীবকে তুমি যতটুকু দিয়েছ ততটুকুই সে তোমায় ফিরিয়ে দেয়। পাখিকে যে বাঁধা সুরটুকু দিয়েছ তাই সে বারবার ফিরে ফিরে গায়। এই মাত্র তার দান। তার বেশি তো নয়। আমাকে যে সুরটুকু মাত্র দিয়েছ তার চেয়ে অনেক বেশি আমাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। আমি গান গাই। যা পেয়েছি তার বেশি যে দিতে পারি তাতেই আমার গৌরব। আমার গানই আমার গৌরব। (১ম)

বাতাসের উপরে তুমি কোনো বোঝা চাপাও নি। তার কোনো বাঁধন নেই। সে স্বাধীন ভাবে সহজে চরাচরময় তোমার সেবা করতে পারে। আমার উপরে যত বোঝা চাপিয়েছ তাই ঘাড়ে করে আমায় সেবা করতে হয়। (বোঝার ভারে আমাকে এঁকে বেঁকে চলতে হয়।) এই বোঝা বয়ে সেবা করতে করতেই আমার বোঝা ক্রমে হাল্‌কা করতে হবে। বাঁধন খুলতে খুলতেই একদিন মুক্ত হব। মরণে মরণে এই বাঁধন ক্রমে খসবে। একদিন সম্পূর্ণরূপে ভার-মুক্ত বন্ধন-মুক্ত হয়ে রিক্ত-হাতে সহজে তোমার চরণে আমার প্রেমের

সেবা নিয়ে যাব। যে বন্ধন দিয়েছ তাকে মুক্ত করাই হল আমার সাধনা। স্বাধীন হয়ে তখনই তোমাকে সেবা করবার যথার্থ যোগ্যতা লাভ করব। কাজেই আমার কাছে তোমার অনেক দাবী। বাঁধন ঘুচিয়ে বোঝা নাবিয়ে আমাকে সেবা করতে হবে। (২য়)

আকাশের পূর্ণিমাকে হাসি দিয়েছ। সেও তাই ঢেলে দিয়ে ধরণীর করপুট সুখ-স্বপ্নে ভরে দেয়। এত সুখ-সুধা ধরণী পায় যে তা তার অঞ্জলিতে আর ধরে না, তা উছলে ওঠে। কিন্তু আমাকে তুমি যে দুঃখভার দিয়েছ তাকে আমার আনন্দে পরিণত করে তুলতে হবে। তোমার সঙ্গে যে-রাতে আমার মিলন হবে সেই প্রেমরাতে কি তোমার হাতে আমি দুঃখকে দুঃখ রূপেই ফিরিয়ে দিতে পারি? কাজেই ইতিমধ্যে বেদনার অশ্রুজলে এই দুঃখকে ধুয়ে ধুয়ে নির্মল করে তাকে আনন্দে পরিণত করতে হবে। এই দুঃসাধ্য সাধনা তুমি আমাকেই দিয়েছ, আকাশের পূর্ণিমার চাঁদকে তো দাও নি। (৩য়)

আলোয়-আঁধারে সুখে-দুঃখে মিলিয়ে তুমি তো শুধু এই মাটির ধরণীটি গড়েছ। তার মধ্যে বিনা-উপকরণে শূন্য হাতে আমাকে দিলে পাঠিয়ে। আমি কেমন করে মানবীয় মহত্ত্ব দিয়ে নতুন জগৎ তৈরী করে তুলি তাই তুমি আড়াল থেকে দেখ্‌ছ আর মনে মনে হাসছ। আমার উপরে ভার দিয়েছ বিনা-উপকরণে শূন্য হাতে তোমার স্বর্গ রচনার। সুখে-দুঃখে-তৈরী জগৎকে আনন্দময় স্বর্গ করে তোলা তো কথার কথা নয়। সেই দুষ্কর ব্রত তুমি আমাকেই দিলে। এই তো আমার গৌরব। (৪র্থ)

আর সবাইকে বিনা দাবীতে তুমি দিচ্ছ, কিন্তু আমার কাছে তোমার দাবীর আর অন্ত নেই। আমি আমার প্রেমে যা দিতে পারি তাই তুমি সিংহাসন থেকে নেমে হাসিমুখে গ্রহণ কর। কাজেই তোমাকে আমার আরও বেশি করে দিতে হয়। তুমি কম দিয়ে বেশি চেয়েই আমাকে গৌরবান্বিত করেছ।

আমায় তুমি স্বরমাত্র দিলে, কিন্তু দাবী করলে গান। আমাকে দিলে বন্ধন, আমার কাছে প্রত্যাশা করলে মুক্তি। দিলে দুঃখ, চাইলে আনন্দ। সব দুঃখের উপরে উঠে আমার সাধনা পূর্ণ করতে হবে। কী বিরাট্‌ দাবী! স্থূল মাটির অন্ধকার মর্ত্য লোককে বিনা আয়োজনে প্রেমালোকদীপ্ত স্বর্গ করে তুলতে হবে! তুমি করলে পৃথিবী, আর তাই দিয়ে আমাকে করতে হবে স্বর্গ রচনা! এত বড় দাবী করে কী বিরাট্‌ গৌরবই তুমি আমাকে দিয়েছ।

তাই মানবের সাধনায় আর বিশ্রাম নেই। যে আনন্দে যত্ন করে তুমি আমার হাতের দানটুকু হাসিমুখে নাও তা মনে হলে এই সাধনার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে পারি। (৫ম)

আলোচনা—যে মূলধন নিয়ে মানুষ যাত্রা করেছে, তাই দিয়ে সে সমাজ-শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম ইত্যাদিকে নানা ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যময় বিচিত্র স্বর্গ করে তুলেছে। মৌমাছির চাক যুগ যুগ ধরে একই রকম রয়েছে। মানুষের ইতিহাস যুগে যুগে এগিয়েই চলেছে। অশেষ দুঃখে মানুষকে সেই ইতিহাস গড়তে হচ্চে। এই তো মনুষ্যত্বের গৌরব। ইতিহাসে মানবের এই আহ্বান নিত্যকাল ধ্বনিত হচ্চে। সে যা পেয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। তাকে সবকিছু আরও ভাল আরও উন্নত করে ফিরিয়ে দিতে হবে। বিধাতার এই দাবীই দুঃখে দুঃখে মানুষকে ক্রমাগত সম্মুখের দিকে মহত্ত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্চে।

২৯নং

যে দিন তুমি আপনি ছিলে একা……

এই কবিতা আগের কবিতারই আনুষঙ্গিক।

এই কবিতায় কোনো সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করতে বসি নি। সৃষ্টির আদি যুগের কোনো বিশেষ সময়ের কথা এতে নেই। এখানে 'আমি' মানে ব্যক্তিবিশেষ নয়। এখানে আমি অর্থে ব্যক্ত জগতের প্রতিনিধি। সেই 'আমি' যখন ছিল না—এই কথা মুখে বললেও এমন কোনো সময় হতে পারে না যখন তার প্রকাশ ছিল না। তা অসম্ভব। কারণ তিনি "আবিঃ" অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ। কাজেই আমি ছিলাম না অর্থাৎ সৃষ্টি ছিল না অথচ "আবিঃ" প্রকাশস্বরূপ ছিলেন, একথার কোনো অর্থ নেই।

ব্যাখ্যা—আদিতে কোনো সময়ে তুমি ছিলে অথচ সৃষ্টিতে তোমার প্রকাশ ছিল না, একথা বলবার অভিপ্রায় আমার নয়। আমি বলতে চাই—এমনই যদি হত যে তুমি আছ আর আমি অর্থাৎ চরাচর নেই, তোমার দশা তবে কী হত? নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না, দেখতে হয় দর্পণে। তোমার রূপ তুমি দেখবে কেমন করে, যদি তোমার দর্পণরূপে আমি না থাকি?

সেদিন তো আমি ছিলাম না, কাজেই একা একা তুমি নিজেকে দেখতে পারছিলে না। সেদিন কারও জন্য তোমার প্রতীক্ষা ছিল না, কারণ আমার

তো তখন আসার সম্ভাবনা নেই। এক তীরে আমি অন্য তীরে তুমি, অর্থাৎ আমার এক পার, তোমার এক পার। মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। ব্যবধান আছে বলেই তো এই দুই তীরের মধ্যেই যোগাযোগের জন্য ব্যাকুলভাবে পথ-চাওয়া-চাওয়ি থাকতে পারে। আমিই যখন নেই তখন কারও জন্য তোমার পথ-চাওয়া থাকবে কেমন করে? আজ যে এই দু'পারের মধ্যে মিলন-ব্যাকুলতার আকুল হাওয়া বইছে সে[illegible] তা বইত কেমন করে? তোমার আমার মিলনের জন্য কান্না-ভরা যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা আজ সব বাঁধন ছিন্ন করে ছুটে চলেছে তা তখন ছিল কোথায়? (১ম)

আমার মধ্যেই তো তোমার প্রকাশ হল, তুমি জাগলে। আমার মধ্যেই বিশ্বের প্রকাশ হল, বিশ্বের ঘুম ভাঙল। আমার আসাতেই শূন্যে শূন্যে আলো জাগল, আনন্দের ফুল ফুটে উঠল। নইলে এই প্রকাশ-কুসুম বিকসিত হত কেমন করে? আমাকে তুমি তোমার প্রেমের আনন্দে কত রকম ফুলের মধ্যে ফুটিয়ে তুললে, কত রকমের রূপের দোলায় দোলালে। আমিই সৃষ্টির প্রকাশ। তুমি সেই আমাকে আকাশের তারায় অপার জগতে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে আবার আমার সেই পরিব্যাপ্ত স্বরূপকে সংহৃত করে ব্যক্তিত্বের রূপ দিয়ে প্রেমভরে কোলে তুলে নিলে।

এই ছড়ানো আর কুড়োনোর মধ্যেও প্রেমের এক অপূর্ব দোলায় দোলালে। এক একবার এক এক লোকের লীলা শেষ করে আমাকে তুমি মরণের মধ্যে বিলীন করে দিয়ে আবার নব জনমে নতুন করে পেলে, জন্ম-মরণের বিরাট্ দোলাতে আমাকে দোলালে। স্নেহভরে শিশুকে কোলে নিয়ে মা নানা রূপে নানাভাবে দোলা দেন। তুমিও আমাকে প্রেমভরে নানা ভাবের দোলায় দুলিয়ে চলেছ। আমি যদি না হতাম তবে তোমার এই সব বিরাট্ বিচিত্র প্রেমলীলা চলত কেমন করে? (২য়)

সংসারে আমি এলাম, আর তোমার বুকে সুখ-দুঃখের স্পন্দন জাগল। আমাকে পাবার আনন্দে তোমার প্রেমভরা বুক কেঁপে উঠল, আবার হারাবার ভয়ে তোমার মনে শংকা ও বিচ্ছেদ-দুঃখ জাগল। আমি নইলে তোমার সুখ-দুঃখ হত কেমন করে? আমার জন্য কি তোমাকে কম দুঃখ পেতে হয়েছে? সেই সুখ-দুঃখের ঘর্ষণে ও সংঘাতে যে আনন্দ-শিখা জ্বলল তার মধ্যে কী প্রচণ্ড অগ্নিদীপ্তি দেখা দিল! দুঃখ না হলে আনন্দের এই দীপ্ত শিখা আনন্দের এই জ্যোতিঃ পেতে কোথায়?

আমি এলাম বলেই তোমার এই আনন্দ-জ্যোতিতে তুমি আপনাকে দেখলে। আমার পরশেই তোমার আপন পরশটুকুর মরম পেলে। 'কেউ বা কিছু' কোথাও না থাকলে তোমার পক্ষে পরশ করা হ'ত অসম্ভব। সেই পরশ ছাড়া নিজেরও পরশ তুমি বুঝতে কেমন করে? কাজেই আমি এলাম বলে তুমি এলে, অর্থাৎ আমার প্রকাশেই তোমার প্রকাশ হল। আমার মুখে চেয়েই তুমি আপনাকে উপলব্ধি করলে। (৩য়)

আমার মধ্যে কত ত্রুটি কত অসম্পূর্ণতা। তাই আমার চোখে লজ্জা, আমার বুকে ভয়। তাই তো অনেক আবরণে আমাকে মুখ ঢেকে রাখতে হয়। লজ্জার সেই আবরণই আমার থেকে তোমাকে আড়াল করে, তোমাকে দেখতে পাই নে। সেই দুঃখেই আমার নয়নে বয় অশ্রুধারা। যে আবরণে আমার ও তোমার মধ্যে এই আড়াল রচনা করা হল তাতে শুধু আমারই দুঃখ নয়, তাতে তোমারও বহু ব্যথা। আমার আচ্ছন্ন রূপের আবরণ সরিয়ে আমাকে দেখবার জন্য তোমার ব্যাকুল কৌতূহলের অন্ত নেই। তোমার প্রেমের দৃষ্টিতে আমাকে দেখবে বলে আকাশে সমস্ত সূর্যতারায় মিলন-দীপ জ্বালিয়ে তুমি যুগযুগান্তর ধরে প্রতীক্ষা করবে তাই তুমি এত তারা জ্বালিয়েছ তোমার গগনে।

আলোচনা—সীমা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যেই দুঃখ। তোমার যদি কোনো দুঃখ থাকে তবে তা এই সংসারে আমিই বয়ে এনেছি। আবার আমার এই দুঃখের ভিতর দিয়েই তোমার প্রেমের আনন্দ। জ্ঞানের দ্বারা আমরা পাই অদ্বৈত বা দ্বৈত। দুইকে জ্ঞান দিয়ে এক করা যায় না। দ্বৈতাদ্বৈত মিলন হয় প্রেমে। প্রেমেই দ্বৈতকে এক বা অদ্বৈত করা যায়। জ্ঞানের দ্বৈত হতে প্রেমের এই অদ্বৈত বা monism অনেক বড় কথা। জ্ঞানের অদ্বৈত বা monism তো নেতি-ধর্মী (negative)। প্রেমের আনন্দেই সত্যকার অদ্বৈত (positive monism)।

আমি মানে সৃষ্টজগৎ। আমি সেই অসীমের প্রতিরূপ। আমি একটা বিচ্ছিন্ন বস্তু (isolated fact) হলে আমার সঙ্গে বিশ্বের জ্ঞানগত যোগ ঘটত কেমন করে? তবে কি আমি কিছুই জানতে পারতাম? আলো, প্রাণ, বায়ু, জল, আমি—এর কোনোটাই বিচ্ছিন্ন বস্তু (isolated fact) নয়। অসীমেই এদের প্রতিষ্ঠা (background) রয়েছে। তার উপরে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত বলেই আমি বুদ্ধি ও চৈতন্যের জগৎকে উপলব্ধি করতে পারি।

বিজ্ঞান বলেন, প্রাণ এবং অপ্রাণ একই সত্যের বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন রূপ। উপনিষদও বলছেন, জগতে যা কিছু সবই প্রাণে কম্পিত।

[প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।]

বিজ্ঞানেও দেখছি Radio-activityর গতিশীলতা। এই নিত্যগতি অসীমেরই গতিশীলতার প্রকাশ। অণু-পরমাণু সবই নিরন্তর বেগে চলেছে। Nucleusএর চতুর্দিকে electronগুলি সৌর-জগতের মত নিরন্তর আবর্তিত। এদেরও অসীম প্রতিষ্ঠাভূমি (background) আছে। আমাদের গতির অসীম প্রতিষ্ঠা (infinite background) আছে, অথচ আমাদের ব্যক্তিত্বের ও জ্ঞানের অসীম ভিত্তিভূমি নেই—এ হতেই পারে না।

আধি-ভৌতিক জগতেও অসীম আছেন। তাই শ্রুতিতে দেখি, 'অন্নং ব্রহ্ম'। অসীমের আনন্দের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের সার্থকতা। আপনাতে আপনার উপলব্ধি ও ঐক্য-বোধেই ব্যক্তিত্বের বোধ। এই ঐক্য হতে ভ্রষ্ট হলেই ব্যক্তিত্বের দুঃখ।

শৈশব হতে যে ঐক্যধারা বেয়ে এসেছি তাকেই ব্যক্তিত্ব (Personality) বলছি। তাতেই আমার আনন্দ। অসীমের ব্যক্তিত্ব (Personality) ও আমার ঐক্য-বোধের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংগতি (Harmony) আছে। দ্বৈতের মধ্যে ঐক্যকে নিবিড়ভাবে অনুভব করলেই আনন্দ ও প্রেম জাগে।

বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের যে প্রেম তার মধ্যেও বিচ্ছেদ আছে। কিন্তু বিচ্ছেদ সত্ত্বেও ঐক্যসূত্র আছে। বিশ্বের মূলেও এই সত্য। আমি একটা বৃহত্তর আমিরই প্রতিরূপ। আমার জীবনের মধ্যে জীবলোকের নাট্যলীলা চলেছে। আমার সত্তায় বিশ্বের সত্তা। 'আমি' মানে একটা বিচ্ছিন্ন আমি নয়। আমার জ্ঞান আমার প্রেম আমার আনন্দ সব মিলিয়ে যে আমিত্ব তাই হল যথার্থ আমি। আমিই সেই অসীমের মধ্যে দুঃখ-সুখের তরঙ্গ তুলেছি। আমি এসেছি বলেই এপারে-ওপারে যোগাযোগের সম্ভাবনা হয়েছে।

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হোতো যে মিছে।*

* গীতাঞ্জলি, ১২১নং কবিতা।

৩০নং

এই দেহটির ভেলা নিয়ে
দিয়েছি সাঁতার গো

বর্ষাকালে পতিসর প্রভৃতি জায়গায় ও বিল-অঞ্চলে দেখেছি, যেসব গরীব গৃহস্থের নৌকো নেই তারা কলাগাছের ভেলা বেঁধে এখানে ওখানে যায়। কাজ ফুরিয়ে গেলে ভেলাটি ভেঙে কলাগাছগুলো গরুকে খেতে দেয়। নৌকোওয়ালারা তা করতে পারে না। তাদের তখনকারমত নৌকোর কাজ শেষ হয়ে গেলেও নৌকোগুলি জলে ডুবিয়ে রাখতে হয়। তারপর আবার বর্ষা এলে নৌকো তুলে এখানে ওখানে সংস্কার করে যত্ন করে গাব দিয়ে আবার ব্যবহার করতে হয়।

শিলাইদাতে বসে নদীতীরে কোনো গৃহস্থের নৌকোর সেবা-যত্ন দেখছিলাম। তখন মনে পড়ল বিল-অঞ্চলের ভেলার কথা। তাদের এই দায় নেই।

ব্যাখ্যা—যে দেহ-ভেলায় এই জীবন-স্রোতে বেয়ে এলাম, তার কাজ যদি সাঙ্গ হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা এবার ভাসিয়ে দাও। পরমায়ুর এই দুদিনের নদী এবার পার হতে পারলেই, যে-টুকুর জন্য এই ভেলা তা শেষ হলেই, জীবনের সন্ধ্যায় তা ভাসিয়ে দেওয়া যাবে। কোনো ভাবনা নেই, পুরাতনের কোন ভার নেই, তাগিদ নেই, বেশ মজা। এর পরে কেমন করে পরলোকে কী হবে তার ধার ধারি নে। কখন পৌঁছোবো, কী হবে, কেমন করে যাব, সেখানে আলোই বা কেমন অন্ধকারই বা কেমন, এসব প্রশ্ন না-ই বা করলাম। সে-সব তিনিই জানেন। (১ম)

এই অজানার দিকে তাঁর সঙ্গে যাত্রায়ই তো আনন্দ। তিনিই অপরিচিত এই লোকে এসে নানা রকমের প্রেমের বাঁধনে একদিন আমাকে বদ্ধ করেচেন, আবার তিনিই একদিন সেইসব বাঁধন খুলে অজানার দিকে আমায় নিয়ে যাবেন।

জানার শক্ত বাঁধনে বদ্ধ হয়ে যখন হাঁপিয়ে উঠি তখন আমার অজানা বন্ধুই মৃত্যুরূপে সামনে এসে চমক লাগিয়ে এক নিমেষে সব বাঁধন খুলে দেন। মরণের মধ্যে তাঁর এই প্রেমলীলা বুঝতে পারি নে বলেই মনে হয়—এ কী হল। তাঁর সেই আচমকা এসে বাঁধন খোলাতেই ধাঁধা লেগে যায়। (২য়)

জানা-শোনার সংকীর্ণ সীমার বন্ধনে যখন আমি বদ্ধ, তখন অজানার অসীম সাগরেই আমার মুক্তি। যে কর্ণধার আমাকে এই মুক্তির যাত্রায় এগিয়ে নিয়ে যান তিনিও অপরিচিত। তিনি আমাকে চিরদিন এই ভরসাই দিয়েছেন—'চল আমার সঙ্গে। যদি চলার পথে কোনো বন্ধন তোমায় বাঁধে তবে আমিই সেই বাঁধন খুলে দেব।' তাঁর সঙ্গে আমার এই চিরকালের চুক্তি। তিনি কখনও সেই চুক্তি ভঙ্গ করেন নি।

ভীতু ছেলেকে সাঁতার শেখাতে গিয়ে যে বারবার তাকে জলে ঠেলে-ঠেলে ফেলে দেয় সে তো তার নিষ্ঠুর শক্র নয়, সে প্রেমময় বন্ধু। আমার এই প্রেমিক বন্ধুও বারবার আমাকে মৃত্যুর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়ে মৃত্যুর ভয় ভাঙান। আমার নিষ্ঠুর বন্ধু বারবার নতুন আপদের মধ্যে আমাকে ঠেলে দিয়ে ভয় দেখিয়ে তবে নির্ভয় করেন। প্রাচীন প্রবীণ (old prudence) বিষয়ীদের সলা-পরামর্শ (cold calculation) তিনি মানেন না। শুক্তি ভেঙে যেমন ভিতরের মুক্তা বের করে, তেমনি মৃত্যু দিয়ে বাহ্য আবরণকে বিদীর্ণ করে তিনি জীবনের সার সত্যকে অসীম মুক্তির পথে নিয়ে যান। (৩য়)

তবে তুমি বৃথা পরিচিত অতীতের জন্য হায় হায় কর কেন? বৃথা কেন ভাবছ এই জীবনতরী আবার অতীতের ঘাটে ফিরে যাবে! আবার কি বিগতের পুনরাবৃত্তি হবে? না-না-না। যতই ভাব, সেই অতীত তো আর ফিরবে না। সামনেই তো তোমার আশা ভরসা, তাকেই তোমার ভয়?

হায়রে হতভাগা! যে অতীতকে তুমি ভরসা কর সে তো তোমাকে নানা বাঁধনে বন্দী করেই রেখেছিল! কিন্তু ভয় নেই, চিরজীবনের কর্ণধার সঙ্গেই আছেন। যতই তোমার ভুল-ভ্রান্তি হোক, এমন দুর্গতি তিনি কিছুতেই ঘটতে দেবেন না। অতীতের বাঁধন ছিঁড়বে, মুক্তি আসবে, মুক্ত পথের দ্বার খুলে যাবে। পিছন তোমাকে কোনো মতেই চিরদিন বাঁধতে পারবে না। এই আনন্দেই আনন্দিত হও। (৪র্থ)

যাত্রার সময় হয়েছে, জোয়ার উঠেছে, ঘণ্টা বেজেছে, এখানকার পালা শেষ করে দাও। সভা ভাঙুক।

তাঁকে দেখি নি, তাঁকে জানি না বলেই কি বুকে একটু ভয় লাগে? বিবাহের বরকে দেখার আগে কন্যার যেমন ভয়, তেমনি ভয় কি মনে জাগছে? কিন্তু তিনিই তো জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তম পতি। এই জনমের কূলে যখন তিনি আনলেন তখনও তাঁর এই লোকের যে স্বরূপ তা তো আমার অজানাই ছিল।

তারপরে এখানকার আলোকে, শ্যামল প্রকৃতিতে ও মানব-লোকের প্রেমের সংসারে তাঁকে দেখলাম, মুগ্ধ হলাম। তাঁর এই লোকের রূপটি তো জানি। তার সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছে। তাঁর চিরনবীন প্রেমে নবনব রঙ্গলীলা। এর পর তিনি কেন এই পুরাতন রূপেই আসবেন? কোন্ সাগরের কূলে কোন্ লোকে কোন্ রূপে সেই চিরনূতন প্রেমিকের দেখা পাব, তা কে জানে?

এই জীবনকে ভালো লেগেছে, তার আনন্দ আমার পরিচিত। যদিও এই জীবনারম্ভে যখন তারও আগেকার জীবনের শুক্তি ভাঙা হচ্ছিল, তখনও ভয়ে ও বেদনাতেই কাঁপছিলাম। তারপর এই জীবনের মুক্তা পাওয়া গেল। নব সৌন্দর্যে ও আনন্দে তাঁর সঙ্গে নতুন পরিচয় হল। জীবন-সাগরের এপারে যখন তাঁকে ভালবেসেছি, জীবন-সাগরের ওপারেও তখন তাঁকে নিশ্চয় ভাল লাগবে। এখনো তিনি তাঁর মুখখানি দেখান নি বলেই যত ভয়। অবগুণ্ঠন সরালেই আনন্দে বলে উঠব—

এখানেও তুমি জীবন-দেবতা!

… … …

জনমে জনমে তুমিই আমার,
মানব-জন্ম-তরীর মাঝি।

এ কবিতাতেও আমার চির-পুরাতন বক্তব্য (theme) নবরূপে দেখা দিয়েছে।

৩১নং

নিত্য তোমার পায়ের কাছে……

হে বিশ্বপতি, সকল ঐশ্বর্যে পূর্ণ তোমার বিশ্বজগৎ তোমারই চরণ-তলে। তুমি পূর্ণ, কোনোখানে তোমার অভাব নেই। তোমার এত ধনমান এত ঐশ্বর্য থাকতেও তোমার একটা মস্ত অভাব যেন কিছুতেই যাবার নয়। তোমার আনন্দ নেই।

যা নেই, তা পাওয়াতেই তো আনন্দ। কিন্তু তোমার পক্ষে তো 'নেই'

বলে কিছু নেই। সবই যে তোমায় 'আছে'। তবে তোমার আনন্দ পাবার উপায় কী? বিশ্ব-সংসারের সব কিছুই তো তোমার রয়েছে। তুমি নিত্য-পূর্ণ বলে তোমার প্রার্থনীয় আর কিছুই নেই, কাজেই আনন্দও নেই। না চাইতেই যা আছে তাতেই তুমি পূর্ণ। কোনো অভাব তোমার নেই। তবে তোমার আনন্দ হবে কিসে? ক্ষুধা-বিনা অন্নের, তৃষ্ণা-বিনা পানীয়ের, কামনা-বিনা মিলনের মূল্য কী?

তাই তুমি একে একে তোমার ঐশ্বর্য আমার হাতে দিচ্ছ। আমাকে পূর্ণ করবার জন্য তুমি আপনার সম্পদ্ একে একে হারাচ্ছ। তারপর আমি যখন তা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে যাই তখন তোমারই সব ধন আমার মধ্য দিয়েই আবার তুমি ফিরে পাও। এইরূপে হারিয়ে অভাবের সৃষ্টি করে আমার হাতে ফিরে পাওয়াতেই তোমার আনন্দ পাওয়া। এই এক অপূর্ব প্রেমলীলা!

হে চিরন্তন পূর্ণ, এমনি করেই তোমার সকল ঐশ্বর্য আমার মধ্য দিয়ে, আমার সম্পদ্ হয়ে আবার তোমার কাছে নিত্য নবনব রূপে ফিরে আসে। এও তোমার এক অপরূপ খেলা।

আমাকেই তোমার বিশ্ব-অমৃত-পানের পাত্র করতে চাও? সেই পাত্রে,

কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?

তবে কি,

আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি,
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি?*

এমনি করেই আমার সৃষ্টি দিয়ে তোমারই সৃষ্টিকে নব আনন্দ-মূরতিতে দেখে তুমি অপরূপ আনন্দ পাও। তোমারই সূর্য তোমারই আলোকের সৌন্দর্য ও শান্তি আমার নয়নে দেখে নতুন করে সেই শান্তি ও সৌন্দর্যকে তুমি উপলব্ধি কর। এমন করে তোমার আপনারই নিত্য সম্পদ্‌কে আমার মধ্য দিয়ে যেন তুমি নতুন করে কিনে নাও।

তোমার প্রেমের মধ্যে পরশমণির ধর্ম আছে কিনা বুঝবে কেমন করে? তাই আমার পরাণে তোমার প্রেমটি পরশ করিয়ে যখন দেখতে পাও যে পরাণ আমার হিরণ্ময় হয়েছে তখনই তুমি পরিচয় পাও যে তোমার প্রেমের

* গীতাঞ্জলি।

মধ্যে সত্যই পরশমণির ধর্ম আছে। আমি ছাড়া তোমার আপন পরশমণির পরিচয় পাবারও কোনো উপায় তো তোমার নেই।

যেখানে তুমি সর্বৈশ্বর্যময় সর্বশক্তিময় বিশ্বপতি বিরাট্ বিভু, সেখানে আমি কে? সেখানে আমার কোনো প্রয়োজনই নেই। কিন্তু যেখানে তুমি প্রেমময় সেখানে তোমারও তো আনন্দ চাই। তাই দোসর বন্ধুও চাই। তাই সেখানে অকিঞ্চন হলেও আমাকে ছাড়া তোমার চলে না। সেখানেই আমার সার্থকতা।

হে পরিপূর্ণ, আমি না থাকলে তোমার কাছে বিশ্বের সব ঐশ্বর্য থাকলেও তা না থাকারই সামিল হত। কারণ তোমার ঐশ্বর্যের আর তবে কোনো মূল্য থাকত না। তোমার অতীত অবিদিত সেই ঐশ্বর্যকে তুমি আমার মধ্যে দিয়েই বর্তমান করে তাকে উপলব্ধির আনন্দ পাও। নতুন করে পাবার আনন্দময় ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই তুমি আমাকে সর্বস্ব দিয়ে নিজে একেবারে রিক্ত হয়েছ।

আলোচনা—একদিন গেয়েছিলাম—

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাইতো আমি এসেছি এই ভবে।

সেই ভাবটাকেই এই কবিতায় আর এক রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। তোমারই সূর্যোদয়কে আমার দৃষ্টিতে নতুন করে পেতে চাও।

এই যে আমার মধ্য দিয়ে তোমারই ধন তোমার পাওয়া, তাতেই একটা আবর্তন (cycle) চলেছে। সাগর আপন জলই সূর্যতাপে আকাশকে দেয়। সেই জলই বৃষ্টির ধারায় নির্ঝরে ও নদনদীর নৃত্যে আবার আনন্দ-আবেগে সাগরে ফিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই হারানো ও কুড়োনোতেই বিশ্বের গতি। কাজেই আমার মধ্যে যা-কিছু সম্পদ্ রয়েছে সবই এসেছে তোমারই মধ্য হতে। সেখানেই তাদের আদি লোক। সেই মানস-লোকেই বলাকার মত তারা নিয়ত ফিরে যেতে চায়। এইজন্যই সম্পদের মধ্যে থাকলেও সদাই আমাদের মন উদাসী। কিছুতেই যেন তার তৃপ্তি নেই। সদাই যেন কোথায় সে উড়ে যেতে চায়।

আমি গান রচনা করি। সেই গান তো আমারই মধ্যে ছিল। তবে তা কেন বাইরে সৃষ্টি করি? যতক্ষণ সে আমার মধ্যে ছিল ততক্ষণ তার থাকা না

থাকা আমার পক্ষে সমান। আমার ভিতর হতে তাকে হারিয়ে আমার বাইরে তাকে কথায় ও সুরে যখন একত্র করে পেলাম তখনই তাকে নতুন করে পেলাম। এই রকম করে হারিয়ে পাওয়ার সাধনার অনেক দুঃখও আছে। তবু সেই দুঃখের সাধনা ছাড়া গতি নেই। বিধাতাকেও বিশ্বসৃষ্টির জন্য কঠোর তপস্যা করতে হয়েছে।

[স তপোঽতপ্যত।]

নতুন করে পাওয়ার অন্য কোনো পন্থা তো নেই। নব জন্মলাভের বেদনা (travail) থাকবেই থাকবে।

অনেক দুঃখে আমার অন্তরের অব্যক্ত সংগীত বাণীতে ধ্বনিতে নবরূপ পেল। অন্য সকলে যখন তা শুনে আনন্দ লাভ করবে, তখন আমার অন্তরের অব্যক্ত আনন্দকে, আমার অন্তর-সংগীতকে, আবার আমিও যথার্থ ভাবে নতুন করে পাব। নানা শ্রোতার মনের বিচিত্রতায় আমার সংগীত আনন্দ-বৈচিত্র্য লাভ করবে। আমার মনের সঙ্গে তাদের মনের ভাবগত যোগ থাকলে আমিও তাতে আমার আনন্দকে নানা বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যে ভরপুর করে পাব। এই সংগীত তো আমারই ছিল। কিন্তু অন্যের চিত্তের বিচিত্র আনন্দের মধ্য দিয়ে তাকে যে বিচিত্র করে ফিরে পাওয়া তাকেই বলতে পারি নতুন করে পাওয়ার যথার্থ পরিচয়। প্রেমের এই রহস্যই সেদিন আমি 'ফাল্গুনী'তে গেয়েছি—

তোমায় নতুন করেই পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ।

বাইবেলে একটি গল্প আছে (Prodigal Son)। একজনের কয়টি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে একজন উধাও হয়ে বহুদিন পরে আবার ঘরে ফিরে এল। সেই হারাধনকে পেয়ে পিতামাতার কী আনন্দ! সেই ছেলের চেয়ে ভালো সব ছেলে তাঁদের ঘরেই ছিল, তাতে তো তাঁদের তেমন আনন্দ হয় নি। হারাধনকে পাওয়াতেই তাঁদের পরম আনন্দ।

বিধাতার সৃষ্টিতে জনে-জনের মনে যে বিচিত্র আনন্দ সেই আনন্দেই তিনি বিচিত্র-আনন্দ-ময়। সকল মনের সঙ্গে যে তিনি ভিতরে ভিতরে চিন্ময় যোগ রেখেছেন, সে কি এই জন্যই? আমাদের মনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সংকীর্ণতার কত দুঃখ, মলিনতার কত আঘাত তাঁকে সইতে হয়, তবু বিচিত্র প্রেমানন্দের

লোভে সর্ব চিত্তের সঙ্গে এই যোগ তিনি কিছুতে বিচ্ছিন্ন করেন নি। এই সার্থকতার জন্যই নির্জন কারাবাসে বসে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেন। সকল শিল্পীর এই একই কামনা যে 'সকল চিত্তে আমার সৃষ্টি নব নব আনন্দ দান করে আমাকে ধন্য করুক।' কিন্তু সর্বচিত্তের সঙ্গে কবির বা শিল্পীর তেমন যোগ কই? ভগবান্ রসস্বরূপ, তাই সর্ব চিত্তে যুক্ত থাকবার জন্য তিনি সবার মধ্যে প্রবেশ করে রয়েছেন।

[রসো বৈ সঃ। সর্বমেবাবিবেশ।]

৩২নং

আজ এই দিনের শেষে......

পূর্ববর্তী কবিতার ভাবের সঙ্গে কতকটা যোগ এই কবিতাতে আছে। পদ্মাতে একবার একটি চমৎকার সূর্যাস্ত দেখেছিলাম। উপরে মেঘের মধ্যে নানা বর্ণের আলোর অপূর্বচ্ছটা। নীচে জলের অকূলধারা, গভীর স্নিগ্ধ-বর্ণ। মনে হয় সেই ধারার বর্ণে যেন নীল ও শ্যামলের এক অপূর্ব সম্মিলন। এমন অপূর্ব বর্ণ-সমাবেশ (combination) বড় একটা দেখা যায় না। লোহিত সাগরে একবার এই রকম সূর্যাস্ত দেখেছিলাম। তখন মনে হয়েছিল যদি এই সূর্যাস্তটিকে বিকসিত স্বর্ণপদ্মের মত তুলে রেখে দিতে পারতাম! এই শোভাটি ক্ষণ-কালের মাত্র বলে উপেক্ষণীয় বা ক্ষুদ্র নয়। এরই বুকে সৌন্দর্যে জ্বল জ্বল করে অনন্ত (eternity) ভেসে উঠেছে। অন্তরের কী অপূর্ব ক্ষণকালীন প্রকাশ পদ্মার এই সূর্যাস্তে দেখলাম! এই রকম কত অপূর্ব সৌন্দর্য কত শুভ-যোগ ব্যর্থ (wasted) হয়ে যায়। আজ আমার চোখে পড়েছে বলেই আমি ধন্য হয়েছি। এমন কত অপূর্ব সৌন্দর্য-কমল ফেলা যায়। তবু এক-একটা এমন অপূর্ব সৃষ্টি জায়গা-মতো এসেও পৌঁছচ্ছে। আমের গাছে কোটি কোটি মুকুল তো ধরে, তার মধ্যে কটাই বা ফলে! সেই দিনকার সন্ধ্যায় পদ্মার সেই অপরূপ সূর্যাস্ত-শোভা আমার হৃদয়ে ফলে রইল।

ব্যাখ্যা—আজ দিন-শেষে এই যে সন্ধ্যা আপন কালো কেশে সূর্যাস্তের মাণিকটা পরেছিল তাকে আমি হৃদয়ের মধ্যে কবিতায় গেঁথে নিলুম। বিনি-সুতায় গাঁথা গোপন হারের মত চিরদিন আমার বুকে তা রইল। সন্ধ্যার অন্ধকারে চক্রবাকের দল ঘুমিয়ে পড়েছে, পদ্মাতীর নীরব নির্জন। প্রকৃতি যে সান্ধ্য-পূজার জন্য স্বর্ণ-কমলের মালাটি গেঁথেছিল তা তোমার চরণে স্পর্শ

করিয়ে নির্মাল্য করে নিল। সন্ধ্যা সেই নিবেদিত মালাটি অসীম আকাশ পার হয়ে আমার প্রণতিনত ললাটে নিঃশব্দে ছুঁইয়ে গেল।

পদ্মার নিস্তরঙ্গ জলস্রোতে আকাশের তারা ও নীহারিকার ছায়া যেন ভেসে চল্ল।

কন্যারা যেমন সন্ধ্যাকালে জলে প্রদীপ ভাসায়, তেমনি মনে হল কে যেন তারার দলকে এই অপার অনন্ত তিমির ধারায় ভাসিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি তখন যেন নিদ্রাকাতর শিশুর মত অকাতরে ঘুমুচ্ছিল। সন্ধ্যা যে সোনার চেলীখানি পরে এসেছিল তা যেন সে রাত্রির অঙ্গনে সেই অলস কায়ার উপরে বিছিয়ে দিল। তার পরে সপ্তর্ষির ছায়াপথে কালো ঘোড়ার রথে সন্ধ্যা বিদায় নিল। নীহারিকার অস্পষ্ট নক্ষত্রগুলি মনে হল সেই রথের আলোকদীপ্ত ধূলি। এইসব অপূর্ব লীলাই তো চোখ মেলে দেখলুম।

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই যে সন্ধ্যা সেদিন এসেছিল, এই যে এত কাণ্ড এত ঘটা এত আয়োজন, তার প্রকাশ রয়ে গেল কি একটি মাত্র কবির কাছে! এক জনের কাছেই সে যে সার্থক হল, তাতেই সে ধন্য?

কবির কপালে সন্ধ্যা তার করুণ পরশটি রেখে গেল। অনন্ত কালের মধ্যে এই সন্ধ্যাটির তো আর তুলনা নেই। এমন সন্ধ্যা আর হয় নি আর হবেও না। একজন কবিকেই তা ধন্য করে গেল। এমন করেই তিনি নিত্যকালের অনন্ত অমৃতরস এক-নিমেষের পত্রপুটে ভরে হয়তো কাউকে পান করিয়ে যান। তাঁর চিরকালের ধনকে ক্ষণকালের করে তখন তাকে ধন্য করে দেন। নিত্যকালের যে-আনন্দ তাঁর কাছে নতুন হয়ে দেখা দেয় সেই নব-আনন্দে তিনিও আপন চিরন্তন আনন্দকে নতুন করে ফিরে পান। এমন করেই তিনি তাঁর প্রিয়জনকেও ধন্য করেন, আপনিও কৃতার্থ হন।

৩৩নং

জানি আমার পায়ের শব্দ
রাত্রি দিনে শুনতে তুমি পাও⋯*

ব্যাখ্যা—জীবনের পথে আমি ক্রমাগতই চলেছি। আমার চলার পথে আমি বিশ্বকেও সঙ্গে নিয়ে চলেছি। আর কেউ আমার এই চলার দিকে দৃষ্টি

* গ্রন্থভূমিকা দ্রষ্টব্য।

রেখেছে কিনা জানি না। কিন্তু আমার চলাতে তাঁর ঔৎসুক্য ও আনন্দের সীমা নেই। আলোকে-আঁধারে আমার চরণ-ধ্বনি তাঁর কানে ক্রমাগতই পৌঁছচ্চে। আমার হৃদয়ের সখা আমার বিকাসের প্রতীক্ষায় আছেন। তাঁর সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে আমার সুরগত মিল রয়েছে। আমার বিকাসেই তাঁর পরম আনন্দ। শরৎ-আকাশের অরুণ আভাসে সেই আনন্দই ফুটে ওঠে। ফাল্গুনের ফুলের বন্যায় তাঁর খুসিটিই ধরা পড়ে।

আমার চিত্ত যতই বিকসিত হচ্চে ততই প্রকৃতির সূর্য-চন্দ্র-তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ততই বিশ্বের সৌন্দর্য আরও সুন্দর হয়ে চলেছে। আমি যতই পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি সাগর ততই আনন্দে আরও নাচতে থাকে, বিশ্ব পুলকিত হয়ে ওঠে। আলো-অন্ধকারের সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে আমার প্রত্যেকটি পদধ্বনি একজন হৃদয় দিয়ে প্রেম দিয়ে শোনেন। (১ম)

আমার শাশ্বত জীবনটি যেন এক বিরাট্ অনন্তদল কমল।

জীবনের পর জীবন পার হয়ে চলেছি, আর আমার জীবন-পদ্মের পাপড়ির পর পাপড়ি খুলচে। কোথায় সে জীবন-পদ্ম আমার ফোটে? সে ফোটে তোমার মানস-সরোবরে। তাই আমার বিশ্বের সূর্যতারা সেই পদ্মটির বিকাস দেখবে বলে তাদের সব আলো ফেলে সেই সরোবরের কূলে কূলে কৌতূহলের ভরে ঘুরে বেড়ায়। তারা সবাই আমার জীবন-পদ্মের দল-খোলার লীলা দেখবার জন্য দিবারাত্রি তাকিয়ে আছে।*

আকাশে ঐ যে নক্ষত্রের দল, ওরা যেন অন্ধকারের বৃন্তের উপরে বহু ফুলের মঞ্জরী। ওরা যেন আলোকের বিচিত্র লোক, অপার তিমির-সাগরে ফুটে জ্বল জ্বল করছে। তবু ওরা জগৎ, স্বর্গ নয়। স্বর্গ রচিত হবে আমার জীবন-পদ্মের বিকাসে। সে এত সুকুমার লাজুক যে সে পাতার আড়ালে লুকিয়ে ফুটতে চায়। সে যে অপরূপ সুকুমার কমল। যেমন তেমন করে তো তার বিকাস হবার নয়। তাঁর চরণের নির্মাল্য হবার জন্য সে শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র হয়ে

* জাপানে যখন পদ্মফুল ফোটে, তখন সেখানকার সহৃদয় দ্রষ্টারা ভোরবেলা কখন্ পদ্ম ফুটবে, কখন্ ফুলগুলি তাদের আবরণ বিদীর্ণ করে আপনি দলমণ্ডল বিকসিত করবে, তা' দেখবার জন্যে সরোবরের তীরে রাত জেগে প্রতীক্ষা করে থাকে। এই প্রতীক্ষাতেই তাদের চিত্তের সরসতার প্রমাণ। আর আমাদের দেশে তো কত পদ্মই ফোটে, আমরা কি তা' কখনো কিছুমাত্র আগ্রহ নিয়ে দেখি? এতেই বুঝতে পারি আমাদের চিত্ত কত স্থূল, কত অসাড়। (গুরুদেব হইতে শ্রুত)

ফুটবে। গৌরবের দীপ্তি তার সার্থকতা নয়। ঐরকম ঐশ্বর্য সে চায় না। সবার চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বল নক্ষত্র-লোক সে নয়।

আমার অন্তরে যে গোপন পদ্মের অপূর্ব বিকাস, তা-ই তো তোমার গোপন লাজুক স্বর্গ। তাকে জগৎ বল্লে তার অপমান করা হয়। সেই স্বর্গ একটি লাজুক ফুলের মত নিভৃতে ফুটচে। তার বিকাস বড়ই গোপনে বড়ই ধীরে ধীরে। মঞ্জরীর মত তা একসঙ্গে ফোটে না; তার দল একটি একটি করে বিকসিত হয়। আমার প্রেমের বিকাসের সঙ্গে তার দলগুলিও খোলে। সেই গোপন বিকাসটির জন্য তোমার অশেষ কৌতূহল, তাতেই তোমার আনন্দ।* এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার পূর্ণ মিলন।

৩৪নং

আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে……

তোমার চিত্ত যেখানে কাজ করচে সেখানে দৃষ্টি প্রসারিত করবার জন্য আজ আমার মনের জানলাটি খুলে দিলাম। আমার নিজের ভাবনা-চিন্তা নিজের সুখ-দুঃখ আজ আর আমাকে ধরে রাখতে পারল না। সে-সব দিকে না তাকিয়ে তুমি যেখানে বিশ্বের মধ্যে আপন মনের আনন্দে কাজ করচ সেই দিকে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে রইলাম। বিশ্বের মধ্যে তোমার মন প্রেমানন্দে যেভাবে কাজ করচে সেই রসটি অনুভব করতে চাইলাম। তাই আজ আমার মনের জানলা খুলে সেই উন্মুক্ত বাতায়নে বসে চুপ করে তোমার সৃষ্টির দিকে চেয়ে আছি।

বাইরের দিকে চেয়ে আজ কী দেখলুম? দেখতে পেলুম তোমার ডাক। লোকে ডাক শুনতে পায় কানে, কিন্তু আজ তোমার ডাকটি যেন চোখে দেখা গেল, অন্তরে পাওয়া গেল। হৃদয়ে হৃদয়ে তোমাতে আমাতে যে যোগাযোগ ও ডাকাডাকি (communication) চলেছে, তা তো কানেই শুনেছি। আজ সেই ডাক শুধু হৃদয়ের মধ্যে না শুনে তাকে যেন দেখতেও পেলাম বাইরে প্রকৃতির মধ্যে।

দেখলাম সেই ডাক চৈত্রের ফুলে-পল্লবে। যে-ডাক এতদিন ছিল ভিতরে,

* দ্রষ্টব্য—'বালিকা-বধূ' কবিতা।

দেখলাম সেই ডাকই আজ চৈত্রের পত্রে-পুষ্পে বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে অন্তরের মধ্যে তাকে দেখবার আজ দরকার নেই। আজ প্রত্যক্ষরূপে তাকে বাইরেই পাওয়া গেল। তাই আজ সব কর্ম ভেসে গেল, আজ নয়ন মেলে শুধু চেয়েই রইলাম। (১ম)

এতদিন আমি আপন ইচ্ছায় যে-সব গান গেয়েছি, সেইসব গানই যেন একটা পরদা হয়ে তোমার গানকে এতদিন আড়াল করে রেখেছিল। যেই সেটা সরে গেল অমনি তোমার সুর বের হয়ে পড়ল। আমার গানের কোলাহল ভেদ করে তোমার গানের সুর আমার কানে এতকাল পৌঁছয় নি। আজ আমি যখন আমার প্রকাশ-মুখর (active) গানের পরদাটা সরিয়ে নিস্তব্ধ (passive) হয়ে বিশ্বে আমার চিত্ত মেলে দিলাম, তখন যে-সৌন্দর্য প্রথমে চোখেই দেখা যেত তাই যেন সুর হয়ে গান হয়ে কানে ঝংকৃত হয়ে উঠল। কেমন করে এমন হল তা বলব কী করে ?

আজ সকাল বেলায় আকাশে ও আলোতে তোমার গানকেই পেয়ে প্রকৃতির মধ্যে তোমার আনন্দ-সংগীত উপভোগ করতে লাগলাম। শুনতে পেলাম তোমার গানের মধ্যে আমার গানও তোমারই সুরে যেন ধ্বনিত হচ্ছে। এখন আমার এত আনন্দের মর্মটি পাওয়া গেল। আজ আর আমার আলাদা হয়ে গাইবার দরকার নেই। আজ প্রভাতের আলোতে তোমার সুরেই তো আমার গান পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আজ তাই চুপ করে শুনচি। বিশ্ব-চরাচরে সেই অপূর্ব লীলা দেখছি।

তোমার বিশ্বের সৌন্দর্যে আমার প্রাণ আপন আনন্দের সুরে সাড়া দিয়েছে। তাইতো আমি আমার সুর পেয়েছি। আমার অন্তরের সেই আনন্দই আজ তোমার বিশ্বে ধ্বনিত। আমার প্রাণের এই সাড়া-দেওয়াটুকু (response) না থাকলে তোমার বিশ্ব-সৌন্দর্যই বা কী, আর আমার সংগীতই (music) বা কী ? আমার প্রাণই যদি তোমার প্রেমে ও সৌন্দর্যে না বেজে উঠত তবে আর কিসে আমার আনন্দ ? আমিও বিশ্বকে আপন প্রাণের এই আনন্দরস দিয়ে সুন্দর করচি। বিশ্বের সৌন্দর্য আমার চিত্তের সুরে ধ্বনিত হয়েই তো হয়েছে এমন মনোরম। আবার আমার সুরও যদি তোমার বিশ্বের সৌন্দর্যে সাড়া না পায় তবে তোমার বিশ্বজগৎ বোবা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তা তো নয়। তোমার বিশ্ব-সৌন্দর্য ও সংগীতও আমারই আনন্দধ্বনিতে ভরপুর।

তোমার বিশ্বের সুরেই আজ আমার গানের যথার্থ সুর শোনা যাচ্ছে।

আমার যে সুর আজ আমার মন থেকে হারিয়ে গেছে তাকেই আজ তোমার সুরের মধ্য দিয়ে ফিরে পেতে হবে। আমারই গানের সুর তোমার জগৎ থেকে আবার আমায় শিখে নিতে হবে।

আলোচনা—আমার গানের সুর আমাকেই ফিরে শিখতে হবে—এই কথায় হাসবার কিছু নেই। আমি গানে সুর দিয়ে নিজেই সে সুর ভুলে যেতাম। না ভুললে তো নতুন গানের নতুন সুর আসতেই পারত না। আমার সুরগুলি আমি সুরের ভাণ্ডারী দিনুকে* দিয়ে নিশ্চিন্ত হতাম। অনেক সময়ে আমার আপন গানের সুরই আমাকে আবার শিখতে হত দিনুর কাছে।

(প্রশ্ন—জগতের সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কী ?)

কালিদাস বলেছেন,

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্।

সৌন্দর্যে ও সংগীতে যে আমাদের মন অকারণে কেঁদে ওঠে তাতেই বোঝা যায় তার সঙ্গে আমাদের অন্তরে অন্তরে যোগ রয়েছে, যদিও কখন কী করে সেই যোগ ঘটল তার ইতিহাসটা আমরা ভুলে গেছি।

বিশ্বপ্রকৃতির যে সৌন্দর্য তার সঙ্গে আমার মনের যোগ রয়েছে। তা বিচ্ছিন্ন নয়। আমার মনের মধ্যে সেই যোগটির জন্যই সেই ভালোবাসাতেই বিশ্বের সব কিছু আমার ভালো লাগচে। এটাই হল সৌন্দর্যের মর্মগত রহস্য। যা দেখতে-রম্য তাকেই আবার শুনতে-মধুর করে পাচ্চি। একই সৌন্দর্য চোখে দেখা যায় রূপে, কানে ধরা দেয় ধ্বনিতে। কাজেই প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যে-আনন্দ তা আমারই আনন্দ-গানের সুর, যদিও তা সা-রে-গা-মা হয়ে বাজে নি—তা বেজেছে নানা বর্ণে নানা রূপ-রেখার সৌষম্যে। সেই সৌন্দর্যেও আমারই সুরকে আমি বাইরে শুনচি। আমার নিজের হৃদয়ের গানের সুরে তা না বাজলে আমার তাতে আনন্দ হত না। আমার এই আনন্দেই তাকে আমি এখন আপন বলে জেনেছি। এই আনন্দের মধ্যেই আমার অন্তরের হারাধনকে চিনতে পেরেছি। আমার সেই ধনটি আবার আমার ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে।

আজ আর আমার স্বতন্ত্র ভাবে গাইবার প্রয়োজন নেই। চুপ করে তাকিয়ে সব সৌন্দর্যে তোমার সুর তোমার সংগীত শুনতে পাচ্চি। তাতেই

* দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার মন খুসিতে ভরে উঠেছে। এই সংগীতের মধ্যে আমার আনন্দও বেজে উঠচে। এই ফুলে যে সৌন্দর্য তাতে আমার চিত্তের আনন্দ রয়েছে। কিন্তু তা বেজেছে তোমার ফুল-পল্লবের বর্ণময় অপরূপ সুরে। আমার হৃদয় মেলে দিয়ে যে তাকে শুনতে পেলাম এই তো আমার সৌভাগ্য।

৩৫নং

আজ প্রভাতের আকাশটি এই……

কাশ্মীরে শ্রীনগরে একটি প্রভাতে অন্তরের অনুভূতি নিয়ে লেখা। স্বদেশের (শ্রীনিকেতনের) (২১শে চৈত্রের) পর (৭ই কার্ত্তিক) শ্রীনগরে আমার এই কবিতাটি লেখা। এমন কয়টি কবিতার এখানে সৃষ্টি।

এই যে আকাশ আজ প্রভাতের শিশিরে সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে ছলছল করছে, এই যে নদীতীরের ঝাউগাছগুলি সোনার আলোয় ঝলমল করছে, এরা যদি আমার বাইরের নিঃসম্পর্ক বস্তু মাত্র হত তবে তো এরা আমার মনের বাইরেই পড়ে থাকত, অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে এমন অন্তরঙ্গ হতে পারত না। এরা যে এমন নিবিড় করে হৃদয় ভরে আমার অন্তরে বিরাজ করচে তাতেই বুঝেচি এরা আমার অন্তরেরই ধন, এরা বাইরের বস্তু-মাত্র নয়। বস্তুপিণ্ড-মাত্র হলে এরা এমন করে মনের অন্তঃপুরে প্রবেশ পেত না। তবে এদের সঙ্গে আমার অসীম ব্যবধান থেকেই যেত।

আজ ঝাউয়ের ঝলমলিতে আকাশের ছলছলিতে আমার মনকে এমন নিবিড় করে পূর্ণ করেছে যে, মনে হচ্ছে এরা যেন আমারই মানস-সরোবরে কমলের মত টলমল করে ফুটে উঠেছে। এরা যেন বাইরের নয়, এরা আমার মনেরই সামগ্রী, তাই আমার মনের মধ্যে আজ ভরে উঠেছে।

(এই বাহিরের প্রকৃতিতে যিনি শোভমান, আমার অন্তরেও তিনিই বিরাজমান।*) কাজেই আমিও এই বিশ্বের সঙ্গে আজ একাত্ম হয়ে রয়েছি। প্রকৃতির এইসব শোভা আমার অন্তরে আছে বলেই আজ বুঝেছি আমি শুধু ব্যক্তিবিশেষ মাত্র নই। বিশ্ববাণীর সঙ্গে আজ আমি বাণীরূপে, বিশ্ব-গানের সঙ্গে আজ আমি গানরূপে, বিশ্ব-প্রাণের সঙ্গে আজ আমি

* দ্রঃ—বৃঃ, আ, উপনিষৎ, ২, ৫, ১।

প্রাণরূপে এক হয়ে বিরাজমান। মায়ের কোলে যেমন শিশু জন্মলাভ করে, তেমনি বিশ্ব-অন্ধকারের হৃদয় বিদীর্ণ করে জলজল অগ্নিশিখার মত আমার এই ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমি যেন আজ বেরিয়ে এলাম।

আজ আমার এই দেহ বা সংকীর্ণ কোনো স্বরূপই আমার একমাত্র পরিচয় নয়, আজ চরাচরময় অন্ধকারের মধ্যে আমি যেন একটি বিদেহ দীপ্ত আলোক। বিশ্বের সঙ্গে আজ আমার অতি ঘনিষ্ঠ যোগ। আমিও আজ বিশ্বচরাচরে চিন্ময়রূপে পরিব্যাপ্ত।

৩৬নং

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি
ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা……

কাশ্মীরে শ্রীনগরে কার্ত্তিকের নির্মল আকাশ। পদ্মার মত ঝিলম নদী আমার পায়ের তলায়। সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে ঝিলমের জলে অন্ধকার নেবে আসচে। বোটের ছাদে বসে আছি। নদীর স্রোত কালো হয়ে গেছে, ওপারে জমাট অন্ধকার, চারিদিক নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। এমন সময় বুনো হাঁসের দল হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। পদ্মায় থাকতে এক এক সময় হঠাৎ শুনতে পেতাম হাঁসের দল চলেছে। তাদের পাখার ঝাপটে আকাশের বুকে অট্টহাস্যের মত চমক লাগিয়ে দিত।

ব্যাখ্যা—আমি ঝিলম নদীর যেখানে ছিলাম সেখানে নদীটি খুব বেঁকে গেছে। এতক্ষণ বাঁকা নদীটি তলোয়ারের মত সন্ধ্যালোকে ঝকমক করছিল, ক্রমে ঘনায়মান অন্ধকারে সেই ঝকমকি লুপ্ত হল। মনে হল যেন উজ্জ্বল তলোয়ারখানি অন্ধকারের কালো খাপে প্রবেশ করল।

ভাঁটার পরে যেমন জোয়ার আসে তেমনি দিনের শেষ আলোটি নিষ্প্রভ হয়ে এলে রাত্রির জোয়ার ঘোলা অন্ধকারের বন্যা নিয়ে এল। কালো অন্ধকারের বন্যায় সব ঢেকে গেল। কালো জলে যেমন ফুল ভেসে আসে তেমনি অন্ধকারের বন্যায় তারার দীপ্তি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। নদীর ধারের রাস্তার অপরপারে গিরিপাদমূলে শ্রেণীবদ্ধ দেবদারু গাছের তলায় যেন অন্ধকার আরও জমাট।

অনেক সময় স্বপ্নে লোকের বাক্‌রোধ হয়। চেষ্টা করলেও গলার স্বর বের হয় না। রাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যে দেবদারু-মূলের অন্ধকার মনে হচ্ছিল যেন আরও ঘন। সেই অন্ধকারের যেন কোনো প্রকাশই নেই। সৃষ্টি যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে সেই অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ প্রকাশের অভাবে গুমরে গুমরে উঠচে। বলবার প্রাণপণ চেষ্টা, কিন্তু বলবার উপায় নেই। সেই ঘন আচ্ছন্ন অন্ধকার যেন পাহাড়ের বোবা গুম্‌রোনো পুঞ্জীভূত মূক ব্যাকুলতা। (১ম)

নদীর জল অন্ধকার, স্রোত দেখা যাচ্ছে না, সান্ধ্য আকাশ নীরব নিস্তব্ধ। শব্দের বিদ্যুৎ-ছটা শূন্য আকাশে বিকীর্ণ করে হংসশ্রেণী মাথার উপরে হু-উ-উ-স্ শব্দের ঝলক দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে কোন্ দূর হতে দূরান্তরে উধাও হয়ে চলে গেল। পদ্মায় বোটে থাকতে এই শব্দ আমি অনেক শুনেছি। তখন এই শব্দ মনে হত যেন ভূতুড়ে অট্টহাস্য। ঝঞ্ঝার মদ খেয়ে মত্ত পাখীদের পাখা যেন আনন্দের পুঞ্জীভূত অট্টহাস্যে আকাশকে তরঙ্গিত করে শব্দের ঝড় বইয়ে দিয়ে গেল। শান্তিসুপ্ত আকাশ চম্‌কে জেগে উঠল। আকাশ বিস্মিত হল, স্তব্ধ আকাশ তরঙ্গিত হল। দেবলোক হতে যেমন ঝংকৃতা অপ্‌সরী এসে স্তব্ধতার মৌন তপস্যাকে ভঙ্গ করে, তেমনি ঐ পক্ষধ্বনি চারিদিকের স্তব্ধতাকে ভেঙে চুরে মন উতলা করে গেল। ধ্যানরত তিমির-মগ্ন গিরিশ্রেণী চমকে উঠল, দেওদারবন রোমাঞ্চিত হয়ে ভাবল 'একী, এ হল কী!' (২য়)

চারিদিকের সান্ধ্য নীরব স্তব্ধতার অন্তরে অন্তরে ঝঞ্ঝামদমত্ত এই পাখার বাণী যেন এক পলকের মধ্যে পুলকিত বেগের আবেগ জাগিয়ে দিল। নিশ্চল চিত্তেও একটা বেগের চঞ্চলতা একটা চলবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। ছুটে-চলা সেই বেগের বাণীতে অচল পর্বতও যেন ব্যাকুল হয়ে কালবৈশাখীর ঝোড়ো মেঘের মত উধাও হয়ে উড়ে যেতে চাইল।

তরুশ্রেণীর পা মাটিতে বদ্ধ। তারাও সেই বাঁধন ছিঁড়ে পাখীর মত পাখা মেলে ঐ পাখার শব্দের পিছনে পিছনে দিশাহারা হয়ে উড়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হল। হায় হায়, তাদের পা যে বাঁধা, তাই হাহাকার করে শাখার পাখা বৃথাই তারা ঝাপটাতে লাগল। সান্ধ্য আকাশের বোবা স্বপ্ন টুটে গেল, আকাশের হৃদয়ের মধ্যে সুদূরে উধাও হয়ে যাবার জন্য বেদনার তরঙ্গ জাগল। উদাসী পাখীর খ্যাপা পাখা সর্বত্র খ্যাপামি জাগিয়ে দিয়ে কোথায় উড়ে চলে গেল।

যাযাবর (migrant) পাখীদের বাসা যেন বাসাই নয়। সাগর-পারের অজানা বাসার জন্যই তাদের বিবাগী মন সদাই কাঁদে। সেই উদাসী পাখীর পাখার শব্দেও বাজে বিবাগী সুর। সেই উদাসী পাখায় ব্যথিত বাণীতে নিখিলের প্রাণে একটা ব্যাকুলতা জাগল। সেই বাণী সকল হৃদয়ে এই কথাই নিরন্তর বাজিয়ে দিয়ে গেল,—

> হেথা নয়, হেথা নয়,
> আর কোনো খানে। (৩য়)

হে হংস-বলাকা, আমার স্তব্ধতার আবরণের তলে যে এত বেগ ও বাণী ছিল তা তো আমার জানা ছিল না। তোমার গতি দিয়ে হঠাৎ যেন তুমি তা খুলে দিলে। তখন দেখি আর কিছুই নিশ্চল নেই, সবই সচল। তখন শুনলাম, নিঃশব্দের তলে আকাশ জুড়ে চরাচরব্যাপী পক্ষ উদ্দাম চঞ্চল হয়ে ক্রমাগত ঝাপটাচ্ছ। সর্বত্রই সেই পাখার ঝাপটের শব্দ। নিশ্চল কিছুই নেই, সবই উড়তে ব্যাকুল। মাটির নীচে বীজগুলি অংকুর হয়ে বলাকার মত পাখা মেলে ব্যাকুল হয়ে কোথায় উড়ে যেতে চাচ্চে। আবার তৃণদল বীজ হয়ে অংকুর হয়ে, রূপ হতে রূপে ঝাঁপ দিতে দিতে, প্রাণের অনন্ত শূন্য-পথে উধাও হয়ে যাবার জন্য মাটির আকাশে ক্রমাগত পাখা ঝাপটাচ্চে।

আজ আমি প্রত্যক্ষ দেখলাম যেন এই হিমাচলশ্রেণীও অগ্নিময় পাখা মেলে আকাশে উড়ে রওয়ানা হয়েছে। এই বনরাজিও পাখা মেলে কে জানে কোন্ দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, এই অজ্ঞাতলোক হতে কোন্ অজ্ঞাত লোকে ক্রমাগত উড়ে চলেছে। সবই ছুটে চলেছে। আকাশের নক্ষত্রদলের পাখার ঝাপটে যে আগুন জ্বলেছে তার বেদনায় অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আকাশকে বেদে ক্রন্দসী বা রোদসী বলে। আলোকে যেন ঘুম থেকে চমকে ওঠা শিশুর মত আকাশের রোদন-ক্রন্দন। (৪র্থ)

বিশ্ব-চরাচরে তো কিছুই নিশ্চল নেই। মানবজগতেও আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনা (idea, aspiration) যুগ হতে যুগান্তরে বলাকার মত ক্রমাগত উড়েই চলেছে। একথা কিছু আগেও বলা হয়েছে। এখানে তাই আবারও বলা হচ্চে। কোন্ অতীতে কোন্ মানবচিত্তের বিস্মৃতলোকে যেসব আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনার জন্ম তারা সেই আশ্রয় ছেড়ে কবেই বেরিয়ে পড়েছে। কোন্ সুদূরে কোন্ ভবিষ্যতে কবে তারা কী আকার ধরবে তা কে জানে। তবু দলে দলে আকাশ পূর্ণ করে তারা নিরুদ্দেশের পানে ছুটে বেরিয়েছে।

বিশ্বের যা কিছু সবই যখন বলাকার মত উড়ে চলেছে, আমার আপন অন্তরের সব আশা আকাঙ্ক্ষাও তখন সেই সঙ্গে উধাও হয়ে চলেছে। এরা সব কোথায় চলেছে কে জানে? আমি বসে বসে নিখিলের সব পাখার ঝাপটে একই বাণী শুনচি—

হেথা নয়, হেথা নয়
আর কোনো খানে।

'হেথা নয়' তো বুঝলাম; কিন্তু সেই 'আর কোনো খান' যে কোথায় তা কে জানে?* (৫ম)

৩৭নং

দূর হতে কি শুনিস
মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন……

দূর হতে য়ুরোপের মহাযুদ্ধের গর্জন খবরের-কাগজের মধ্য দিয়ে একটু-আধটু এদেশে এসেও পৌঁছচ্চে। এখানে বসে আমরা উদাসীন ভাবে আলোচনা করে চায়ের আসরটাকে জমিয়ে তুলি। ওরে দীন কৃপণাত্মার দল, যেখানে এই যুদ্ধ সত্য ও বাস্তব (real), সেখানকার রক্তারক্তি সেখানকার কান্না আজ প্রত্যক্ষ কর্। তরল আগুনের (liquid fire) তরঙ্গ ছুটে চলেছে, বিষবাষ্প (poison gas) চারিদিক আচ্ছন্ন করচে, আকাশ থেকে বোমা-বৃষ্টি হচ্চে, নীচ থেকে বিমানভেদী (anti-aircraft) কামানের গোলা ছুটচে, আকাশে ও ভূতলে মরণ-আলিঙ্গনে বাঁও-কসাকসি চলেছে। ওরি মাঝে পথ করে মানব-ইতিহাসের তরীকে নতুন যুগের তীরে নিয়ে যেতে হবে। মানব-ইতিহাসের কর্ণধারের ডাক শোনা যাচ্চে। তাঁর হুকুম এসেছে, 'আরাম ও ঐশ্বর্যের (prosperity) ঘাটের সঙ্গে বাঁধন এবারের মত চুকিয়ে দাও। সুখের ডাঙায় বসে বসে পুরোনো যুগের সব মতামত (creed) ও আচার-বিচার নিয়ে আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলবে না, নতুন সত্যের জগতে গিয়ে এখন লেন-দেন বেচা-কেনা করতে হবে।

* দ্রঃ—গ্রন্থভূমিকা।

বসে বসে এই হুকুম শুনলে চলবে না। এই যুদ্ধের মৃত্যু-অগ্নির সাগর পার হয়ে তরী বেয়ে নতুন যুগে পৌছতে হবে। (১ম)

সত্যের পুঁজি যা ছিল তা ফুরিয়ে দেউলে হয়ে গিয়েছে বলেই জাতীয়তা (nationalism) প্রভৃতি পুরোনো সব সস্তা মালকে বহুমূল্য বলে দাঁড় করিয়ে পাষণ্ড ভণ্ডদের বঞ্চনা-ব্যবসা বেড়েই চলেছে। তার মাঝে কর্ণধারের হুকুম এল, 'তুফান বেয়ে দুঃখ-সাগর পার হয়ে নতুন যুগের তীরে পৌছতে হবে।' তাই তাড়াতাড়ি দাঁড়ীর দল দাঁড় হাতে করে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। (২য়)

ঘুম ভেঙেচে, কিন্তু আলো যে এখনো আসে নি! আলো এলে যে বাঁচি! নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলতে আর দেরী কত?—ভীতেরা হঠাৎ জেগে উঠে এই কথাই কাতরে জিজ্ঞাসা করচে। হয়তো প্রভাত এসেছে, রাত্রি নেই, তবু ঝড়-দুর্যোগের পুঞ্জীভূত ঘন কালো মেঘের অন্ধকারে আলো ঢেকে রয়েছে। রাত পোহালো কিনা কেউ বুঝতে পারচি না। দিগন্তে তুফানের ঢেউ গর্জিয়ে ফেনিয়ে উঠচে। তারই মাঝে কাণ্ডারী হাঁকচেন, 'ঝড়তুফানে পাড়ি দিয়ে নতুন সমুদ্রতীরে তরী ভিড়াতে হবে। যাত্রা কর।' (৩য়)

ঝড়-তুফান অগ্রাহ্য করে আজ তরী বাইতে কারা বেরিয়ে এল? মা কাঁদছেন, স্ত্রী কাঁদছেন, চারিদিকে বিচ্ছেদের হাহাকার, ঘরে ঘরে আরামের শয্যা শূন্য হল। হুকুম শোনা যাচ্চে, 'যাত্রা কর যাত্রা কর, এই বন্দরের সময় শেষ হয়েছে।' আদেশ পৌছল। মৃত্যু-সাগর পাড়ি দিয়ে তরী যাত্রা করল। (৪র্থ)

কোন্ ঘাটে যেতে হবে, কবে গিয়ে পৌছব—এইসব খবর শুধাবার সময় নেই। এখন শুধু তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেয়েই চলতে হবে। দাঁড় আঁকড়ে ধর, পাল টেনে রাখ। এখন প্রশ্ন নয়, তর্ক নয়। লেগে যাও। কোথায় লক্ষ্য তা জানেন কর্ণধার। বাঁচি আর মরি এখন শুধু তরী বেয়েই চলতে হবে। (৫ম)

হুকুম এসেছে, এই যুগ শেষ হয়েছে। এই বন্দর ছাড়তেই হবে। অজানা সাগর পার হয়ে অজ্ঞাত দেশে যাবার জন্য তুফানের কণ্ঠে প্রচণ্ড ডাক এসেছে। শূন্যে শূন্যে তারই গর্জন শোনা যাচ্চে। নবজীবনের এই দারুণ দুঃখময় অভিসারের অন্ধকার-পথে শুধু শোনা যাচ্চে আজ মরণের গান। (৬ষ্ঠ)

যাত্রা যখন আরম্ভ হল তখন কি কোনো শুভলক্ষণের দেখা পাওয়া

গেল ? পৃথিবীর যত দুঃখ-বেদনার কান্নাই তখন শোনা যেতে লাগল। যত পাপ, যত অমঙ্গল, যত হিংসা-দ্বেষ-ক্ষুদ্রতা-স্বার্থ-নীচতার দল, এতকাল যারা আরামে রাজত্ব করেছে, তারা সবাই 'হা-হা' করে নিজ নিজ কূল ছেড়ে ঊর্ধ্ব আকাশকে ব্যঙ্গ করে বাইরে ছুটে এল। চোখের জল, মৃত্যু, প্রলয়-অগ্নি সব এসে পথে দাঁড়াল। তবু এইসব ঠেলে তরী বেয়ে চলতেই হবে। নিখিলের হাহাকারের মধ্য দিয়েই যাত্রা করতে হবে। মাথার উপরে চলেছে উন্মত্ত ঝড়। তবু চিত্তে যেন অন্তহীন আশা থাকে। যত দুঃখই আসুক নির্ভয়ে যাত্রা করতে হবে। (৭ম)

ওরে ভাই, আজ কে কার নিন্দা করবে ? সবাই মাথা নত কর। আজ আমার-তোমার-সবার পাপেরই প্রায়শ্চিত্তের দিন এসেছে। বায়ু-মণ্ডলে অনেক দিনের বৈষম্যের বিপদ জমতে জমতে একদিন দারুণ ঝড় আসে। তেমনি বিধাতার বক্ষে এতকাল পাপের যে তাপ জমছিল আজ বায়ুকোণে তা-ই ঝড়ের মেঘ হয়ে দারুণ যুদ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রবলের যত অন্যায়, ভীরুর যত ভীরুতা, লোভী বঞ্চকদের নির্মম অন্তহীন যত লোভ, বঞ্চিত সর্বস্বান্তদের অসীম যত চিত্তক্ষোভ, জাতি-অভিমানের যত নীচতা, মানব-ইতিহাসের দেবতার যত অসম্মান, সবই আজ বিধাতার বক্ষ বিদীর্ণ করে এই ঝড়ে জলে-স্থলে হাহাকার করে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। এদেশে-ওদেশে কোথাও আজ শান্তি নেই। সর্বত্রই মানবের যত দুর্গতির প্রায়শ্চিত্ত আজ চলেছে। (৮ম)

আজ মাথায় ঝড় ভেঙে পড়ুক, তুফান জাগুক, নিখিলের যত বজ্রবাণ সব শেষ হয়ে যাক। এখন সমালোচনা করে লাভ নেই ; ভাল ভাল সব সাধু-বাণী আউড়ে কাজ নেই। রেখে দাও সাধুত্বের যত অভিমান, এখন শুধু একমনে পার হও। প্রলয়-সাগর পার হয়ে নবযুগের নূতন সৃষ্টির তীরে নবজীবনের বিজয়-ধ্বজা তোল। (৯ম)

দুঃখ, পাপ, জীবনের স্রোতে [illegible] এ তো নিত্যই দেখছি, প্রতিক্ষণেই দেখচি। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর [illegible] খেলা তো চিরদিনই চলেছে। দুঃখ-পাপ-মৃত্যু-অশান্তি ক্রমাগত আসচে [illegible]। জীবনকে একটু বিদ্রূপ করে স্রোতের মত তারা সরে সরে যাচ্ছে। পাপ [illegible] নীচতা-স্বার্থ প্রভৃতিকে এতদিন ছোট করে দেখেছি। কিন্তু এবার [illegible]ভূত পাপের বিরাট্ স্বরূপ দেখা গেল। এই দারুণ দৃশ্য না দেখলে তার ভয়ং

স্বরূপটি বোঝাই যেত না, আর তার প্রতিকারের কোনো চেষ্টাই তো হত না।

জগৎময় যে-মৃত্যু ছড়িয়ে আছে তাকে ক্ষুদ্র বলে উপেক্ষা করা যায় কিন্তু এই মহাযুদ্ধে যে-মৃত্যুর পুঞ্জীভূত দারুণ রূপ দেখা গেল, তাকে তো উপেক্ষা করা চলে না। মার কাকে বলে, দুঃখ-যন্ত্রণা (suffering) কাকে বলে যদি দেখতে চাও তবে এই দারুণ যুদ্ধ দেখ।

তারপরে নির্ভয়ে মৃত্যুকে দুঃখ-ক্ষয়-ক্ষতিকে বল, 'এ সংসারে প্রতিদিন তোর ক্ষুদ্র স্বরূপ দেখছি। প্রতিদিনই তোকে জয় করে করে চলেছি, ভয় করি নি (মা ভৈঃ)। ছোট ছোট দৈনন্দিন নীচ হীনতাকে (evil) পদে পদে জয় করতেই হয়েছে। নইলে জীবন অসহ্য হত, ভদ্রতা সংস্কৃতি দাঁড়াতেই পারত না। কিন্তু আজ তোর বিরাট্ স্বরূপ দেখলাম, একেও আজ ভয় করব না। হৃদয়ের রক্তকুম্ভ বিদীর্ণ করে আজ বলব—তোর চেয়ে আমি সত্য, এজন্য প্রাণ দিতে দাঁড়ালাম। আজ বলবো,—'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সেই চিরন্তন একই সত্য।'

আজ মৃত্যুর বিভীষিকা সেজে দৈত্যরূপ নিয়ে পাপ যে এসেছে, তাতে ভয়ে সংকুচিত হলে চলবে না। আজ জীবন দিয়ে বলতে হবে, 'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।' (১০ম)

পাপকে ভয় করতে নেই। সে নিজেই ভয়ভীত। সে গর্তে লুকিয়ে আপন লজ্জা বাঁচায় ও আত্মরক্ষা করে। মৃত্যুর সেই গহ্বরে ঢুকে অমৃত যদি খুঁজে বার করতে না পারি, দুঃখের সাথে লড়ে যদি সত্য না মেলে, তবে বৃথাই এই যুদ্ধ, বৃথা এত মৃত্যু। এইসব বড় বড় যুদ্ধে পাপ-নীচতা তার গর্ত ছেড়ে বাইরে এসেছে। প্রত্যক্ষ হয়েও যদি সে না মরে তবে আর কী হল? অস্ত্র-শস্ত্রের অসহ্য ভারে সজ্জিত অত্যাচারী নিষ্ঠুর দম্ভ যদি আজ ভেঙে চূর্ণ হয়ে না যায় তবে এইসব ঘরছাড়ারা কি বৃথাই মরবে? অন্তরের কী আশ্বাসে তবে এরা আজ নক্ষত্রের দলের মত প্রভাত-আলোর দিকে মরতে ছুটেছিল? (১১শ)

বীরের এ রক্তস্রোত, মায়ের এত চক্ষের জল সবই কি বৃথাই এই ধুলোয় শেষ হয়ে যাবে? এত মূল্য দিয়েও কি মানবের নবযুগের স্বর্গরাজ্য পাওয়া যাবে না? বিশ্বের যিনি ভাণ্ডারী তিনি এত পেয়েও কি তার বদলে কিছু দেবেন না? তিনি কি এইসব আত্মত্যাগীদের কাছে ঋণীই থেকে যাবেন?

অন্ধকারের তপস্যা তো অন্ধকারেই শেষ হয় না, সে দিনকে আনে। দুঃখের

তপস্যা কি দুঃখেই সমাপ্ত হতে পারে? মৃত্যুকে স্বীকার করে, তার মর্ত্যসীমাকে (mortality) অস্বীকার করেই আজ মানুষ সকল বাধা অতিক্রম করেছে। মৃত্যুর বাধা সে ছেদন করেছে। এই মৃত্যুভয়ই তো মানুষকে অমৃতলোক হতে বঞ্চিত করে দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই মর্ত্যসীমাই যদি চূর্ণ হল তবে কি অমৃত আজ দেখা দেবে না? মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ আজ দেবতার অমর মহিমার অধিকারী হবেই হবে। ভয়কে আজ বিদায় দিয়েছি। অমৃত-লোকের কূল কি আজ দেখা না দিয়ে পারবে? (১২শ)

৩৮নং

সর্বদেহের ব্যাকুলতা

কী বলতে চায় বাণী·

বন্ধুজনের কাছে আসমানী নীলরঙের পোশাক উপহার পেয়েছিলাম। বস্ত্র তো আমাদের দেহকে আচ্ছাদন করে, অথচ দেহের ভিতরে অন্তরে যে নবনব ভাবের সঞ্চার হয় তারও বৈচিত্র্যের প্রকাশ হয় এই বসন-বৈচিত্র্য দিয়েই। বস্ত্র একই সঙ্গে আচ্ছাদন করে ও প্রকাশ করে। উপনিষদে দেখা যাচ্চে, আচ্ছাদন করে বলেই ছন্দ।

[যদ্ এভিরস্থাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।—ছান্দোগ্য, ১, ৪, ২]

অথচ ছন্দই আমাদের ভাবকে প্রকাশ করবার মস্ত সহায়। সংগীতও আমাদের মনের গভীর সুখ-দুঃখকে একদিকে আচ্ছাদন করে আবার অন্য দিকে নানা বৈচিত্র্যে তাকে প্রকাশও করে। কাজেই বসনকে এক হিসাবে সংগীতের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সংগীতে যেমন নানা রাগে নানা তানে নানা ভাবের বৈচিত্র্যকে সূচিত করা যায় তেমনি বসনেও নানা বর্ণে ও নানা ভাঁজে এবং নানা সংস্থিতিতে নানা রকমের মনোভাবের ইশারা করা চলে। গানের ভাবেই অন্তরের আবেগ-কম্পন ধরা পড়ে। গানের বৈভব নানা তানে ও তালে, বসনের বৈভব তার বিচিত্র নানা বর্ণে ও নানা ভাঁজে।

প্রেম চির-নূতন, হৃদয়ে তাই নূতনত্বের অন্ত নেই। কিন্তু বাইরে তা দেখাই কেমন করে? সংগীত করে অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ। আমার দেহ বলচে, সংগীতের মত এমন প্রকাশ আমি পাই কোথায়? সর্বদেহের নব নব

ব্যাকুলতা তাই তাদের প্রকাশ (expression) খুঁজচে নব নব বর্ণের ও নানা ধরণের বসন-বৈচিত্র্যে। আমাকে আচ্ছাদন করে যে নীলধারার মত এই নীল বসনখানি আমার অঙ্গ ছেয়ে পড়ল তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঁজে ভাঁজে যেন আমার হিয়ার ভিতরেরই নব নব বেদনার ভাব-তরঙ্গ সূচিত হচ্চে। গানের ব্যাকুলতা বাঁধা রাগে ও তানে প্রকাশ না পেলে নতুন রাগ ও তান খোঁজে। আমার অন্তরের ব্যাকুলতা আজ যেন নব বসনে লীলায়িত হয়ে নব রাগ নব তান ছড়িয়ে দিল। আমার দেহ যেন এই বসনের ভাঁজে ভাঁজে বর্ণে বর্ণে ভাবতরঙ্গের প্রকাশ পেয়েছে।)

আমার এই নীল বসনখানি সুরের সুরধুনীর মত তার নীলধারায় আমার দেহকে অসীম নীলিমার বন্যায় ডুবিয়ে দিল। নবীন বসন অঙ্গে ছেয়ে পড়ল। দেহের এই গান তার নানা তান নিয়ে বিচিত্র। এই অপূর্ব দেহ-সংগীতকে আদর করে বুকে ধরলাম। অসীম প্রেমের নীলধারা যেন ভাঁজে ভাঁজে তানে তানে সংগীত-বসন হয়ে আজ আমাকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছে।

আপনাকে তো দেওয়া হয়েই গেছে, তবু ইচ্ছা প্রতিদিন আপনাকে নতুন করে দিই। প্রতিবারে নতুন করে হাজার বার আপনাকে দিতে ইচ্ছে হয়। চোখের কালোয় নতুন আলোর ঝলকে নতুন দৃষ্টি যেমন পাই, ওষ্ঠে যেমনি নতুন হাসি ফোটে, অমনি তা প্রিয়জনকে দিতে চাই। যতনে পরিহিত এই নতুন বসনে আমার অঙ্গখানি সাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করতে ইচ্ছা হয়। আমার এই নূতনতর ব্যাকুলতাকে বুঝাই কেমন করে? (২য়)

চাঁদের আলো যেন শব্দহীন প্রত্যক্ষ সংগীত। চাঁদের আলোয় যদি আমাদের মিলন হয় তবে তখন কোনো কথা হবে না। কথার তো তখন সময় নয়। তখন যেন মনে হয়, বিশ্বের মধ্যে এই আমাদের দুজনের প্রথম মিলন। সেই মিলন যেন কখনও পুরাতন না হয়। সেই স্তব্ধতাকে কোনো শব্দে যেন বিক্ষিপ্ত না করে। অথচ তখনকার মধুর মুহূর্তের অন্তর-ব্যাকুলতা প্রকাশ পাবে কোন্ গানে? সেই অব্যক্ত সংগীতের সুরটিই এই বসনের ভাঁজে-ভাঁজে বর্ণে-বর্ণে দেহের সঙ্গে কানাকানি করবে, অস্ফুটভাবে তার মনের রহস্য প্রকাশ করবে। (৩য়)

সন্ধ্যার আকাশ যেন নানা বরণের সুরার পিয়াসী মাতাল। আমার হৃদয়ও সেই মাতাল সান্ধ্য আকাশের মত। তার নব নব রঙের সুরার পিয়াস আর কিছুতেই মেটে না। তাই আমার বসনখানি রাঙাই কখনো ধানী

কখনো জাফরানী রঙে। আজ আমার এই নতুন বসনের রঙ যেন বৃষ্টি-ধৌত আকাশেরই মত নীল।

আজ আমার এই বসনে দেখছি সীমাহীন আকাশের নীলিমা। এ যেন অপার আকাশের দিশাহারা নীল। ঐ পারের বনের মধ্যে যে ঘোর নীল রঙ দেখি তার সাথে এর মিল রয়েছে। আজ এই বসনে আমার দেহে সুদূর আকাশের অজানা পর্বতের অকূল সাগরের নীলিমা দেখা যাচ্ছে। আমার দেহে যেন আজ অকূল-সাগর-পানে-ধাওয়া-হাওয়ার পরশ পাচ্ছি। অসীমের নীলিমা আজ আমার অঙ্গে, নব মেঘের বাণী আজ আমার বসনে। নূতন বসনখানিতে ঈশান কোণের নব মেঘের বাণী আসচে।

৩৭নং

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধু-পারে......

Shakespeareএর মৃত্যুর পর তিনশ' বৎসর পূর্ণ হওয়ায় এক উৎসবের আয়োজন হয়। প্রফেসার গোলাণ্ড আমাকে এই স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষ্যে কিছু লিখতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁকে এই বাংলা কবিতা পাঠাই। সুদূর দেশের শ্রদ্ধার সেই উপহার সাদরে গৃহীত হয়। এই কবিতাটি একটি নৈমিত্তিক (occasional) কবিতা।

ব্যাখ্যা—যদিও আসলে সূর্য সব দেশেরই, তবু সূর্য যখন উদিত হয় তখন উদয়-দিক্‌প্রান্তের সঙ্গেই তার যোগ। হে বিশ্বকবি, তুমি দূর সিন্ধুপারে সূর্যের মত যেদিন উদিত হলে, সেদিন কেবল ইংলণ্ডই তো তোমাকে আপন কোলে পেয়েছিল, কারণ তখন তুমি তারই কোলে উঠেছিলে। ইংলণ্ড ভেবেছিল, তুমি বুঝি শুধু তারই আপন ধন। তোমার উজ্জ্বল ললাট সেদিন সেখানকার অরণ্য-শাখাতেই সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ছিল। সেখানকার কুয়াশা-আঁচলের আড়ালে তুমি কিছুকাল আধা-আচ্ছন্ন ছিলে, বনপুষ্পবিকসিত তৃণ-ঘন শিশির-উজ্জ্বল পরীদের খেলার প্রাঙ্গণেই তখন তোমার বাল্যলীলার ভূমিটুকু সীমাবদ্ধ ছিল।

(ইংলণ্ডের বনপুষ্পে-ভরা বসন্তের কি অপূর্ব শোভা, তার তৃণ-শাদ্বল কি ঘন সবুজ তা না দেখলে বোঝা যায় না। ওদের ছেলেদের গল্পেও, টাইটেনিয়া ওবেরণ প্রভৃতি পরীদের খেলাতেও সেই আনন্দের উপাখ্যান।)

(যখন তুমি সেখানে তোমার কাব্য-রচনায় রত, তখনো দেশের লোক তোমাকে যথোপযুক্ত আদর করে নি। হে কবি-সূর্য, তোমার যোগ্য বন্দনা-সংগীত তখনও কেউ গায় নি। তারপরে ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশ তোমাকে নিঃশব্দে ঊর্ধ্বে যেতে ইঙ্গিত করে সর্বদিকের কেন্দ্রস্থল মধ্য-গগনে উঠিয়েছে। বাল্যকালের সেই দিগন্তের কোল ছেড়ে শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রহরে-প্রহরে উঠতে উঠতে এখন তুমি দীপ্তজ্যোতি মধ্য-গগনে বিরাজিত। এখন তুমি বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিত করে সকল দেশের ঊর্ধ্বে সর্বমানবলোকের চিদাকাশের মাথার উপরে বিরাজমান। তোমার কবিত্বজ্যোতি আজ সর্ব সাহিত্যের কেন্দ্রস্থলে সবার ঊর্ধ্বে মধ্য-গগনে সমাসীন।)

এমন কত যুগ গেছে যখন তোমার আপন দেশও তোমাকে চেনে নি। ভারতের তো তখন তোমাকে চেনবারই কথা নয়। আর আজ ভারতীয় প্রাচ্য-সাগরতীরে নারিকেলকুঞ্জবনের শাখাপুঞ্জকে কম্পমান করে তোমার জয়ধ্বনি উঠেছে। কারণ, আজ তো তুমি আর দেশবিশেষের দিক্‌-প্রান্তে বদ্ধ হয়ে পড়ে নেই। আজ তুমি বিরাজিত মধ্য-গগনে। সকল দেশের উপরে সবার মাঝখানে আজ তোমার স্থান।

৪০নং

এইক্ষণে

মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে……*

লেখবার সময় কী ভেবেছিলাম আর এখন তা পড়ে কী বুঝছি, তাতে অনেক সময় ঢের তফাৎ দেখি। পূর্ব-পরের ও আনুষঙ্গিক সব অনুভূতির সঙ্গে সংগত হয়ে একই অনুভবের নানা রূপ দেখা যায়।

আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিগুলি সব বিচ্ছিন্ন (isolated) নয়। অতীতকে বাদ দিয়ে তারা আসে না। বর্তমান দিয়েই সব প্রাপ্তি নয়। বর্তমানই সব-কিছুকে পেতে চেষ্টা করলেও পায় না। অতীতের অনুভূতির অবিচ্ছিন্ন ধারাই কালের বুকের উপর দিয়ে প্রবাহরূপে বয়ে বয়ে প্রত্যক্ষ রসরূপ হয়। প্রত্যক্ষের সেই রসের মধ্যেও অনাদি কালের অনন্ত স্পর্শের আশীর্বাদ

* গ্রন্থভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(contribution) থাকে। একে শুধু একটা তত্ত্বমাত্র মনে করলে চলবে না। এ একটা রসরূপ (feeling)। রসমাত্রই তার ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি একটা উপলক্ষ্য মাত্র। আজকার উপলব্ধ ভাব কত যুগে কত ব্যক্তির কত অনুভবের মধ্য দিয়ে পুষ্ট হতে-হতে আজ এখন এখানে এসে পৌঁছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, তা কে জানে ?

এই কবিতাটি লিখলাম বাংলাদেশে শিলাইদাতে ফাল্গুন মাসে।* কিন্তু কবিতাটির মর্ম আরো ভাল করে আমি নিজেই বুঝলাম কিছুকাল পরে। আমি তখন জাপানে কোবে বন্দরে পৌঁছচ্ছি। আমি যখন জাপানকে আমার পূর্ব-উপলব্ধ অনুভবধারার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করচি তখন বহুকাল-সিঙ্গাপুর-প্রবাসী এক জাপানী তাঁর দেশটিকে তদ্‌গতচিত্ত হয়ে দেখছিলেন। আমি তখন যা বুঝতে চেষ্টামাত্র করচি তা তিনি তখন পরিপূর্ণ রসরূপেই পেয়েছেন। তাঁর আজকের দেখার পিছনে তাঁর সারা জন্মের স্মৃতির একটি পটভূমি (background) আছে। একই চক্ষুর বাতায়ন দিয়ে দুজনেই দেখচি, তবে পটভূমিকার (background) ভেদে দুজনের দৃষ্টিতে বহু ভেদ রয়েছে। তাঁর দেখার পিছনে কত যুগের বিস্মৃত সব দেখার ভিড় বিরাজমান। পূর্বকালের বহু দেখা এখন রসরূপ হয়ে তাঁর অন্তরে নিহিত। তাঁর এই মুহূর্তের দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেইসব বিগত মুহূর্তের ভাবগুলি এবং এখন-না-দেখা রসরূপগুলি ঝংকৃত হয়ে হয়ে আজ বাজচে। আমার তো সেই সৌভাগ্য নেই।

আমিও যখন আমার দেশকে দীর্ঘকালের পর দেখি, তখন সুগভীর বেদনার মত একটা যে ভাব অন্তরে জাগে তা তো একমাত্র তাৎকালিক দেখা নয়। তার পিছনে কত যুগের কত দেখার বিস্মৃত অদৃশ্যপুঞ্জ যে বিরাজিত তা কে বলবে ? সেই অদৃশ্যপুঞ্জই যেন বর্তমান প্রত্যক্ষকে তার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে নূতন জীবন দিয়ে জাগিয়ে তোলে।

গানে এই রহস্যটা আরও ভাল করে বোঝা যায়। বিদেশী লোক যখন ভারতীয় সংগীতের পূরবী-কানাড়া-ভৈরবী শোনে তখন সে তার জীবনের মধ্যে সকল রসের আশ্রয় সোনার-কাঠি-ছোঁয়ানো সেই পটভূমিকাটি (back-ground) পায় না। আমার মধ্যে এইসব সুরের বহুকাল-রচিত আশ্রয়-

* ৭ই ফাল্গুন, ১৩২২।

নীড় আছে। আমি যখন ভিন্ন ভিন্ন সব এদেশী সুর শুনি তখন আমার সেই-সব নীড়গুলি জেগে ওঠে।

আমার মধ্যে চিরকালের শোনা কানাড়া-বেহাগ প্রভৃতি সুরের এক-একটি বিরাট্ বিশ্ব আছে। আমার অন্তরের স্থানে স্থানে এক এক সুরের সুরলোক আছে। আজকের শোনা বিশেষ সংগীতটিকে আমার অন্তরস্থিত সেই বিশ্ব-সংগীতলোকে রাখলেই সুর-সংগতির গভীর আনন্দ জাগে, সামঞ্জস্যের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বিদেশের কোনো সুন্দর জিনিষ পাবার সময় ঠিক তার অনুরূপ কোনো উপলব্ধিলোক অন্তরে না থাকলেও নিজের দেশের উপলব্ধ অন্তরস্থিত রসলোকে রেখেই তাকে উপভোগ করতে হয়। তবেই সেই বিদেশী রস প্রত্যক্ষ হয়ে ভোগ্য হয়ে ওঠে।

এই জীবনে এমন বহু দেখা বহু শোনা আছে যাতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ইহজীবনে তো সেই ব্যাকুলতার কারণ খুঁজে পাই নে। কালিদাসও এইজন্যই লিখেছিলেন, রম্য জিনিষ দেখে ও মধুর সংগীত শুনে মন যে কাঁদে তার হেতু হয়তো এখানে এখন নেই, তার মূল রয়েছে অতীত বহুযুগের-বিস্মৃত প্রেম-পরিচয়ে। এই কথাটি কালিদাসের একটা theory বা creed মাত্র ছিল না, এই ভাবটি তিনি জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

জাপানের শোভা দেখে জাপানীটির মনে আনন্দের যেমন দীর্ঘ-কাল-রচিত আশ্রয়-লোক আছে আমার তো তেমন নেই। যে-সব অতীত প্রত্যক্ষগুলি ভাবগত (subconscious) হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষের পিছনে লুকিয়ে কাজ করে, তারা কি শুধু এই জীবনেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ? অর্থাৎ এই জীবনেরই অতীত প্রত্যক্ষগুলিরই সহায়তা আমরা পাই, না পূর্ব-জন্মের প্রত্যক্ষেরও সহায়তা পাই ?

আমি কিন্তু পূর্ব-জন্মবাদী। কারণ, বার বার এটা উপলব্ধি করেছি যে এই জীবনের প্রত্যক্ষের পিছনে যা বেজে উঠল তার কারণ-তন্ত্রী সবটা এই লোকে নেই। পূর্ব-যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অজ্ঞাত রসলোকের তন্ত্রীতে আঘাত পড়েই তার অনুরণনে এই কালের সব তার বেজে উঠল। এক কালের তারের পিছনে সহস্র কালের সব তার বেজে উঠল। এক কালের তারের পিছনে সহস্র কালের রসতন্ত্রীর ঠাট বাঁধা। তারই মীড়ে ও ঝংকারে এই জীবন-বীণার সুরগুলির ঝংকার এমন অপূর্ব বিশ্ব-বিমোহন।

প্রত্যক্ষ যখন তার পূর্ব-পুরুষদের পিতৃকাননে* প্রবেশ করে তখন অসংখ্য সমাধিস্তম্ভ সরিয়ে পিতৃগণ যে উঠে এসে তার চারিদিকে দাঁড়িয়ে তাঁদের শুভাশীর্বাদ বর্ষণ করেন, এই লীলা আমি জীবনে বহুবার দেখেছি।

ব্যাখ্যা—চক্ষু তো দ্রষ্টা নয়। সে বাতায়নমাত্র। যিনি দেখবার তিনি এই দৃষ্টি-বাতায়নেরই ভিতর দিয়ে দেখেন। নয়ন-বাতায়ন দিয়ে সেই দেখনেওয়ালার কথাই এখানে বলা হয়েছে। চক্ষু তো কিছুই দেখে না, সে কেবল তার ইন্দ্রিয়পরশগুলি ভিতরে পাঠায় (message-bearer) মাত্র। যিনি দেখনেওয়ালা তিনিই সব একত্র করে সাজিয়ে তবে দেখেন, তাতেই রসের উপলব্ধি হয়।

এই মুহূর্তে আমার হৃদয়ের পাশে নয়নবাতায়নে বসে যিনি আজকের প্রভাত-আলোতে চেয়ে-চেয়ে দেখেছেন, তাঁর দৃষ্টির পিছনে নানা যুগের বহু দিন-রাত্রির দৃষ্টি সঞ্চিত রয়েছে। তাছাড়া তিনি থেকে থেকে আমার চিত্তে নীল আকাশের অসীম অপার সংগীতের আনন্দ সঞ্চার করচেন, নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিতগুলির খবর এনে দিচ্চেন।

আজ বুঝতে পারচি বার বার আমার বিস্মৃত সুদূর কত যুগের কত কালের সজনে-বিজনে কত দৃষ্টির আনন্দ আমার জন্য তুমি সঞ্চয় করে রেখেছ। সেই-সব দৃষ্টির আনন্দই আজ আমার চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র শিউরে উঠচে। (১ম)

তুমি আমার চিরন্তনী প্রেয়সী। জন্মে জন্মে কত বিস্মৃত মিলন-লগ্নে তোমার অপরূপ বিচিত্র রূপ অবগুণ্ঠন সরিয়ে সরিয়ে কত ভাবেই দেখেছি। নানা রূপে বার বার আমাদের শুভদৃষ্টি হয়েছে। তাই আজ নিখিল গগনে অনাদি মিলন ও অনন্ত বিরহের সংগীত বার বার পরিপূর্ণ বেদনায় ঝংকৃত হয়ে উঠচে।†

আজ তুমি যা দেখছ তাকে ঘিরে রয়েছে অতীতের এমন বহু অভিজ্ঞতা যাদের তুমি এখন এখানে দেখতে পাচ্চ না। সেইসব বিস্মৃত সুখ-দুঃখের ব্যাকুলতা নিখিল আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই ব্যাকুলতাই আজ ফাল্গুনের ফুলগন্ধে বনে বনে ভরে ভরে উঠছে। সেই বিস্মৃত অভিজ্ঞতাই বহু শত জনমের প্রেম-মিলনের কানে-কানে-কথা আজ অন্তরের মধ্যে বয়ে আনচে।

* Graveyard.

† তুলনীয় 'সিন্ধুপারে'।

যে কথা বলিতে চাই…

এই কবিতাতে পূর্ববর্তী কবিতারই ভাবের অনুবৃত্তি চলেছে। কাছে পদ্মার উপরে নৌকায় বসে এই কবিতাটি লেখা। একটি চাষী একটি ক্ষীণ অপ্রশস্ত ক্ষেত (strip of land) চাষ করছিল। তখন বেলা দেড় প্রহর আন্দাজ। বেশ মনে আছে তখন মনের মধ্যে একটা অবসাদ ভাব (languid feeling) আসছিল।

চিরকালের বিশ্বকেই হাজার বার দেখছি। সেই একই দেখা বার বার দেখছি। এই একটুখানি দেখার পিছনে একটা অপরিসীম অপরিচয় রয়েছে। দেখা আর কতটুকু! না-দেখাই তো সব। এত অপরিচয়, অথচ সে এত সহজে এমন করে ডাকে কেমন করে? তার সঙ্গে মিলতেও তো কোনো বাধা হয় না! খুবই সহজ ভাব। কী সহজেই সে আসে ও কী সহজ আনন্দই সে হৃদয়ে আনে! এই সামান্য একটু কথা বলতে চাই, অথচ এই সামান্য কথাটুকু প্রকাশ করে বলবার মত সহজ বাণী তো পাই না। বাউলদের গানে শুনেছি—

সহজ যদি দেখলি নয়ন ভরে,
ওরে, তার বাণী তুই পাবি কেমন ক'রে?

চিরদিনের বিশ্ব যে আমার আঁখিরই সম্মুখে, সে কথা তো কিছুতেই বলতে পারি নি। সে আমারই দ্বারে উপস্থিত, তাকে হাজার বার দেখেছি। অথচ তার সঙ্গে চেনা তো ভাল করে শেষ করা গেল না। তবু সে চিরপরিচিতের মত কী সহজে আমার চিত্তকে গভীর আনন্দ-রসে ভরে দেয় যে ভাবলে অবাক হয়ে যাই। এই রহস্য বুঝিয়ে বলবার মত ভাষা আমার কই?

উন্মুক্ত নদীতীরের খোলা হাওয়া হুহু করে এসে নদীতীরের ছায়াঘন বটগাছে অপূর্ব উদাস সংগীত জাগিয়ে তুলেছিল। এই অপূর্ব দৃশ্যটি সেদিন সত্যাই দেখে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। এটা আমার বানানো 'কবিত্ব' নয়। সে-রকম বানানো কবিতা আমি লিখি না। সত্য করে না দেখলে আমি লিখিই না। মাঠের শূন্যতাকে (desolation) মাঠের মধ্যে তেমন করে বোঝা যায় না যেমন বোঝা যায় মাঠের মাঝে একাকী একটি স্তব্ধ গাছে বা একঠেঙে লক্ষ্মীছাড়া এক তালগাছে।

রাত্রির নিঃশব্দ স্তব্ধতার কোনো প্রকাশই হত না যদি ঝিল্লীর সূক্ষ্ম শব্দে ব্যাকুল হয়ে তা ফুটে না উঠত। সেই একঘেয়ে সরু ধ্বনি-রেখায় নিরাকার নিঃশব্দতা সাকার হয়ে যেন প্রত্যক্ষগম্য হতে থাকে।

শূন্য প্রান্তরের বটগাছের বুকে হুহু করে উদাস গান বাজচে। নদীর এপারে ঢালু কিনারায় চাষী চাষ করছে। ওপারের তৃণশূন্য বালুর চরে হাঁসের দল উড়ে চলেছে। শিলাইদার কাছে তখন পদ্মা অতি শীর্ণ। সেই পূর্বের পদ্মা আর নেই। তার উপর ফাল্গুন মাসে নদীর ধারা চলে-কি-না-চলে তা বোঝাই কঠিন। নিদ্রালস নয়নের মত সবই যেন ঝিমিয়ে আসচে।

গ্রামের কুটীরগুলি হতে নদী পর্যন্ত বাঁকা পথ মাঠের উপর দিয়ে গিয়েছে। কত শত বৎসরের চরণ-চারণে এই পথ চিহ্নিত। ফসল-ক্ষেতের বুকের উপর দিয়ে এই পথ চলে গেছে। সে যেন কত কালের মিতা। তাকে কি চিনি? অপরিচিত হলেও তো সে ভয়ংকর নয়। তার সঙ্গে কত সহজ মিতালি। নদীর সঙ্গে গ্রাম-কুটীরগুলির কুটুম্বিতার যোগ এই পথই বহন করছে। (২য়)

ফাল্গুনের আলোয় এই গ্রাম, এই শূন্য মাঠ, ওই খেয়া ঘাট, ওই নীল নদী-রেখা, ওই নির্জন বালুচরে চখাচখীর আনন্দ-কাকলি—এই সব চিত্রই তো কতকাল দেখেচি। এই যে শুধু দেখা, এই যে সুদূরে গিয়ে নানা রসের পরশ নিয়ে আসার কাজটা যে করেছে; সে যেন আমার কত কালের মিতা। সেই মিতা কত যুগের কত লোকলোকান্তরের কত খবরই বলে। এই দেখাটাই অন্তরে অন্তরে একটি প্রেম-যোগ (communication)। চিরদিনের সেই দেখাগুলিই যেন আজ প্রকাশ খুঁজছে।

এমন যে আমার মিতা, তারই সত্যকার পরিচয়, তারই আসল স্বরূপটি কি জানি? কোথা হতে সে আসে, কোথায় সে যায়, কোথায় যাবার জন্য সে ইশারা করে, তা কে জানে? কিন্তু আজ যেন মনে হচ্চে আসলে সে ক্ষুদ্র নয়। সে বিরাট্। তবু এমন সহজ এমন আপনার হয়ে এমন ছোট হয়ে সে আসে কেমন করে? আমার আজকের এই ছোট্ট দেখাটুকুর মধ্যেই আমার জন্ম-জন্মান্তরের মিতাটিকেই যেন খুঁজচি।

শুধু এই দেখা, এই চলা, এই আলো, এই হাওয়া, প্রকৃতির বুকে এই অস্ফুট গুঞ্জরণ, নদীর জলে এই চঞ্চল মেঘের নিঃশব্দ-সঞ্চারী ছায়া, আমার জীবনকে বারে বারে যে অপূর্ব আনন্দ-বেদনায় উদাস করেছে তার সঠিক পরিচয় কি জানি? যে আনন্দ সে আমার জীবনে ক্ষণে ক্ষণে সঞ্চার করেছে

তা যেমন নিবিড় তেমনি সহজ। সহজ সেই আনন্দকে কিছুতেই প্রকাশ করতে না পেয়ে হৃদয় আমার আজ ব্যাকুল উদাসী হয়ে উঠচে। (৩য়)

৪২নং

তোমারে কি বার বার করেছিনু অপমান?......

বেশ সুখে আছি এমন সময় দ্বারে অজানা বন্ধুর করাঘাত শোনা যায়। অনন্তের দাবী সব সুখ ভাডিয়ে এসে জীবনে পৌছয়। আপদ মনে করে তাঁকে তাড়িয়ে দিই। সকালে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় রাত্রিতে নানারূপে নানাভাবে এসে তিনি বৃথা অনুনয় করে ফিরে ফিরে যান। তারপরে আবার অনুতাপে পুড়ে মরি।

অনেক কাল থেকেই এই ভাবটা আমার মনে বার বার ঘা দিয়েছে। 'চৈতালি'তে 'দেবতার বিদায়ে' তাঁকে বলেছি—'দূর হয়ে যা রে'। 'কল্পনা'র 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতায় তিনি প্রভাতে সন্ধ্যায় রাত্রিতে নব নব বেশে এসে ডাক দিলেন। প্রত্যেক বারই ফিরিয়ে দিলাম। যাবার সময় তিনি জানিয়ে গেলেন —'সে যে আমি, সেই আমি'। তারপর মধ্যযুগের কবিদের কবিতায় সেই ভাবটিই আর-এক রূপে দেখলাম। প্রভাতে তাঁর দূত এলেন স্বর্ণ-বসনে, মধ্যাহ্নে এলেন রৌদ্রদীপ্ত সাজে, সন্ধ্যায় এলেন গেরুয়া সুর গেয়ে, প্রতিবারই তাঁর নব নব রূপের সন্দেশ প্রত্যাখ্যান করলাম। তারপর তিনি গভীর নিশীথের অসীম অন্ধকার আকাশে তাঁর নক্ষত্রমালার জলন্ত অক্ষরে লেখা বিরাট্ পত্রখানি বিস্তৃত করে ধরলেন। তখন বুঝলাম তাঁর বিশ্বযজ্ঞে একমাত্র নিমন্ত্রিত আমি। আমাকে নিমন্ত্রণ করতেই প্রকৃতি-দূতকে এক বিরাট্ পত্র দিয়ে তিনি প্রভাত-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা-নিশীথের নানা সাজে পাঠিয়েছেন। মূঢ় আমি, বুঝতে না পেরে বার বার সেই নিমন্ত্রণেরই অপমান করেছি।

ব্যাখ্যা—'বলাকা'র এই কবিতায় তিনি দূতকে পাঠান নি। তিনি নিজেই বার বার এসেছেন। বার বার তাঁকেই অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছি। ভোরবেলা তিনি সুন্দর প্রভাতী সুরে গান গেয়ে এলেন। তবু ঘুম ভেঙে গেল বলে বিরক্ত হয়ে জানলা থেকে ঢেলা মেরে তাঁকে তাড়ালাম, একবার দরজা খুলেও দেখলাম না। কেন বা তিনি এলেন, কী কাজ ছিল,

তার কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। অপমানিত হয়ে তিনি জনতার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। মধ্যাহ্নে তিনিই ক্ষুধিত দরিদ্ররূপে এসে আমাকে সেবার কাজে আহ্বান করলেন। কী বিপদ! 'বিদায় কর, বিদায় কর' বলে দূর করে দিলাম। মনের ব্যথা মনে নিয়েই তিনি বিদায় হলেন। (১ম)

সন্ধ্যাবেলা মৃত্যুদূতের মত, অস্পষ্ট অদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মত, মশালের আলো জ্বালিয়ে তিনি এলেন। মৃত্যুর রূপকে অমঙ্গলের মত মনে হল। দস্যু বলে শত্রু বলে সব দুয়ার বন্ধ করে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলাম। অন্ধকারে হয়তো তাঁকে গ্রহণ করার উপযুক্ত অবসরও ছিল। সেই সুযোগও হারালাম। তখনও ভয়ে-ভয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে পারা গেল না। কাজটা যে ভাল হল না তা বুঝতে পেরে অন্ধকারও শিউরে উঠল।

তাঁকে মানা করব, ফিরিয়ে দেব, মারব, ঋণ শোধ না করে দরজা বন্ধ করে দেব—এইসব অপমান পাবার জন্যই কি আমার দ্বারে সেই অজানা বন্ধু বার বার এসেছিলেন? (২য়)

তারপর গভীর রাত্রে যখন আমোদ-উৎসবের বাতি নিবে গেল, তখন সেই নিত্যকালের সঙ্গীকে তাড়িয়ে দিয়ে মন 'হায়-হায়' করতে লাগল। ধূলায় বসে নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ একাকী মনে হল। কখনও তাঁকে তাড়ালাম আলস্যের মধ্যে ডুবে ছিলাম বলে, কখনও তাড়ালাম জনতার মধ্যে ব্যস্ত ছিলাম বলে, কখনও তাড়ালাম রাত্রির অন্ধকারে ভয়ের দুঃস্বপ্নে মগ্ন ছিলাম বলে। নানা কারণে নানা সময়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে করে মন আমার দুঃখে 'হায়-হায়' করতে লাগল। এখন বুঝলাম আমার জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। বহু যত্নে বড় আগ্রহে জীবনে যাদের আপন জন মনে করে দিনরাত ব্যস্ত ছিলাম, তারা কে কোথায় পরে একদিন অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। আর যিনি এত আগ্রহ করে এলেন, উপেক্ষা করে একবার তাঁকে চেয়েও দেখি নি, তাঁকে চিনতেও চাই নি, তাঁর কথাও বুঝতে চেষ্টা করি নি।

এখন তাঁরই রূপ রজনীগন্ধার মৃদুগন্ধে সুবাসিত ও তারার স্নিগ্ধ আলোকে দীপ্ত অন্ধকার নিশীথে নিদ্রাহীন নয়নে বার বার দেখা দেবে। তখন অন্ধকারে কুসুম-মৃদু গন্ধে ও শান্ত নক্ষত্রালোকে নিদ্রাহীন রাত্রি বার বার তাঁকে-প্রত্যাখ্যানের-বেদনা মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখবে। তাঁকে ফিরিয়ে দিলেও তিনি ফিরে ফিরে আসেন। তাঁর যাবার বেলার সেই করুণ সুরই

আমার আপন সুর হয়ে নিশিদিন বাজবে। বার বার তিনি ফিরে গেছেন, বার বার তিনি ফিরে এসেছেন, বারবার তিনি আবার আসবেন।

হে অজানা বন্ধু, এই কি বোঝাতে চাও যে বারে বারে অপমান করে ফিরিয়ে দিলেও তুমি আবার ফিরে ফিরে আসবে? অন্ধকারে একেই কি আমি ব্যথারূপে জানব? তাই কি তুমি এত প্রত্যাখ্যান সহ্য কর? তা নইলে তোমাকে বিদায় করবার এত বড় অমঙ্গল তুমি সইতে না। তোমায় ফিরিয়ে দেওয়া যে অসম্ভব তাই বুঝি বোঝাতে চাও? অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা বিরক্তি কিছুতেই তোমাকে যে ফেরানো অসম্ভব সেই কথাই আমার মনে দেগে দিলে। (৩য়)

৪৩নং

ভাবনা নিয়ে মরিস
কেন খেপে?......

চলাই যখন জগতের ধর্ম তখন আর ভয় কিসের? অচলকেই অচলতার ভার পিষে মারে। যারা সচল, তাদের চলবার পথে কোনো ভারই জগদ্দল শিলা হয়ে চিরদিন চেপে থাকে না। এক দিকে যাত্রীর দুঃখ—সব সময়ই সে বিদায় নিচ্চে, কাউকে ধরে রাখতে পারচে না। অন্য দিকে তার সান্ত্বনা—কোনো দুঃখই তাকে চিরদিন চেপে মারতে পারবে না।

ব্যাখ্যা—কেন বৃথা ভেবে মরিস? দুঃখ-সুখ কিছুই তোকে চিরকাল চেপে মারতে পারবে না। যে সারথি তাঁর উধাও রথে করে তোকে নিয়ে চিরদিন চলেছেন, তিনি যুগ-যুগান্তরের মধ্যে একটি নিমেষও রাশ-ঢিলা দিয়ে তাঁর রথ থামাবেন না। কাজেই যে জগদ্দল শিলার চাপে জগৎ-সংসার পিষে মরে সেই শিলার চাপে তোর ভয় কী? কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সেই-তো মস্ত ভরসা। (১ম)

মায়ের কোলে শৈশব গেল। বিষম দোলার কান্না-হাসিতে যৌবনের দিনও গেল। রাত্রি গেল, দিনের পালা এল। আবার এই পালার শেষে কি সুর বাঁধা হবে কে জানে? মুকুল গেলে ফুল, ফুল গেলে ফল, ফল গেলে বীজ, অংকুর—মৃত্যুর পর মৃত্যু পার হয়ে হয়েই ক্রমাগত এগিয়ে চলতে হবে।

যারা চিরযাত্রী তারা ভারমুক্ত। 'থলি-থালি' বা সংসারের ভার তাদের

কোথায় ? আকাশে যেমন মুক্ত মেঘ ভেসে ভেসে আসে-যায়, ঘূর্ণিবায়ু যেমন ঘুরে ঘুরে নিরুদ্দেশে ধায়, তেমনি চিরযাত্রীদের নিরুদ্দেশ অব্যক্ত গতিও চলার বেগে নানা রূপ অঙ্কিত করে কবে বেঁকে বেঁকে কোথায় উধাও হয়ে চলে যায়। (৩য়)

ওরে বাউল পথিক, একতারা বাজিয়ে পথে চলার গান ধর্। এই নিরুদ্দেশ-যাত্রার কূলকিনারা নেই, এই খুসিতেই তোর মন উঠুক মেতে। তুই ঘরছাড়া দখিন হাওয়া। তোর পদক্ষেপে কান্না-হাসির ফুল ফুটিয়ে প্রাণের বসন্ত-সমারোহ ভরপুর করে দে। (৪র্থ)

এই জনমের এই রূপের খেলা এবার শেষ হোক। বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, এবার বেশ বদল করা যাক। যাবার বেলা পিছনে ফিরে বিদায়ের কান্না যেমন কাঁদতে হবে, তেমনি আবার প্রেমের কাঁদন-ভরা চির-নিরুদ্দেশের যাত্রা রয়েছে সামনের দিকে। এ যেন নববিবাহিতা বালিকার পিতৃগৃহ হতে বিদায় নেওয়া। (৫ম)

সামনের সেই অজানা দেশকেই বা কিসের ভয় ? সেখানেও বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে রয়েছে। সেখানেও প্রাণের ঢেউ এমনি প্রেমে এমন করেই নাচে। সেই সুদূরে আলোর বাঁশি আবার এমনি প্রেমের সুরেই বাজবে। সেখানেও কোন্ অজানা মুখের হাসিতে প্রেমের ফুল ফুটবে। (৬ষ্ঠ)

একদিন এখানে যে বীণাটি হাতে করে প্রাণ খুলে তান সেধেছিলাম, সে বীণাখানি যদিও এখানে ফেলে যেতে হবে তবে তার গানগুলি ফেলে যাব না। সেইসব গান আমি হৃদয়ের মধ্যে ভরে নিয়ে যাব। (৭ম)

নূতন জগতের নূতন আলোতে আমার চিরদিনের সাথীকে সেইসব গান শোনাতে হবে। সেই সাথী আমার জগৎকে চিরদিনই ঘিরে রয়েছেন। কখনও শরতের শিউলি ফুলের গন্ধের ঘোমটার আড়ালে তিনি মুখখানি ঢেকে রাখেন, কখনও বসন্তে তাঁর বরণমালাখানি আমার মাথায় পরিয়ে দেন। লোকে-লোকান্তরে যুগে যুগে নতুন নতুন করে নব নব প্রেমে তাঁকে পেতে হয়। তাঁর সঙ্গে আমার নিত্যকাল ধরে চলেছে নব নব মিলনোৎসব। (৮ম)

চলতে চলতে পথের কোন্ এক বাঁকে হঠাৎ নিমেষতরে তাঁর একটু আভাস পাই। সূর্যাস্ত-রঞ্জিত উদাস প্রান্তরে মনে হয় তিনি যেন একা বসে আমারই প্রতীক্ষা করচেন। তাঁর আসা-যাওয়া এমনি করে একটু আভাসমাত্র দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। এমনি করেই তার বেদনা-ভরা হাওয়া আমার হৃদয়-বনের মধ্যে মর্মর তান তুলে চলে যায়। (৯ম)

জোয়ার-ভাঁটার মত নিত্যই তাঁর আনাগোনা চলেছে। মিলনের সুখের হাসিতে বিদায়ের দুঃখের অশ্রুজলে নিত্যনূতন করে আমাদের চেনা-শোনা। সেই চির-পথিক আমাকেও করেছেন ঘর-ছাড়া। তাঁকে নিয়ে ঘর বেঁধে গৃহস্থালী আর করাই গেল না। চলতে চলতে পথে-পথেই আমাদের প্রেম-লীলা। তাঁর আসা-যাওয়ার টানা-পোড়েনেই নিত্য আমাদের প্রেমের জাল-বোনা চলেছে। (১০ম)

৪৪নং

যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে ?

চৈত্র মাস। বছর শেষ হয়ে এল। দু' বছর পূর্ণ হচ্চে। সবার তাগিদে বইটা শেষ করবার ঝোঁক হল। তাই যে-সুর দিয়ে আরম্ভ সেই সুরেই ফিরে গেলাম। গানকে তো শেষকালে সেই আদি ধুয়াতেই নিয়ে যেতে হবে। তাই আবার নবীন ও যৌবনের দিকে চেয়ে যৌবনের শেষ বাণী বলে সমাপ্ত করতে চাইলাম। তারপরে সকলে আমার বর্ষশেষের বাণীও চাইলেন। তাই এর পরেও একটা কবিতা যোগ করতে হল।

'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি'—কবিতাটার বিষয় বর্ষশেষ হলেও সেটা লেখা হল বৈশাখে। বর্ষশেষের দিনে যা মুখে বন্ধুবান্ধবদের বলেছিলাম তা-ই কবিতায় লিখতে হল। আসলে নবীন ও কাঁচাদের সম্ভাষণ থেকে এই যৌবনের কাছে প্রশ্ন পর্যন্ত আমার একটা আবর্তন সমাপ্ত হয়েছে। আবার বর্ষশেষের কবিতায় সব কথার সার বলে পুনরুক্তি দিয়ে পালা শেষ করা গেল।

ব্যাখ্যা—সুখ হচ্চে খাঁচা। সে আরামে বেঁধে রাখে। সুখের খাঁচায় কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। বেশ আরামে বরাদ্দ-মত ছোলাগুড় পাওয়া যায়। ওরে যৌবন, তুই কি সেই কাপড়-ঢাকা সুখের খাঁচায় বাঁধা-বরাদ্দ-মত খোরাক খেয়ে আরামে বসে বসে ঝিমুবি ? না, দুঃখের কাঁটাগাছের উপর মুক্ত হয়ে ফিঙের মত পুচ্ছ নাচাবি ?

তুই পথহীন সাগরের যাত্রী, তোর অশান্ত (restless) ডানা তো ক্লান্তি জানে না। আজ তোর গম্য স্থানের সন্ধান নিতে হবে। জানা বাসাতে

আজ তুই বদ্ধ হয়ে থাকবি কেমন করে? আজ তোকে যে অপার-যাত্রায় বেরিয়ে পড়তে হবে। আরাম তোর নেই। ঝড়ের বজ্রকে দারুণ দুঃখে তোর কেড়ে আনতে হবে। বিপদের মধ্য হতে মরণকে বরণ করে মাথায় তুলে নিবি, এত বড় তোর দাবী। (১ম)

যৌবন রে, তুই কি দীনের মত জীবনকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকবি? তুই কি ভিক্ষুক যে আয়ু ভিক্ষে করবি? তুই যাকে চাস সে তো মরণ। বীর শিকারীর মত তুই মরণ-বনের অন্ধকারে কণ্টক-পথে তোর লক্ষ্যকে খুঁজচিস।

ওরে বীর, মৃত্যু তো তোর দাস। মৃত্যু আজ তার পাত্রে অমৃত-রস ভরে তোর জন্য বহন করে আনচে। জীবনের সার্থকতা তোর প্রেয়সী। সে মানিনী, মৃত্যু-আচ্ছাদনে তার মুখ ঢেকে তোরই প্রতীক্ষায় বসে আছে। মৃত্যুর সেই আবরণ সরিয়ে আজ তাকে দেখ্। (২য়)

ওরে যৌবন, অন্তরের আবেগের প্রকাশ হয় তার যোগ্য তানে। তোর অন্তরের আবেগ কি মরে গেছে? তা নইলে প্রাণহীন তানে তার প্রকাশ হবে কেন? তোর অন্তরের আবেগ যদি জীবন্ত হয়, তবে পুঁথির প্রাণহীন বাণীতে তার প্রকাশ পূর্ণ হবে কেমন করে? শাস্ত্রের বদ্ধ বাণীতে কি তোর মুক্ত বাণী কখনও বাঁধা থাকতে পারে? পুঁথির হল্‌দে তুলট কাগজে যে-বাণী খড় খড় সর সর করে, সে-বাণী কখনও তোর বাণী নয়। তোর বাণী জীবন্ত। পুঁথির বাণীতে প্রাণ কই?

তোর প্রেম-মধুর বাণী শুনতে পাই দখিন হাওয়ায় বীণার ঝংকারে প্রকৃতির মধ্যে অরণ্যে লতায়-পাতায় ফুলে-পল্লবে। তোর সেই বাণী ঝংকারে-ঝংকারে আপন প্রাণপ্রদ শক্তির রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়ে দেয়। সর্বত্র সে নব জীবন সঞ্চার করে। তোর বাণী মধুর, তোর বাণী জীবন্ত। তোর বাণী রুদ্র, প্রলয়মেঘে ঝড়ের ভৈরব-ঝংকারে তার পরিচয়। ঝড়ের ঢেউয়ের উপরে উপরে বাজিয়ে চলে সে তার বিজয়-দুন্দুভি। (৩য়)

ওরে যৌবন, সচরাচর লোকে যাকে যুবা বয়স বলে তাতেই কি তোর অধিকারকে সীমাবদ্ধ মনে করিস? সেইটুকু গণ্ডির মধ্যেই কি তুই আপনাকে বদ্ধ রাখতে চাস? ওইরূপ অর্থহীন কৃত্রিম কোনো গণ্ডি তো মায়া মাত্র। সারা জীবনের উপর চিরদিনের উপর তোর যে অবাধ অধিকার, সে-কথা কি ভুলে গেলি? বিশেষ বয়সের মধ্যেই তোর রাজত্ব সীমাবদ্ধ,

এই মায়াজালকে ছিন্ন করতেই হবে। যে-সব কুচক্রী ধূর্তের দল ফাঁকি দিয়ে তোর রাজ্য অপহরণ করেছে, তুই আপন শক্তিতে তাদের পরাজিত করে কৃত্রিম সব সীমার গণ্ডি ভেঙে চুরে ফেল্। তারা যতই ধূর্ত হোক, তারা জরাগ্রস্ত, তারা শক্তিহীন।

সূর্যের আলোক যেমন শাণিত খড়্গের মত কুয়াসাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, তেমনি তোর প্রাণশক্তি জরার কুহেলিকাকে ছিন্নভিন্ন করে দিক্। শুষ্ক খসখসে পুষ্পাবরণকে বিদীর্ণ করে যেমন সুন্দর সুকুমার জীবন্ত নবমুকুল ফুটে ওঠে, তেমনি জরার বক্ষ বিদীর্ণ করে লোক-লোকান্তরের অপার ক্ষেত্রে অনন্ত আলোকে নিত্য নব নব রূপে তোর অমর কুসুম ফুটে উঠুক। চির নবীন তোর অমর স্বরূপ। সর্ব বয়সে তোর অধিকার, লোক-লোকান্তরে তোর রাজ্য, নিত্যকালে তোর জয়-জয়কার। তোর এই বিরাট্ বিস্তীর্ণ অধিকারকে সংকুচিত করতে পারে, এমন সাহস কার? (৪র্থ)

কামনায় ও আসক্তিতেই যৌবনের দুর্গতি। সেই ধূলোতেই কি তুই লুটিয়ে মরবি? ভোগের পঙ্ককুণ্ডে কি তুই ডুবে পচে মরতে চাস্? পুরোনো জরাগ্রস্ত অর্থহীন প্রাণহীন সব গ্লানি ও আবর্জনার বোঝা মাথায় করে আপন ভারে আপনি অক্ষম অকর্মণ্য হয়ে কি তুই পড়ে থাকবি?

জরার আবর্জনার ভার বইবার জন্য তো তোর শির নয়। তোর ললাটের জন্য প্রতিদিন প্রভাত তাঁর আপন হাতে রচিত নব-নব স্বর্ণ-মুকুট বয়ে আনেন। তোর কবিত্বের জয়-সংগীত যিনি গান করবেন, তিনি কে? তিনি অগ্নি। জ্বলন্ত উজ্জ্বল পবিত্র পাবক-শিখাই তাঁর নিত্য ঊর্ধ্বমুখ বাণী। আকাশের দীপ্ত সূর্য যেন তোর মুখে প্রতিদিন আপন প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। তোর মুখের শুভ্রশুদ্ধ ভাস্বর প্রকাশচ্ছটায় সূর্য যেন প্রতিদিন আপন পরিচয় নূতন করে পায়। ওরে যৌবন, তুই বিরাট্, তুই বীর, তুই জীবন্ত, তুই পবিত্র, তুই সর্বৈশ্বর্যময়, তুই অমৃতস্বরূপ। তুই কি তুচ্ছ ভোগাসক্তির পঙ্কপল্বলে নিজেকে ডুবিয়ে মারবি? (৫ম)

৪৫নং

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ-ক্লান্ত রাত্রি......

(শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব সমাপ্ত হল। তেরশ' বাইশ সাল গিয়ে তেইশ সাল এল। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনের জয়গান গাওয়াই আমার কাজ। বন্ধুবান্ধবেরা আমার এবারকার উৎসব-বাণীও এই সঙ্গে দাবী করলেন। সেই বাণী এই কবিতায়ই প্রকাশিত হল বলে তা আর আমার আলাদা লেখা হল না।) কাজেই সেবারকার মন্দিরের কথা শান্তিনিকেতনে খুঁজে পাবেন না।

বেদের গান সমাপ্ত হয় পুনরুক্তি দিয়ে। আমার এই কবিতায় যদি 'বলাকা'র সব কথার আবার পুনরুক্তি হয়ে থাকে তবে ভালই হয়েছে। এই একটি কবিতার মধ্যে আমার সব কথার সারটুকু দিয়ে আমি 'বলাকা'র পালা শেষ করে দিচ্চি।

ব্যাখ্যা—হে যাত্রী, জাগো। পুরোনো বছরের রাত্রি ক্লান্ত জরাগ্রস্ত হয়ে বিদায় নিল। তোমার পিছনের সব ভার সব বাধা কেটে গেল। তপ্ত রৌদ্রের ভৈরব স্বরে রুদ্র তোমাকে সম্মুখের পথে এগিয়ে যাবার জন্য ডাক দিয়েছেন। নিরুদ্দেশ-যাত্রী বৈরাগীর একতারার উদাস স্বরে তাঁর ঘর-ছাড়ানো ডাক বেজে উঠেছে। দূর হতে দূরে বিস্তৃত পথটাই যেন সেই একতারার দীর্ঘ তার। তাতে যেন শীর্ণ তীব্র (shrill) দীর্ঘ তান বাজবে।

পথকে যেমন পথ-হারা মনে হয় এমন আর কিছুকে নয়। সে যেন কী একটা মহাবস্তু হারিয়ে গ্রামে-প্রান্তরে অরণ্যে-পর্বতে নদীতে-সাগরে সর্বত্রই তাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চে। একে বৈরাগী, তার উপরে সে পথহারা। সে ক্রমাগত লোকের-পর-লোক যুগের-পর-যুগ পার হয়ে হয়ে চলেইচে।

বৎসরের প্রথম আহ্বান পুষ্পিত বসন্তের মনোহর স্বরে নয়। বৈরাগীর রুদ্র-দীপ্ত তপ্ত-তীব্র-জলন্ত স্বরে সেই আহ্বান ধ্বনিত। (১ম)

ওরে যাত্রী, পথের ধূলাতেই তোর জন্ম। সে-ই তোকে মানুষ করেছে। গতির আশ্রয় দিয়ে পথই তোকে ধরার অচলতার বন্ধন হতে মুক্ত করে নিয়ে যাবে। চলার অঞ্চলটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পথই তোকে জড়িয়ে কোলে তুলে দিগন্ত পার হয়ে দিগন্তরে নিয়ে যাক্। গৃহবদ্ধ বিষয়ী গৃহস্থালীর মঙ্গল-শঙ্খ, সন্ধ্যাদীপ, প্রিয়ার অশ্রু, এসব তো তোর জন্য নয়। এইসব বাঁধনে বদ্ধ হবার জন্য তুই আসিস নি। তুই যে অপারের যাত্রী। (২য়)

কাল-বৈশাখীর আশীর্বাদ ও বর্ষারাত্রির বজ্রনাদে-ভরা শঙ্খ নিয়ে তোর জন্য পথে পথে রুদ্র প্রতীক্ষা করচেন। কোন্ বাঁকে যে তাঁর আশীর্বাদ-সহ তিনি এসে দেখা দেবেন সে-খবর এখনও কেউ জানে না। পথে পথে তোর জন্য প্রতীক্ষা করচে কণ্টকময় অভ্যর্থনা, গর্তে গর্তে বিষধর সর্পের গুপ্ত ফণা। নিন্দায় নিন্দায় সেই পথে তোর জয়শঙ্খ ধ্বনিত হবে। তীক্ষ্ণ কণ্টক, প্রাণান্তক আঘাত, অজস্র নিন্দা এই সবেই তাঁর আশীর্বাদ, সুখ-সম্পদে তো তাঁর আশীর্বাদ নয়। (৩য়)

সুখ-সম্পদের উপহার চোখে দেখা যায় তার মূল্যও বোঝা যায়। কিন্তু ক্ষতির মধ্য দিয়ে আশীর্বাদরূপে রুদ্র যে অদৃশ্য উপহার দেন তার মূল্য কে বুঝবে? অমৃতের অধিকার যদি চেয়ে থাকিস তবে মনে রাখিস তা সুখ নয়, শান্তি নয়, আরাম নয়। মৃত্যু এসে তোকে আঘাত করবে, কেউ দুয়ার খুলে তোকে ঘরে ঠাঁইটুকুও দেবে না, সব আশ্রয় তোকে হারাতে হবে—এই হল রুদ্রের প্রসাদ। তবু ভয় করিস নে। তুই যাত্রী, তোর আবার ভয় কিসের? যে দেবতা তোকে বর দেবেন তিনি নিজেই ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, নিরুদ্দেশের যাত্রী। তোর অমৃতের অধিকার এই রকমই হবে না তো কী? (৪র্থ)

(ওরে যাত্রী, পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি কেটে গেল। গেল তো গেল, বেশ হল। নিষ্ঠুর রুদ্র এসে সব নেশা যদি এখন চূর্ণ করে তো করুক। যে-সব নেশায় মত্ত করে বেঁধে রাখে সেইসব সুরার পাত্র আজ চূর্ণ হয়ে যাক। বন্ধন আজ মুক্ত হোক।

সেই অজানা অচেনা বন্ধুর হাত ধর্। তিনি তোকে দুর্গম কঠিন পথ পার করে যুগ-যুগান্তরের বাধা পার করে নব নব লোকে নিয়ে যাবেন। তাঁর হাতে হাত রাখতে ভয় পাচ্চিস? প্রেমের নব মিলনের প্রথম মুহূর্তে এমন হয়েই থাকে। তোর হৃৎকম্পে যদি তাঁর দীপ্ত বাণী বেজে উঠে থাকে তবে বাজুক। এই প্রসাদ অন্নপূর্ণার নয়।

রুদ্রের এই প্রসাদ। অমৃতের অধিকার যদি সত্যিই চেয়ে থাকিস তবে এইসব ক্ষতি-নিন্দা-আঘাত-অপমান মাথায় করে চলতে হবে। ওরে যাত্রী, কিসের ভয়? পুরাতন রাত্রি ক্ষয় হয়ে এসেছে। নবজীবনের অরুণালোক যে পূর্বাকাশে দেখা দেবে তার সূচনা আমার প্রাণের মধ্যে এসেছে। (৫ম)